ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

দাখিল নবম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন শহিদ বুদ্ধিজীবী

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় জ্ঞানী-গুণী ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যাঁরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌স বাহিনী কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন তাঁরাই শহিদ বুদ্ধিজীবী। শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ১৪ই ডিসেম্বর শোকাবহ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যা ছিল বাঙালিদের মেধাশূন্য করার জন্য পাকিস্তানি শাসকদের নীলনকশার বাস্তবায়ন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশনা ও মদদে একশ্রেণির ঘৃণ্য দালাল এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে।

২০১০ সালে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত সাজাপ্রাপ্তদের অনেকের প্রাণদণ্ড ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। বাকিদের বিচার বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। কালো পতাকা উত্তোলন, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, শহিদদের স্মরণে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, মিলাদ মাহফিলসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধায় দিবসটি পালিত হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

দাখিল

নবম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার
অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুর রহমান
ড. মোঃ মাসুদ-আল-কামাল
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
মুহম্মদ নিজাম
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য্য
শেখ মো. এনামুল কবির

সম্পাদনা

অধ্যাপক আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

চিত্রণ

তামান্না তাসনিম সুপ্তি

রেহনুমা প্রসূন

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

কে. এম. ইউসুফ আলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণে কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

নতুন বছরে নতুন শ্রেণিতে তোমাদের অভিনন্দন, স্বাগত।

এই বছর নবম শ্রেণিতে উঠেছ; আর তোমরাই হলে অন্যতম সৌভাগ্যবান যারা নতুন শিক্ষাপদ্ধতির অভিজ্ঞতা এই শ্রেণিতে লাভ করবে। আশা করি পূর্বের শ্রেণিতে তোমরা এ পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণ না করলেও নবম শ্রেণির শিক্ষাক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন তোমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারো। ফলে তোমরা নতুন ও পুরোনো পদ্ধতির পার্থক্যগুলো গভিরভাবে বুঝতে পারবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, এখন আর জ্ঞানার্জন কেবল পাঠ্যবই পড়া এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর ও কিছু তথ্য মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই শিক্ষাক্রমে পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জনের অনেক কাজ তোমরাই সরাসরি করবে। শিক্ষকদের সহযোগিতায় কখনো আবার মা-বাবা এবং পরিবারের বড়োরাও সাহায্য করবেন। এই পাঠের অনেক পরিকল্পনা ও আনুষাঙ্গিক সব কাজ তোমাদের দ্বারা সম্পন্ন হবে। অনেক কাজ দলে মিলে করবে, আবার কিছু কাজ একাও করবে। এভাবে সরাসরি অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যা জানবে, শিখবে সেসব জ্ঞান ও দক্ষতা তো তোমারই অর্জন। তোমরা এখন প্রশ্ন করতে পারবে, উত্তরগুলো নিজেরাই খুঁজে নিতে পারবে। ফলে একদিকে যেমন অন্যের তৈরি প্রশ্নের ও অন্যের তৈরি উত্তর মুখস্থ করার মতো একঘেঁয়ে ক্লান্তিকর কাজ করতে হবে না। আবার অন্যদিকে নিজেরাই বুদ্ধি খাটিয়ে, অনুসন্ধান করে, বই-পুস্তক ঘেঁটে এবং শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে নিজেদের পড়া নিজেরাই তৈরি করতে পারবে। এভাবে যে অভিজ্ঞতা হয়, যে সাফল্য আসে, তার সবটা মিলে পড়ালেখাটা এক আনন্দময় কাজ হয়ে ওঠে।

নতুন শ্রেণির নানান ধরনের নতুন পাঠ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ নিয়েই হাজির হয়। তবে আমরা বিশ্বাস করি, চ্যালেঞ্জ মোকবিলার জন্য তোমাদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস রয়েছে। পাশাপাশি তোমাদের আছে কৌতূহল, বিস্ময়বোধ, প্রাণশক্তি এবং আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়গুলো এতে সহায়ক ভূমিকা নেয়। আর মজার ব্যাপার হলো এগুলো টাকা-পয়সার মতো নয়, ব্যবহারে খরচ হয় না বরং বাড়ে। কারণ, এসবই তোমার মনের সম্পদ, তুমি যত চর্চা করবে, ততই এগুলো ঝকঝকে থাকবে, কাজে হবে দক্ষ। এই ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় তোমাদের নতুন নতুন ক্ষমতার প্রকাশ ঘটবে। প্রথম ডাক পড়বে বুদ্ধির। নিজেদের বুদ্ধি খাটাতে হবে, ভাবতে হবে, আবার ভাবতে গেলে যুক্তির প্রয়োজন। সেটাও ব্যবহারে না ফুরিয়ে উল্টো ধারালো হয়। এ হলো চর্চার বিষয়। এর জন্য চাই বুদ্ধিকে কাজে লাগানো, যুক্তিতে শান দেওয়া। আর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রাখতে হবে, তাতে এগুলোর দক্ষতাও বাড়বে।

কেউ কেউ বলছেন নতুন ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেই। কথাটা একদম ভুল। এখন বরং সারা বছর ধরেই যেমন পড়াশোনা ও শেখার কাজ চলবে, তেমনি মূল্যায়নও হতে থাকবে বছরব্যাপী। নতুন পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয়ে তোমাদের নির্দিষ্ট কতকগুলো যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সেখানে কিন্তু কোনো ছাড় নেই, তাতে উত্তীর্ণ হতেই হবে। অনেক কিছুই নতুন বলে হঠাৎ করে এসে আগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তোমাদের এখনকার পাঠপদ্ধতি বোঝা কঠিন মনে হতে পারে। আগের ছকে নতুন পদ্ধতির সঠিক মূল্যায়ন করাও যাবে না। বাইরের নানা কথায় তোমাদের আনন্দ মাটি করার দরকার নেই। চলো, এভাবে অজানাকে জয় করবে, অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে চলতে চলতে বিস্ময়ে-আনন্দে মজে কখন যে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে টেরও পাবে না।

সূচিপত্র

প্রকৃতি ও সমাজ অনুসন্ধান	১ - ১৪
আত্মপরিচয় ও মানবিক আচরণ	১৫ - ২৬
‘বাংলাদেশ’ ও ‘বঙ্গবন্ধু’– মানবতাবাদী ধারা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা	২৭ - ৪৮
রাজনৈতিক কাঠামো ও নাগরিক দায়িত্ব	৪৯ - ৭৩
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে	৭৪ - ৮৩
ইতিহাস জানার উপায় এবং যুগ বিভাজন সমস্যা	৮৪ - ৯২
বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশ: রাজনৈতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ	৯৩ - ১১৪
ব্যক্তিজীবনে সামাজিক কাঠামো	১১৫ - ১২৪
মিলেমিশে নিরাপদে বসবাস	১২৫ - ১৫৬
সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও সমতার নীতি	১৫৭ - ১৮৩

প্রকৃতি ও সমাজ অনুসন্ধান

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা প্রথমে নিজ এলাকার কয়েকটি প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান নির্ণয় করব। এরপর দুটো ভিন্ন ভূ-প্রকৃতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট নির্ণয় করে বিশ্লেষণ করব। প্রেক্ষাপট দুটোর উপর প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের প্রভাব চিহ্নিত করব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুসন্ধান করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানব। এরপর আমরা নিজ এলাকার ইতিহাস ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের প্রভাব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুসন্ধান করব। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফল একটি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে উপস্থাপন করব। এরপর মুক্ত আলোচনায় শিক্ষক ও সহপাঠীর কাছ থেকে মতামত নিয়ে এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সংরক্ষণে মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে করণীয় নির্ধারণ করব।

চলো, আমরা আমাদের এলাকার কয়েকটি প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করি। কাজটি করব আমরা দলগতভাবে ।

দলগত কাজ ১

আমরা ৫ থেকে ৬ জনের একটি দল গঠন করি। আমরা খেয়াল রাখব যেন দলের সবাই একই এলাকার অধিবাসী হয়। দলে আলোচনা করে আমরা নিজ নিজ এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের ছকটি পূরণ করি।

আমার এলাকার প্রাকৃতিক উপাদান	আমার এলাকার সামাজিক উপাদান

প্রকৃতি ও সমাজের প্রভাব

আমরা এখন বাংলাদেশের দুটি ভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দুজন মানুষের গল্প পড়ি। এই দুটি গল্প থেকে আমরা দুটি ভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান নির্ণয় করব। এই দুটি অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট খুঁজব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সমুদ্রে মাছ ধরায় ব্যস্ত জেলেরা

সমুদ্রের বুকে জব্বার হোসেন

জব্বার হোসেনের জন্ম সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায়। সমুদ্রে মাছ ধরে এবং হাটে মাছ বিক্রি করেই তার জীবন চলে যায়। বাড়িতে আছে স্ত্রী ও তিন সন্তান।

জব্বার হোসেন স্বপ্ন দেখেন তার সন্তানেরা পড়াশোনা করে শিক্ষিত হবে। হাঁট বাজারে মাঝে মাঝে শহর থেকে আসা মানুষদের দেখতে পান। তারা মাছ কিনে নিয়ে যান। তাদের ভাষাও জেলেদের মতো না।

দাদার কাছ থেকে শুনেছেন, এখানে নাকি একসময় জাহাজও আসত। এখান থেকে লবণ, জামাকাপড় এসব জাহাজে করে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেত। জাহাজে বিদেশি মানুষেরাও আসত।

শহরের লোকেরা অনেক সময় শার্ট, প্যান্ট ও কোট পরে আসে। তা জব্বার হোসেনের ভালো লাগে। স্ত্রীকে জানান এবার কিছু টাকা জমলে দর্জির কাছ থেকে শার্ট, প্যান্ট, কোট বানিয়ে নিবেন। তার এই কথা শুনে স্ত্রী হাসেন। এই জামাকাপড় পরে আপনি কই যাবেন? জব্বার সাহেব ভাবেন সত্যিই তো এটা পরে তিনি কোথাও যেতে পারবেন না। এমনকি এই পোশাকে তিনি সমুদ্রেও ঝাঁপ দিতে পারবেন না। তিনি বুঝলেন, না লুঙ্গির মতো আরামদায়ক পোশাক আর কোনোটাই হয় না। একটু গুঁজে দিলেই হলো, কাজে লেগে পড়া যায়। আবার ভিজে গেলে বাতাসে খুব তাড়িতাড়ি শুকিয়েও যায়।

জব্বার হোসেনের ছোটো ছনের ঘর মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঝড়ে ভেঙে যায়। এগুলো ঠিক করতে তখন বেশ কষ্ট করতে হয়। তারপরও আগের চেয়ে অবস্থা এখন অনেক ভালো। মায়ের কাছ থেকে শোনা এক সময় নাকি বড়ো বড়ো ঝড়ে অনেক মানুষ মারা যেত। এরকমই এক ঝড়ের সময় মা তার এক ছোটোবোনকে হারিয়েছেন। এখন সমুদ্রে এরকম বড়ো ঝড়ের আশঙ্কা হলে তারা বিপৎসংকেত পান। স্ত্রী সন্তান নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

জব্বার হোসেনের জীবন যেন এই সমুদ্রেই। সন্তানরা যেখানেই যাক তিনি এই সমুদ্রেই মরতে চান। মাঝে মাঝে সমুদ্রের পানির উপর মাছের ট্রলারে গা ভাসিয়ে দিয়ে জোরগলায় গান ধরেন।

বিয়ের সাজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অন্বেষা

আজ অন্বেষার বিয়ে

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে বড়ো হয়েছে অন্বেষা সাংমা। চারিপাশে গাছপালা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সব সময় তাকে আগলে রেখেছে। আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারছে না। বেশ সেজে ফেলেছে আজ। নিজের রুমটি পরিপাটি ঘরে গুছিয়েছে। পুরোনো কিছু জিনিসপত্রও সরিয়েছে। বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে উঠবে এখানেই।

বাড়িভর্তি মানুষ। সবার আগ্রহ নতুন বরকে দেখার। তাছাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা প্রস্তুতি নিচ্ছে বিয়ের অনুষ্ঠানে গান ও নাচ পরিবেশন করবে। বিভিন্ন খাবারের আয়োজনও করা হয়েছে। কিন্তু অন্বেষা কেন যেন সবার মতো মজা করতে পারছে না। চিন্তা হচ্ছে নতুন জীবনের সব কিছু কীভাবে শুরু করবে?

হঠাৎ মা অন্বেষার ঘরে ঢুকে বললেন, নতুন জামাইকে বাইরে কাজ করতে হবে। তাদের জমিজমা দেখেশুনে রাখতে হবে। তাই বিয়ের পরদিনই মেয়ের জামাইকে নিয়ে তিনি চাষাবাদের সম্পত্তি দেখিয়ে দিতে চান। অন্বেষার একটু রাগ হলো। মাকে একটু কড়া করেই বলল, মা একজন মানুষ প্রথম আমাদের সঙ্গে এসে থাকবে। বিয়ের পরদিনই তুমি তাকে কাজে পাঠিয়ে দেবে মায়ের উত্তর, কী করব বলো আমার সব সম্পদই তো তোমার। তুমি যদি বরকে পরিশ্রমী না করে তোলো, বর তো আলসে হয়ে যাবে।

অন্বেষা মায়ের কথা মেনে নিল। তারপর কথা ঘুরিয়ে বলল, মা কেমন লাগছে আমাকে? মা এবারও কিছুটা মলিন দৃষ্টিতে বললেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি দকমান্দা (ঐতিহ্যবাহী পোশাক) পরবে। অন্বেষা বলল, মা এখন তো তেমন কেউ এই পোশাকে বিয়ে করে না। মা বললেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি সবার মতো না। অন্বেষা বলল, মা আমি সামনের

সবগুলো অনুষ্ঠানে দকমান্দা পরব। বিয়ে তো একবারই হয়, এই একটা দিন আমার মতো করে একটু সাজি। মা আর কিছু না বলেই চলে গেলেন।

অন্বেষার অনেক দিন পর আজ কিছু লিখতে ইচ্ছা করছে। তার একটি ডায়েরি আছে, সেখানে তার বিশেষ মুহূর্তগুলো লিখে রাখে। কিন্তু যখনই লিখতে বসে, তার নিজের ভাষায় লিখতে পারে না। কারণ, গারো ভাষার লেখার জন্য বর্ণমালা নেই। আহা! যদি নিজের ভাষায় লেখা যেত। তারপরও সে লিখবে যে ভাষা স্কুলে, কলেজে শিখেছে, সেই বাংলা ভাষাতেই। ডায়েরি খুলতেই অন্বেষার নানির কথা মনে পড়ছে। নানির অনেক ইচ্ছা ছিল তার বিয়ে দেখার। বিয়েতে রে-রে গানসহ নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো। গারো সম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে ভিন্ন গোত্রের ছেলেকে বিয়ে করতে হয়। মিন্টুও ভিন্ন গোত্রের।

ছোটোবেলায় অন্বেষা একদিন নানিকে জিজ্ঞেস করল, নানি তুমি নানাকে কী উপহার দিয়েছ বিয়েতে? নানি তাকে একটি আংটি দেখিয়ে বললেন এটা উপহার দিয়েছিলাম। অন্বেষা বললো, এটা তো অনেক সুন্দর। নানি বলল, তোমার বিয়েতেও তোমার বরকে এই আংটি দিলে কেমন হয়? সেদিন খুব লজ্জা পেয়েছিল অন্বেষা। আজ নানির দেওয়া সেই আংটি দিয়েই সে চার্চে বরকে গ্রহণ করবে তার জীবনে।

অনুশীলনী কাজ ১: আমরা জব্বার হোসেন ও অন্বেষা সাংমার জীবনের গল্প পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই সমুদ্র তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায় ও গারো নৃগোষ্ঠীদের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছে ভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে। এই দুই সম্প্রদায়ের ইতিহাস, ভাষা, পোশাক, খাবার, উৎসব ইত্যাদিতে রয়েছে ভিন্নতা। এখন তাহলে আমরা উপরের দুটি গল্প এবং বই, পত্রিকা ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি।

প্রেক্ষাপট	সমুদ্র তীরবর্তী জেলে সম্প্রদায়	গারো নৃগোষ্ঠী
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট		
সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট		

অনুশীলনী কাজ ২: জেলে সম্প্রদায় ও গারো নৃগোষ্ঠীর নিজ নিজ ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান কীভাবে প্রভাবিত করে, সে বিষয়টি শনাক্ত করে নিচের দুটি ছক পূরণ করি।

জেলে সম্প্রদায়	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
প্রাকৃতিক উপাদান		
সামাজিক উপাদান		

গারো নৃগোষ্ঠী	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
প্রাকৃতিক উপাদান		
সামাজিক উপাদান		

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জেলে সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক উপাদান সমুদ্র যার মাধ্যমে জাহাজে করে মালামাল দেশ-বিদেশে পাঠানো হয়। সেই সঙ্গে এই সমুদ্র জেলেদের পেশা, ভাষা, গান ও উৎসব উদ্‌যাপনকেও প্রভাবিত করে। এভাবে প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা ও ইতিহাস সেই অঞ্চলের প্রকৃতি ও সমাজের উপাদান দ্বারা প্রভাবিত।

আমরা এখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে আমাদের চারপাশের মানুষের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে, তা জানার চেষ্টা করব। এ জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে জানব। এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শিখব। চলো, তাহলে আমরা এই পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জেনে নিই। এখানে আমরা নমুনাস্বরূপ নিজ এলাকার সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে অনুসন্ধান করব তার বিভিন্ন ধাপগুলো দেখানো হলো।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপ

ধাপ	ধাপটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	উদাহরণ
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করব।	আমার এলাকার সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন 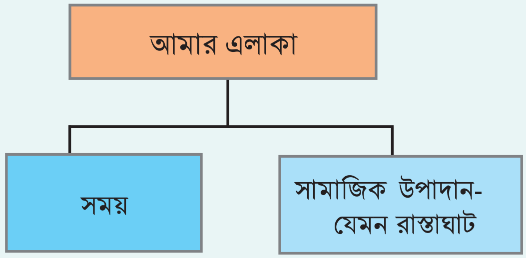
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন তৈরি করা	বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একাধিক প্রশ্ন তৈরি করব।	১. আমাদের এলাকার আগে রাস্তাঘাট কেমন ছিল? ২. আমাদের এলাকার বর্তমান রাস্তাঘাট এখন কেমন?
তথ্যের উৎস নির্বাচন করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করতে পারি তা নির্বাচন করতে হবে।	এলাকার রাস্তাঘাটের আগের ও বর্তমানের অবস্থা জানার জন্য এলাকার বয়স্ক লোক নির্ধারণ করব। আমরা কতজনের কাছ থেকে তথ্য নেব তা-ও নির্ধারণ করব। এ ছাড়া বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, মিউজিয়াম ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।
তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ	তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা দলীয় আলোচনা/সাক্ষাৎকার /পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি।	এলাকার রাস্তাঘাটের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করে সাক্ষাৎকার নেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করব।
সময় ও বাজেট নির্ধারণ	অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনার জন্য আমাদের কোনো অর্থের প্রয়োজন আছে কিনা এবং কতটুকু সময় লাগতে পারে তা নির্ধারণ।	অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনার জন্য কোনো অর্থের প্রয়োজন হবে কি না, তা নির্ধারণ করব। যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, নূন্যতম কত টাকার মধ্যে আমরা অনুসন্ধানী কাজটি করব, তার একটি হিসাব তৈরি করব। অনুসন্ধানী কাজটি কত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করব তারও পরিকল্পনা করব।

তথ্য সংগ্রহ করা	এই ধাপে নির্বাচিত তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করব। তথ্য সংগ্রহের সময় আমরা টেপ রেকর্ডার ব্যবহার বা খাতায় নোট করে রাখতে পারি। তবে অবশ্যই তথ্যদাতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই এই কাজটি করতে হবে।	এলাকার রাস্তাঘাটের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য নেওয়ার জন্য বয়স্ক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করব।
তথ্য বিশ্লেষণ করা	সংগৃহীত তথ্য পড়তে হয়, প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যে যেগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য তা নির্বাচন করতে হয় এবং সাজাতে হয় অথবা হিসাব নিকাশ করে গ্রাফ বা চার্ট আকারে প্রকাশ করতে হয়।	তথ্যদাতার প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করেন। তিনি অপ্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য দিতে পারেন। তাই আমরা অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য খুঁজে বের করে সাজাব।
ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	তথ্য বিশ্লেষণ করে যে উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়, সেটাই অনুসন্ধানী পদ্ধতির ফলাফল। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।	আমরা আমাদের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে এলাকার রাস্তাঘাট আগের ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে উত্তর পাব, সেটিই হচ্ছে আমাদের অনুসন্ধানী পদ্ধতির ফলাফল। এই ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নেব আমাদের এলাকার রাস্তাঘাটের কী রকম পরিবর্তন হয়েছে।
ফলাফল অন্যদের সঙ্গে উপস্থাপন ও শেয়ার করা	আমরা আমাদের ফলাফল গ্রাফ পেপার, পোস্টার, নাটিকা, ছবি, চার্ট ইত্যাদি উপায়ে উপস্থাপন করতে পারি। এছাড়া ম্যাগাজিনে বা ক্লাসে প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে পারি।	আমরা আমাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে এলাকার রাস্তাঘাট আগে কেমন ছিল এবং বর্তমানে কেমন সেটা তুলে ধরতে একটি ছোটো প্রতিবেদন লিখতে পারি। এছাড়াও ছবি এঁকে বা পোস্টারে লিখে বা ছোটো গল্প আকারে মৌখিক উপস্থাপন করতে পারি।

যে ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব, তাঁকে তথ্যদাতা বা উত্তরদাতা বলা হয়। তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্যদাতা বা উত্তরদাতার কাছ থেকে সম্মতি নিতে হয়। যদি তথ্যদাতার বক্তব্য আমরা রেকর্ড করি, তা-ও তাঁকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে বলতে হবে। তাহলে চলো, আমরা তথ্য গ্রহণের সময় করণীয় কয়েকটি নিয়ম সম্পর্কে জেনে নিই।

তথ্যগ্রহণের সময় করণীয়

১. অবশ্যই উত্তরদাতার কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে।

২. যদি তথ্যদাতার কথা রেকর্ড করতে হয়, সেটার জন্য অনুমতি নিতে হবে।

৩. তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখতে হবে কিনা তা জেনে নিতে হবে ।

৪. তথ্যদাতাকে জানিয়ে রাখতে হবে সংগৃহীত উত্তর শুধু তাদের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে ব্যবহার করবে। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

৫. কতটুকু সময় লাগতে পারে তা উত্তরদাতাকে জানাতে হবে। তিনি সেই সময় দিতে পারবেন কি না, তা জেনে নিতে হবে।

৬. তথ্যদাতা যদি উত্তর দেওয়ার কোনো এক সময় উত্তর প্রদান করতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন, সে মুহূর্তেই প্রশ্ন করা বন্ধ করে দিতে হবে।

৭. উত্তর দাতার উত্তর ঠিক না ভুল হয়েছে এ ধরনের কোনো কথা না বলা। যেন উত্তরদাতা সম্পূর্ণ নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

প্রশ্নমালা তৈরি

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা তৈরি করা যেতে পারে। যেখানে নিজ এলাকার সামাজিক উপাদান আগে কেমন ছিল এবং সামাজিক উপাদান এখন কেমন, সে বিষয়ে প্রশ্ন থাকবে। নিচে কয়েকটি প্রশ্ন সংবলিত একটি প্রশ্নমালা দেওয়া হলো।

এলাকার সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন

১. আমাদের এলাকার রাস্তাঘাট ৩০ বছর আগে কেমন ছিল?

২. আমাদের এলাকার রাস্তাঘাট এখন কেমন?

৩. এলাকার বাড়িঘর ৩০ বছর আগে কেমন ছিল?

৪. এলাকার বাড়িঘর এখন কেমন?

৫. ....

৬. ....

আমাদের তৈরি করা প্রশ্ন অনুসন্ধানের জন্য উপযোগী কি না, তা বোঝার জন্য আমরা নিচের ছকটি ব্যবহার করতে পারি। আমরা (√/×) চিহ্ন দিই।

প্রশ্ন	প্রশ্নটির উত্তর আমরা এখনো জানি না	প্রশ্নটির উত্তর জানার আগ্রহ আমাদের আছে	প্রশ্নের উত্তর পেতে কী করতে হবে, কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে তা বুঝতে পারছি	প্রশ্নটির উত্তর পেতে যা করা দরকার তা আমরা করতে পারব	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাওয়া সম্ভব
১					
২					

উপরের ছকে যদি সবগুলো কলামে টিক চিহ্ন হয়, তখন আমরা বুঝব আমাদের তৈরি করা প্রশ্নগুলো অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত।

তথ্যে উৎস (তথ্যদাতা/উত্তরদাতা নির্ণয়)

তথ্যদাতার নির্ণয়ের সময় লক্ষ্য রাখব:

১. তথ্যদাতা প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম কি না। তিনি সেই বিষয় সম্পর্কে যথাযথভাবে জানেন কি না।

২. আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে নিজ বয়স বা আয় সম্পর্কে তথ্যদাতা উত্তর দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি তথ্যদাতার বয়স বা আয় জিজ্ঞেস না করে একটু কৌশলী হতে পারি। যেমন: অতীতের কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য ঐ সময় তথ্যদাতা কোথাও পড়াশোনা করতেন কি না, অথবা তখন তার বন্ধু বা খেলার সাথিরা কী করতেন তা জানতে পারি। এভাবে জিজ্ঞেস করে তথ্যদাতার বয়স সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি। এ ধারণা থেকে আমরা হয়তো বুঝতে পারব, ঐতিহাসিক বিষয়ে তথ্য দেওয়ার মতো উপযুক্ত বয়স তখন তথ্যদাতার ছিল কি না।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। যেমন: সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি। আমরা এই তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

সাক্ষাৎকার	দলীয় আলোচনা	পর্যবেক্ষণ
সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে প্রশ্নমালার মাধ্যমে আমরা একজন তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।	এই পদ্ধতি ৫-৮ জন তথ্যদাতাকে নিয়ে একটি দল গঠন করে আমরা প্রশ্নমালার সাহায্যে উত্তর নিতে পারি।	এই পদ্ধতিতে একটি পর্যবেক্ষণ লিস্ট তৈরি করে যে কোনো বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়।

চলো, এখন তাহলে আমরা নবম শ্রেণির এক বন্ধু রাজু কীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তার এলাকার সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন অনুসন্ধান করল তা জেনে নিই।

রাজুর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি

রাজু নিজ এলাকার সামাজিক উপাদানের পরিবর্তনকে তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করল। এরপর সে সামাজিক উপাদান হিসেবে তার এলাকার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, যানবাহনের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করল। সে ঠিক করল, এলাকার ২০ বছর আগের সামাজিক উপাদানগুলো কেমন ছিল এবং বর্তমানে কেমন তা জানবে। এই দুই অবস্থা সম্পর্কে জেনে সে পরিবর্তনগুলো নির্ণয় করবে। তাই সে এলাকার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর ও যানবাহনের পরিবর্তন-সম্পর্কিত প্রশ্ন সংবলিত একটি প্রশ্নমালা তৈরি করল।

সে এলাকার চার জন বয়স্ক ব্যক্তির কাছে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করল। তথ্য সংগ্রহের সময় করণীয় সব নীতিমালা সে অনুসরণ করল। চারজন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য নিয়ে সে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করল। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করল।

রাজুর লেখা প্রতিবেদন দেখতে ইচ্ছা করছে? চলো, তাহলে প্রতিবেদনটি দেখে নিই। এই প্রতিবেদনের মতো করে একটি প্রতিবেদন আমরাও লিখব।

প্রতিবেদন

তারিখ: ২৪/০১/২০২৪

অনুসন্ধানের বিষয় আমার এলাকার সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন।

অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন আমার এলাকার সামাজিক উপাদান ২০ বছর আগে কেমন ছিল? আমার এলাকার সামাজিক উপাদান বর্তমানে কেমন?

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আমি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এজন্য চারজন বয়স্ক ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছি। প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রায় ২০ থেকে ৩০ মিনিট সময় নিয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করেছি। উত্তর সংগ্রহের সময় তথ্যদাতার কাছ থেকে সম্মতি নিয়েছি। তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু প্রশ্ন তৈরি করেছি। প্রশ্নগুলো ছিল এলাকার ২০ বছর আগের ও বর্তমানের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও যানবাহনের অবস্থা সম্পর্কিত।

তথ্য বিশ্লেষণ সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে পেয়েছি এলাকার ২০ বছর আগে কাঁচা রাস্তা ছিল যা বৃষ্টির সময় কর্দমাক্ত হতো। ১০ বছর আগে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে রাস্তা পাকা করা হয়। এখন জেলা শহরের সঙ্গে আমার এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। অন্যদিকে ২০ বছর আগে এলাকার অধিকাংশ বাড়ি ছিল টিনসেডের, বর্তমানে বেশিরভাগ বাড়ি দুইতলা বা তিনতলা বিশিষ্ট। সেই সঙ্গে, ২০ বছর আগে যেই যানবাহন ব্যবহার করত, এখন সেই একই ধরনের যানবাহন ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু ইদানিং রিকশার ব্যবহার বেড়েছে।

ফলাফল এলাকার সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে। রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরের ধরন পাল্টেছে এবং যানবাহন হিসেবে রিকশার চাহিদা বেড়েছে।

যৌক্তিক সিদ্ধান্ত এলাকার সামাজিক উপাদান সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা উন্নত করেছে।

দলীয় কাজ ২

এখন আমরা দলীয়ভাবে একটি অনুসন্ধান করব। আমরা এজন্য পূর্ব গঠিত দলের সবাইকে নিয়ে অনুসন্ধান করার পরিকল্পনা করব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা নিজ এলাকার প্রাকৃতিক বা সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন অনুসন্ধান করব। এজন্য আমরা দলগতভাবে আলোচনা করে ঠিক করব প্রাকৃতিক না সামাজিক– কোন উপাদানের পরিবর্তন আমরা অনুসন্ধান করব । খেয়াল রাখতে হবে যেন ক্লাসের সবকটি দল প্রাকৃতিক বা সবকটি দল সামাজিক উপাদান বাছাই না করে। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তা নেব।

এজন্য তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের আগে আমরা নিচের ছকের উত্তরগুলো দলে আলোচনা করে পূরণ করি।

ছক: অনুসন্ধানী কাজে তথ্য সংগ্রহের আগে করণীয়

প্রশ্ন	উত্তর
আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু কী?	
আমাদের অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্নগুলো কী?	
প্রশ্নগুলো অনুসন্ধানের জন্য উপযোগী কি?	
আমাদের অনুসন্ধানের তথ্যের উৎস কারা?	
আমাদের অনুসন্ধানের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি কোনটি?	
আমাদের অনুসন্ধানের জন্য কত সময় ও বাজেট প্রয়োজন?	
আমরা তথ্য সংগ্রহের সময় তথ্য দাতার কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছি কি?	

তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা কাজ ভাগ করে নিতে পারি। যেমন: প্রত্যেকেই একজন তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। আবার জোড়ায় বা এক সঙ্গে গিয়েও তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। আমরা এটা দলে আলোচনা করে ঠিক করব কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করব। সেইসঙ্গে আমরা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ৫-৬ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে একসঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

তথ্য সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করব। কোন কোন তথ্য আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা যাচাই করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দিতে হবে। সেইসঙ্গে তথ্যদাতাদের একই রকম উত্তরগুলো খুঁজে বের করে প্রতিবেদনে লিখতে হবে। তথ্য বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আমরা সম্মিলিতভাবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

দলীয় কাজ ৩

এবার আমরা আমাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে এলাকার সামাজিক উপাদান বা প্রাকৃতিক উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে, তা আলোচনা করে নিচের ছক পূরণ করি।

	ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট
সামাজিক উপাদান/প্রাকৃতিক উপাদান		

‘সেমিনার ও মুক্ত আলোচনা’

প্রতিটি দল অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজ এলাকার প্রাকৃতিক বা সামাজিক উপাদান কীভাবে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করে তা অনুসন্ধান করেছে। আমরা আমাদের অনুসন্ধানের ফলাফল একটি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে উপস্থাপন করব। আমরা পোস্টার পেপার, পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি। এই সেমিনারে উপস্থিত থাকার জন্য বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানাব।

উপস্থাপন শেষে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সংরক্ষণে মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে করণীয় নির্ধারণ করব।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদান সংরক্ষণে করণীয়

-
-
-
-
-
-

প্রতিফলন ডায়েরি: আমরা একটি প্রতিফলন ডায়েরি তৈরি করব। যেখানে আমরা আমাদের অনুসন্ধানের কাজের সময় যা যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা লিখে রাখব। সেখানে আমরা দলগতভাবে কাজটি কীভাবে করেছি? কী কী করলে অনুসন্ধানী কাজটি আরো ভালো হতে পারত। দলের বন্ধুরা কে কোন কাজ করেছে? ইত্যাদি অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা প্রতিফলন ডায়েরিতে লিখব।

প্রতিফলন ডায়েরি

আত্মপরিচয় ও মানবিক আচরণ

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা নিজেদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে লিখব। এরপর জোড়ায় বসে পরস্পরের আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল বের করে তালিকা করব। ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিজ আত্মপরিচয় খুঁজব। বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কীভাবে মানুষের আচরণিক রীতি তৈরি করে তা নির্ণয় করব। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মানুষের আচরণিক রীতিতে ভিন্নতা শনাক্ত করব। নিজ এলাকার মানুষের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আচরণিক রীতি বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করব। অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সিদ্ধান্ত প্যানেল আলোচনায় উপস্থাপন করব।

আমাদের সবারই আত্মপরিচয় রয়েছে। আমাদের একটি নাম আছে। একটি পরিবার, এলাকা, সমাজ আছে। আমাদের কিছু ভালো লাগা, খারাপ লাগা আছে। আমাদের স্বপ্ন আছে, বিশ্বাস আছে। আমরা খেয়াল করলে দেখব অনেকের সঙ্গে আমাদের অনেক কিছু মিলে গেলেও কিছু বিষয় থাকবেই যা আমাকে ভিন্ন করে তুলছে। এমনকি একই পরিবারের, একই মায়ের সন্তান হয়েও ভাই-বোনের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। আবার একই পরিবারের মানুষের একই ভাষা, পোশাক, রীতি-নীতি, উৎসব উদ্‌যাপন একরকম হয়। এভাবে ভিন্নতা ও সাদৃশ্যের মেল-বন্ধনে আমরা হয়ে উঠি অনন্য। চলো তাহলে আমরা এখন আমাদের আত্মপরিচয় খুঁজি।

অনুশীলনী কাজ ১: আমরা নিজেদের আত্মপরিচয় লিখি। নিজেদের আত্মপরিচয় লেখার সময় নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করব।

- আমার নাম
- আমার বয়স
- আমার লিঙ্গ
- আমার পূর্বপুরুষ
- আমার পরিবার
- আমার আবাসস্থল
- আমার দেশ
- আমার ভাষা
- আমার পছন্দের খাবার
- আমার পছন্দের গান
- আমার পছন্দের খেলা
- আমার যা করতে ভালো লাগে

চিত্র: আমার আত্মপরিচয়

আত্মপরিচয় লেখা শেষে আমরা আমাদের যেকোনো একজন সহপাঠীর সঙ্গে নিজের ও তার আত্মপরিচয় নিয়ে আলোচনা করি। এই কাজটি আমরা জোড়ায় করব। আমরা একজন সহপাঠী/বন্ধু বেছে নিই যার সঙ্গে আত্মপরিচয় নিয়ে আলোচনা করব।

জোড়ায় কাজ: আমরা নিজের আত্মপরিচয় ও সহপাঠীর আত্মপরিচয় নিয়ে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

অনুশীলনী কাজ ২: আমার ও আমার বন্ধুর আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল	
আমার ও আমার বন্ধুর যে পছন্দগুলো একরকম	আমার ও আমার বন্ধুর যে পছন্দগুলো ভিন্নরকম

দলগত কাজ ১

এখন আমরা ৫-৬ জন করে একটি নতুন দল গঠন করি। দলে আলোচনা করে নিজেদের আত্মপরিচয়ের কোন কোন বিষয়গুলো ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্ভর তা নির্ণয় করি। আমাদের আত্মপরিচয়ের কোন বিষয়কে আমরা কোন প্রেক্ষাপটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব তা জেনে নিই।

প্রেক্ষাপট	বিষয়
ভৌগোলিক পরিচয়	ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি
সামাজিক পরিচয়	সামাজিক অবস্থান, পেশাগত পরিচয়, পারিবারিক পরিচয় ইত্যাদি
সাংস্কৃতিক পরিচয়	ভাষা, পোশাক, রীতিনীতি, উৎসব ইত্যাদি
রাজনৈতিক পরিচয়	রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পরিচয়, রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি

অনুশীলনী কাজ ৩: ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের আত্মপরিচয় নির্ণয় করে নিচে লিখি।

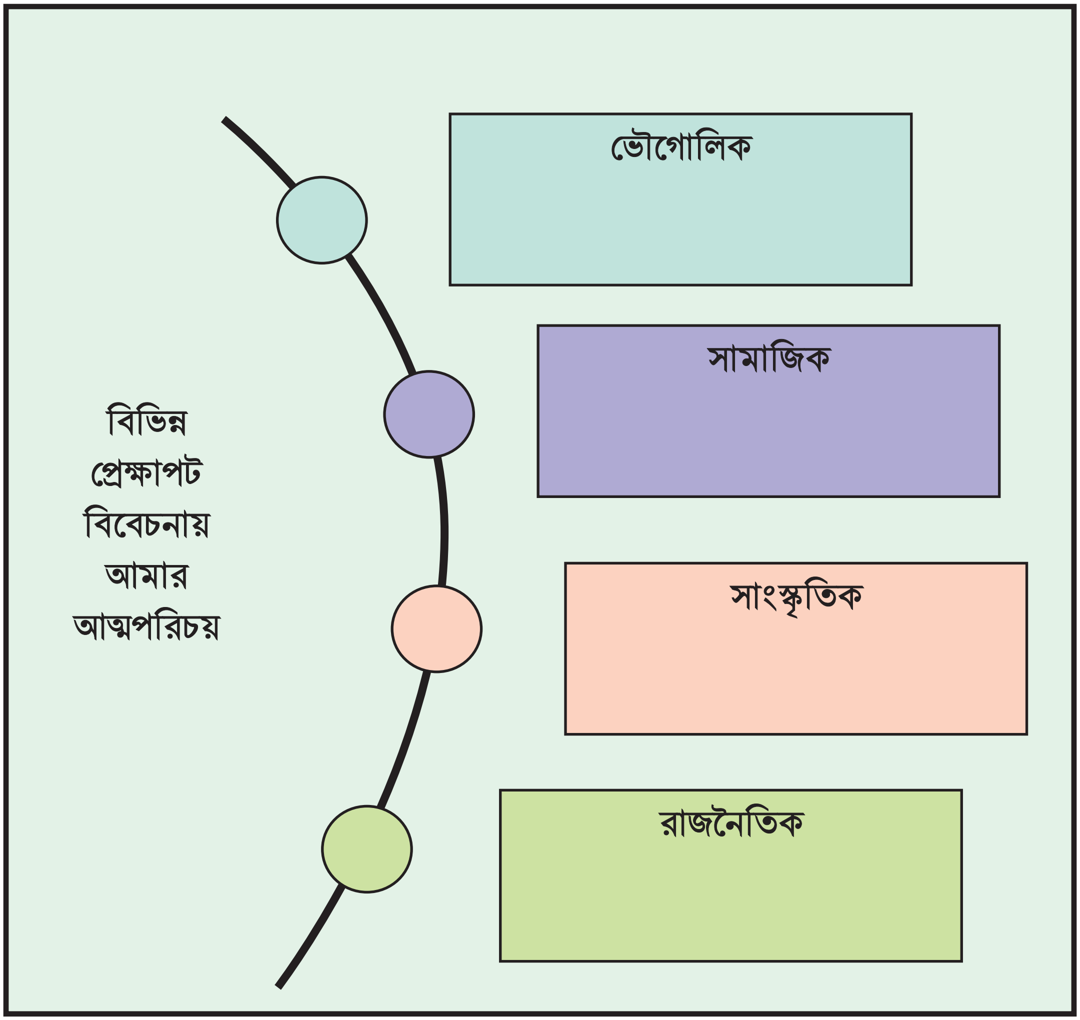

এখন আমরা আরব বেদুইনদের জীবন সম্পর্কে জেনে তাদের আচরণিক রীতি কীভাবে গড়ে ওঠে তা জানব।

আরব বেদুইনদের জীবন

আরব বেদুইনরা মরুভূমির অধিবাসী। তারা মরুভূমির উত্তপ্ত আবহাওয়া ও বালিঝড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন যাপন করে। তাদের নির্দিষ্ট কোনো আবাসস্থল নেই। মরুভূমির বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। এ জন্য মরুভূমির সব দুর্গম পথ তাদের জানা। ব্যবসা-বাণিজ্য বা মালামাল পরিবহণে যেকোনো কাফেলার পথপ্রদর্শক তারা। মরুভূমির খেজুরই হচ্ছে তাদের প্রধান খাবার। তারা বিভিন্ন পশু যেমন উট, ভেড়া ইত্যাদি লালন-পালন করে। যেখানেই এই পশুদের খাবারের জন্য জায়গা পায়, সেখানেই তারা সাময়িকভাবে থাকতে শুরু করে।

বেদুইনরা তাদের ঘোড়ায় চড়ে তীব্র বেগে চড়ে বেড়ায় মরুভূমির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। তাদের ক্লান্তিহীন অনিশ্চিত জীবন যেন অনেক গতিময়। যে জীবন ছুটছে নতুন কোনো সম্ভাবনার খোঁজে। মরুভূমির অবহাওয়া ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য তাদের করেছে পরিশ্রমী, উদ্যমী ও বলিষ্ঠ। যদিও আরব বেদুইনরা এখন আর যাযাবর জীবন কাটায় না। তবুও এখনো কেউ কেউ তাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচরণের প্রতিফলন পান বর্তমান তরুণদের মধ্যে। এভাবেই ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আরব বেদুইনদের আচরণিক রীতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে।

আমরা ইতোমধ্যে আরব বেদুইনদের নিয়ে যা যা জানলাম, তার সঙ্গে বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য নিয়ে আরব বেদুইনদের কয়েকটি আচরণিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করি।

অনুশীলনী কাজ ৪: আরব বেদুইনদের আচরণিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়

এভাবে ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্ভর করে কোনো একটি অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের আচরণিক বৈশিষ্ট্যে সাদৃশ্য তৈরি হয়। সাদৃশ্যময় এই আচরণিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়েই একটি অঞ্চলের আচরণিক রীতি তৈরি হয়। চলো, এখন আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের পরিচয় কিভাবে গড়ে উঠেছে তা জেনে নেয়।

বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার

আমরা জানি ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলেও বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকেই এই অঞ্চলের মানুষ ধীরে ধীরে জাগছিল। এ আন্দোলনে তরুণ বঙ্গবন্ধু যুক্ত থেকে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। আর বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জেলে থাকলেও নেতাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে গেছেন। ভাষা আন্দোলনকেই বলা যায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সোপান। মানে এ থেকেই বাংলাদেশের পথে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। তবে তা রাতারাতি হয়নি, একটি মাত্র আন্দোলনেও নয়। তারপর থেকে যুগপৎ রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলেছিল এই সময় থেকে।

ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশ নেওয়া ছাত্রী ও শিক্ষিকা

ভাষা আন্দোলনে জমায়েত সর্বসাধারণ

তখন রাজনীতি অত্যন্ত ঘটনাবহুল কিন্তু জ্যেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে একদিকে একাগ্রতার অভাব, সাহস ও ত্যাগের অভাব আর অন্যদিকে নানারকম দোলাচল ও সুবিধাবাদের ফলে ছাত্র-জনতার দুর্বার আন্দোলন সত্ত্বেও দেশ এগোতে পারেনি। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও নিজের জাতীয় পরিচয় নিয়ে সংকট ছিল। সদ্যই তখন ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে তিন টুকরো হয়েছিল, যার দুই প্রান্তের দুই টুকরা নিয়ে একটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং মাঝখানের হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র ভারত। যার ফলে অনেককে কেবল ধর্মের কারণে দীর্ঘ কালের আবাসভূমি ছেড়ে দেশ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তখনকার চলমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে বঙ্গবন্ধুও হতাশা প্রকাশ করেছেন। ১৯৫৪-এ ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পরেও পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি এবং মাত্র অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে পাকিস্তান সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদেশের নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তখন এটি ঠেকানো ও এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে নেতাদের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আত্মজীবনীতে লিখেছেন–

'এই দিন থেকেই বাঙালিদের দুঃখের দিন শুরু হলো। অযোগ্য নেতৃত্ব, নীতিহীন নেতা ও কাপুরুষ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কোনো দিন একসঙ্গে হয়ে দেশের কোনো কাজে নামতে নেই। তাতে দেশসেবার চেয়ে দেশের ও জনগণের সর্বনাশই বেশি হয়, (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ. ২৭৩)

রূপান্তরের কথা

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন তুলে নেওয়া হয় ১৯৬২ সালে। তারপর শুরু হয় ছাত্রদের আন্দোলন। তখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও দলের সমন্বয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে অনেক রকম দর-কষাকষি হয়েছে। কিন্তু তাতেও ফল হয়নি। ততদিনে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ ছয় দফার ঘোষণা দিলে তারপর থেকে এই বাংলায় সব আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তান সরকারও তাঁকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে সব সময় জেল জুলুমের মধ্যে রেখেছিল। সে ইতিহাস তোমরা জানো।

এখন আমরা বলব ১৯৭১ সালে বাঙালির রূপান্তর এবং এক বীর জাতিতে উত্তরণের পেছনে বড়ো কারণ হলো উপযুক্ত নেতার সঠিক নেতৃত্ব। বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি নেতৃত্বে সেদিন সব ধরনের বাঙালির রূপান্তর ঘটে এক বীরের জাতিতে। প্রকৃত বীর কেবল লড়াই করে না, প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগেও প্রস্তুত থাকে। বাঙালি বঙ্গবন্ধুর মধ্যে সেই নির্ভরযোগ্য সাহসী দৃঢ়চেতা নেতাকে পেয়ে, তাদের দেহ-মনে জেগে ওঠে মৃত্যুস্রোত ডিঙিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার প্রেরণা।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির কী কী রূপান্তর ঘটেছে তা খুঁজে বের করা জরুরি। কারণ, তা বাঙালির প্রচলিত পরিচয় মুছে দিয়ে এক নতুন ইতিবাচক পরিচয় দাঁড় করিয়েছিল।

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন

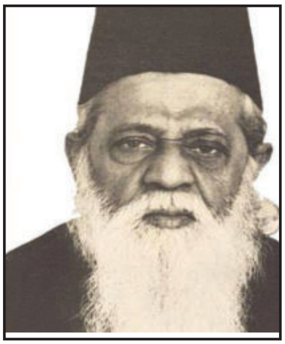

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

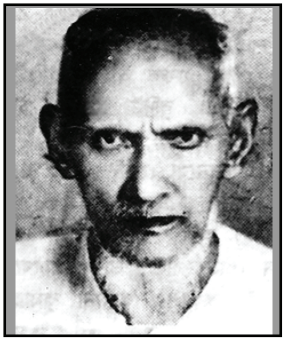

আবদুল করিম

পাকিস্তান সৃষ্টির পরপর ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকায় কার্জন হলে দুইদিনব্যাপী ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন’ আয়োজন করা হয়। যদিও এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবীবুল্লাহ বাহার তবুও এতে অংশগ্রহণ করে ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ অনেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনো রকম ধর্মীয় বিভাজনের বিরোধিতা করেন।

ড. শহীদুল্লাহ ছিলেন সম্মেলনের মূল অধিবেশনের সভাপতি এবং তিনি সভাপতির ভাষণে কয়েকটি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। তখন বাংলা হরফের বদলে আরবি হরফে বাংলা লেখার কথাও উঠেছিল। এ বিষয়ে ড. শহীদুল্লাহ বলেন, আরবি হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্যভান্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে।’ এই সময়ে তিনি একটি প্রবন্ধে লেখেন, ‘বাংলাদেশের (তৎকালীন পাকিস্তান) কোর্ট ও বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দি ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে।’ পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালের মার্চে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় ‘পাকিস্তান সংস্কৃতি সম্মেলন’, ১৯৫২ সালের আগস্টে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন’, ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন’, ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে মূলত তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন।

কাগমারী সম্মেলনে বক্তৃতারত মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

এসব সম্মেলন এবং ১৯৬১ সালে সামরিক শাসন উপেক্ষা করে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারা দেশে আয়োজিত রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সারা প্রদেশের শিক্ষিত মানুষ ও ছাত্র-তরুণদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বর্ষীয়ান গবেষক ও পুঁথি সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মানবিক ঐতিহ্য এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদার মানবিক ধারার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সেদিন বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যবিশারদ অনেক কথার মধ্যে বলেছিলেন, 'সর্বমানবের সংস্কৃতি আপনারা গড়ে তুলুন। ... চার শত বছরের সংস্কৃতির সম্পদে আজ আপনারা ঐশ্বর্যশালী।' পরবর্তীকালে প্রাবন্ধিক বদরুদ্দীন উমর এই অশীতিপর মনীষীর ভাষণটির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'চট্টগ্রাম সংস্কৃতি সম্মেলনের পর থেকে পূর্ব বাংলায় বিশ বৎসর কাল ধরে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের এই অভিভাষণকে সেই আন্দোলনের ঘোষণা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।'

(পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, পৃ. ৯৭)

সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন

ষাটের দশকটি শুরু হয়েছে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী (১৯৬১) দিয়ে। আইয়ুবের সামরিক শাসনের সব বাধা ও রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান হয়েছে। বিভিন্ন জেলা শহরেও উপলক্ষটি আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছিল। এসব অনুষ্ঠানে যেমন কবি গান, কবিতা, নৃত্যনাট্য, নাটক পরিবেশিত হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে প্রচুর সেমিনারও আয়োজিত হয়েছে। বলা যায়, এরপরে পুরো দশক বাঙালির এই সাংস্কৃতিক জাগরণ ও ব্যাপক অনুশীলনের সূত্রপাত ঘটে। এভাবে দশকব্যাপী চলেছে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন।

এই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর পরেই এটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং রবীন্দ্রসংগীতসহ বাংলা প্রমিত গান চর্চা ও এর ভিত্তিতে বছরে নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে ১৯৬৩ সালে সংগঠনটি কাজ শুরু করে। এ উদ্যোগে সেকালের প্রগতিশীল অনেক মানুষ যুক্ত হলেও এর লক্ষ্যাদর্শ নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী পরিচালনায় মূল ভূমিকা পালন করেছেন সাংবাদিক ওয়াহিদুল হক ও ড. সান্‌জীদা খাতুন। পরে ছায়ানট রমনার বটমূলে নববর্ষের প্রভাতি অনুষ্ঠান শুরু করে। অনেক জেলায় আগে থেকেই নববর্ষ উদ্‌যাপিত হলেও এবার যেন জাতীয়ভাবে সর্বত্র একই লক্ষ্যাদর্শে এ দিনটি উদ্‌যাপন শুরু হয়। আরও পরে তৎকালীন চারুকলা ইনস্টিটিউট (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ) থেকে চালু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। সাম্প্রতিক কালে এটি বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেসকের স্বীকৃতি পেয়েছে।

কবি সুফিয়া কামাল

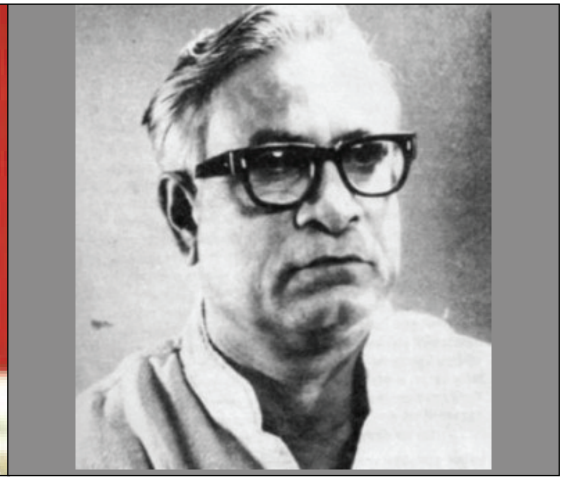

চিত্রকর কামরুল হাসান

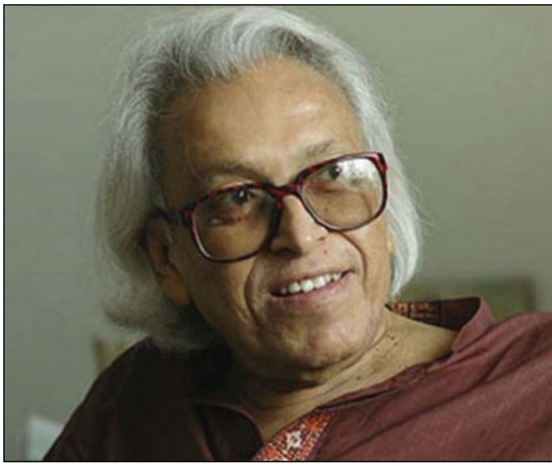

কবি শামসুর রাহমান

চলচ্চিত্রকার ও সাহিত্যিক জহির রায়হান

গুরু সদয় দত্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চাশের দশকেই প্রগতিশীল লেখক-শিল্পী-শিক্ষার্থীরা মিলে গঠন করেছিলেন সংস্কৃতি সংসদ। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তৎকালীন কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, কথাসাহিত্যিক ও চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান, শিক্ষাবিদ আনিসুজ্জামানসহ অনেকেই। পরবর্তীকালেও অগ্রসর সৃজনশীল ছাত্রছাত্রীরাই এতে যুক্ত হয়েছেন। ষাটের দশক জুড়ে সংস্কৃতি সংসদ, ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগসহ শিক্ষার্থীদের নানা সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গেছে। বাফা বা বুলবুল ললিতকলা একাডেমিও এই সময়ে সংগীতে-নৃত্যে দেশে প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক আবহ তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিল। এই দশক জুড়ে সারা দেশের স্কুল-কলেজেও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপনের

একট ধারা তৈরি হয়। এর ফলে প্রায় ঘরে ঘরে বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার প্রসার ঘটেছিল। এ সময় বিভিন্ন উপলক্ষে রাজধানীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়েছে, যাতে কবি সুফিয়া কামাল, শিল্পী জয়নুল আবেদিনসহ অনেকেই অংশ নিয়েছেন। শিল্পী কামরুল হাসান বর্ণমালা শাড়ি তৈরিসহ আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের অনেক মোটিফ ব্যবহার করে নানা পোশাক ও সামগ্রী তৈরি করেন। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলো রবীন্দ্র-নজরুল ছাড়াও বাংলা গানের চিরায়ত ভান্ডার থেকে আরও গুনী সংগীতজ্ঞদের গান পরিবেশনের ফলে। এভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেনের মতো বাংলা গানের অমর স্রষ্টাদের সঙ্গে সাধারণ শ্রোতাদের পরিচয় ঘটে। রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবও পড়েছে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। এ সময় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনসহ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট অনুপ্রেরণাদায়ী জাগরণের গান পরিবেশনেও অনেকে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ব্রতচারীর গান ও চর্চা যেমন বেড়েছে, তেমনি পরিবেশিত হয়েছে গণনাট্য সংঘের গান। এভাবে মুকুন্দ দাস, গুরুসদয় দত্ত বা গীতিকার জসীমউদ্‌দীনের সঙ্গেও সাধারণ শ্রোতাদের পরিচয় ঘটেছে। ক্রমে এই গণসংগীতের ভান্ডারে আমাদের দেশীয় শিল্পীদের অবদানও বাড়তে থাকে। শিল্পী আবদুল লতিফ, শেখ লুৎফুর রহমান, অজিত রায়, সুরকার আলতাফ মাহমুদসহ অনেকের অবদানে গণসংগীতের সমৃদ্ধ ধারা গড়ে ওঠে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ও এই ধারা অব্যাহত ছিল।

এভাবে ষাটের দশকের বাঁকবদলের রাজনীতির সঙ্গে একযোগে সংগ্রামী ভূমিকায় ছিল সাংস্কৃতিক অঙ্গন। জাতীয় জাগরণের লক্ষ্যে দশক জুড়ে পরিচালিত এই ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের কারণেই একে সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

আমরা বাঙালি হিসেবে আমাদের পরিচয় কীভাবে গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কে জানলাম। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আচরণিক রীতি নির্ণয় করব।

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এর একটি মানচিত্র আছে যা একটি ভৌগোলিক সীমারেখাকে প্রদর্শন করে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে হাজার বছরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। একসময় এটি ভারতবর্ষের অংশ ছিল। বিভিন্ন রাজা, মহারাজা, সম্রাট এদেশে এসেছেন এবং রাজ্য বিস্তার করেছেন। এভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমন এবং মিশ্রণ হয়েছে। এদেশটির স্বাধীনতার পেছনে রয়েছে লক্ষ্য মানুষের আত্মদান। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আসার পর থেকে এদেশের মানুষ শোষিত হয়েছে চরমভাবে। এরপর পাকিস্তানিদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার। প্রথম তারা আমাদের ভাষার উপর আঘাত হানল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদ হন এদেশের মাটিতে বেড়ে ওঠা রফিক, শফিক, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। এই শহিদদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের মাতৃভাষা। কালক্রমে নানা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করা আমাদের বাংলা ভাষাও আমাদের প্রকৃতি ও সংস্কৃতির এক অনবদ্য অংশ। এরপর আমরা বারবার সোচ্চার হয়েছি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমাদের নাগরিক ও মানবিক অধিকার নিয়ে। আর এই জাতিকে বলিষ্ঠভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ৯ মাস যুদ্ধের পর আমরা পেয়েছি আমাদের প্রিয় পতাকা ও একটি স্বাধীন মানচিত্র।

অনুশীলনী কাজ ৫:

চলো, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা নিজেদের আত্মপরিচয় নির্ণয় করি।

ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের
নাগরিক হিসেবে
আমার আত্মপরিচয়

সামাজিক প্রেক্ষাপট

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে একটি পরিচয় বহন করি। এই দেশের মানুষ হিসেবে আমাদের আচরণগত কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আচরণ, ভাষা, খাবার ইত্যাদিতে মিল আছে। কিন্তু আমরা যদি খেয়াল করি, তাহলে দেখব আমাদের দেশের সব অঞ্চলের মানুষের আচরণিক বৈশিষ্ট্য এক নয়। আমাদের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রয়েছে ভিন্নতা। যেমন: সিলেটের হাওর অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাপনের সঙ্গে পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনে ভিন্নতা রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গান, কবিতা ও গল্পেও ভিন্নতা দেখতে পাই। যেমন: সিলেটের হাসন রাজার গান, নদী বিধৌত বাংলার ভাটিয়ালি গান, উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলের গানের বৈশিষ্ট্য ও সুরে রয়েছে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব। উদাহরণস্বরূপ ভাওয়াইয়া গানের সুরে রয়েছে ভাঁজ। কারণ, উঁচু নিচু, ভাঙা রাস্তার উপর দিয়ে গরুর গাড়িতে বসে গায়েন যখন সুর ধরতেন তার গলার কাঁপুনিতে ভাজ পড়ত। এভাবেই ভাওয়াইয়া গানগুলো হয়ে ওঠে বৈশিষ্ট্যময়। অন্যদিকে সিলেট অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষায় রয়েছে ভিন্নতা। তাছাড়া এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের রয়েছে নিজস্ব ভাষা, পোশাক, রীতিনীতি, উৎসব উদ্‌যাপনের সংস্কৃতি। এভাবেই কোনো দেশের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যে গড়ে ওঠে একটি আচরণিক রীতি।

দলগত কাজ ২

এখন আমরা আগের দলে বসে যাই। দলের সবাই মিলে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি। আমরা বাংলাদেশের চারটি ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অঞ্চলের মানুষের আচরণিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করি। এরপর দলে আলোচনা করে আচরনিক রীতি লিখি।

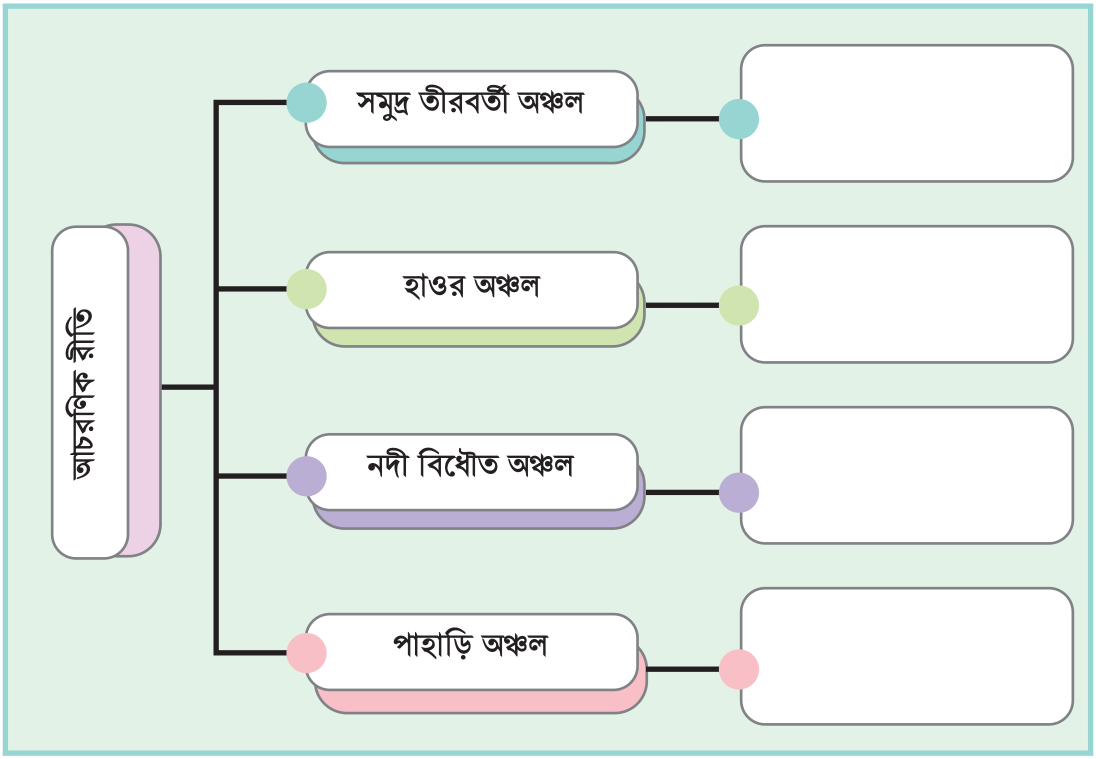

চিত্র: বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আচরণিক রীতি নির্ণয়।

দলগত কাজ ৩

এখন আমরা নিজ এলাকার মানুষের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে আচরণিক রীতি বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করব। এই কাজটি আমরা দলগতভাবে করব। এই কাজটি করার জন্য আমরা একই এলাকার সহপাঠীদের নিয়ে ৫-৬ জনের একটি দল গঠন করব। এরপর আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ধাপগুলো অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করব।

তথ্য সংগ্রহের নমুনা প্রশ্ন:

১. আপনার জন্মস্থান কোথায়?

২. আপনার পূর্বপুরুষ কোথায় থাকেন?

৩. আপনি পরিবারে কোন ভাষায় কথা বলেন?

৪. আপনার পরিবারের প্রধান খাবার কী?

....

....

- প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ততথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজ এলাকার মানুষের আচরণিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে আচরণিক রীতি নির্ণয় করি।

প্যানেল আলোচনা আয়োজন

আমরা একটি প্যানেল আলোচনার আয়োজন করি। প্রতিটি দল আমাদের অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত নিজ এলাকার মানুষের আচরণিক রীতি প্যানেল আলোচনায় উপস্থাপন করব। এ জন্য আমরা ছবি, পোস্টার পেপার, পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারি।

‘বাংলাদেশ’ ও ‘বঙ্গবন্ধু’ — মানবতাবাদী ধারা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের বিষয়টি তুলে ধরব। আমরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত তথ্য এবং এলাকার মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানেন এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এরপর আমরা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থান থেকে আমাদের করণীয় কী কী তা নির্ধারণ করব। সবশেষে আমরা ছাব্বিশে মার্চের দিন ‘বঙ্গবন্ধু মেলা’র আয়োজন করে বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ঘটনার উপর কেস স্টাডি তৈরি করে উপস্থাপন করব।

দলগত কাজ ১

আমরা ৫ থেকে ৬ জনের দল গঠন করি। এরপর আমরা দলে বসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ নিয়ে আলোচনা করে একটি প্রবন্ধ/কবিতা/ছবি/দেয়ালিকা তৈরি করব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ

আমরা ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নতুন কিছু তথ্য জানতে পারব। আমরা জানব বঙ্গবন্ধু কীভাবে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ এবং স্বাধীনতার চেতনা সমগ্র বাঙালির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে জানব জীবনের পরতে পরতে বঙ্গবন্ধু যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, তা উপস্থাপন করে আমরা সব সময় ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেব। চলো, তাহলে আমাদের এই মহান নেতা ও দেশপ্রেমীককে নিয়ে আমরা কিছু তথ্য জেনে নিই।

এমন একটি বিষয়ে আজ আমরা আলাপ করব যার সঙ্গে চারটি শব্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত– ‘বঙ্গ’, ‘বাংলাদেশ’, ‘বঙ্গবন্ধু’ ও ‘বিশ্ববন্ধু’। চারটি শব্দই আমাদের সকলের কাছে পরম ভালোবাসার। একটা মজার বিষয় লক্ষ করে দেখতে পারো– যে চারটি শব্দ বলা হয়েছে, তার প্রতিটি ‘ব’ অক্ষর দিয়ে শুরু। আজকের আলাপে প্রসঙ্গক্রমে ‘ব’ দিয়ে শুরু আরো একটি শব্দ আমাদের ব্যবহার করতে হবে– ‘বঙ্গীয় ব-দ্বীপ’। এই শব্দগুলোর মধ্যেকার ঐতিহাসিক সংযোগ ও সম্পর্ক খুঁজে দেখার মাধ্যমে ‘বঙ্গ’ থেকে ‘বাংলাদেশ’ এবং ‘বঙ্গবন্ধু’ থেকে ‘বিশ্ববন্ধু’তে রূপান্তরের ইতিহাস আমরা অনুসন্ধান করে দেখব। অনুসন্ধানের কাজ করতে গিয়ে বাংলা অঞ্চলে হাজার বছরে গড়ে ওঠা মানবতাবাদী চেতনার কিছু উদাহরণ খুঁজে বের করা হবে এবং সেই চেতনার ধারক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও মানুষের মুক্তির জন্য তাঁর লড়ায়ের দৃষ্টান্তমূলক কিছু উদাহরণ অনুধাবনের চেষ্টা করা হবে। বাংলার আঞ্চলিক সীমানার বাইরেও বিশ্বের সকল নিপীড়িত-নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন আমাদের বঙ্গবন্ধু। তাই তো ১৯৭৩ সালের ২৩ মে বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে সম্মানজনক ‘জোলিও কুরি’ পদক প্রদান করা হয় এবং তাঁকে ভূষিত করা হয় ‘বিশ্ববন্ধু’ অভিধায়। শেখ মুজিবুর রহমানের ‘ব্যক্তিত্ব’ এবং তাঁর ‘বঙ্গবন্ধু’ ও ‘বিশ্ববন্ধু’ উপাধির সঙ্গে আমাদের ‘বঙ্গ’ ভূখণ্ডের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের রয়েছে গভীর যোগসূত্র বা সংযোগ। বাংলা অঞ্চলের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং মাটি-কাদা-পানি আর সবুজের ঘেরা ভূ-প্রকৃতি থেকে প্রয়োজনমতো উদাহরণ নিয়ে আমাদের আলাপ ও অনুসন্ধান এগিয়ে যাবে।

বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও কয়েকটি প্রশ্ন

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে একজন ব্যক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করার আলাপে ভৌগোলিক বিষয়াবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ সাধারণত প্রাকৃতিক সীমানাবিধৃত কোনো একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অংশে বা অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বসতি স্থাপনকারী একদল মানুষ ইতিহাসের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বহু বিচিত্র চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে অর্জিত সামষ্টিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধীরে ধীরে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি রচনা করে থাকে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনেও ভূগোলের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ইতিহাস অনুসন্ধানের শুরুতেই একটি ভূখণ্ড নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক প্রতিকূলতা ও বৈশিষ্ট্যগুলো জানা প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার যোগ্যতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা। আঞ্চলিক ভূখণ্ডটির ভৌগোলিক সম্ভাবনাগুলোকেও খুঁজে বের করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের পূর্বাংশের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রাকৃতিক সীমানাবেষ্টিত একটি আঞ্চলিক ভূখণ্ড বাংলা। এই অঞ্চলেরই দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পৃথিবীর বৃহত্তর ব-দ্বীপ অবস্থিত। গঙ্গা নদীর দুটি প্রবাহের নাম ভাগীরথী ও পদ্মা। ভাগীরথী বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর পদ্মা বাংলাদেশের মধ্যে। গঙ্গার এই দুটি প্রবাহপথের অন্তর্বর্তী ভূ-ভাগ বঙ্গীয় ব-দ্বীপ নামে সারা পৃথিবীতে পরিচিত। এই ব-দ্বীপসহ গোটা বাংলা অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড় ও বিচিত্র সব জলাশয়।

মানচিত্র: আঞ্চলিক বাংলা ও বাংলাদেশ (১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

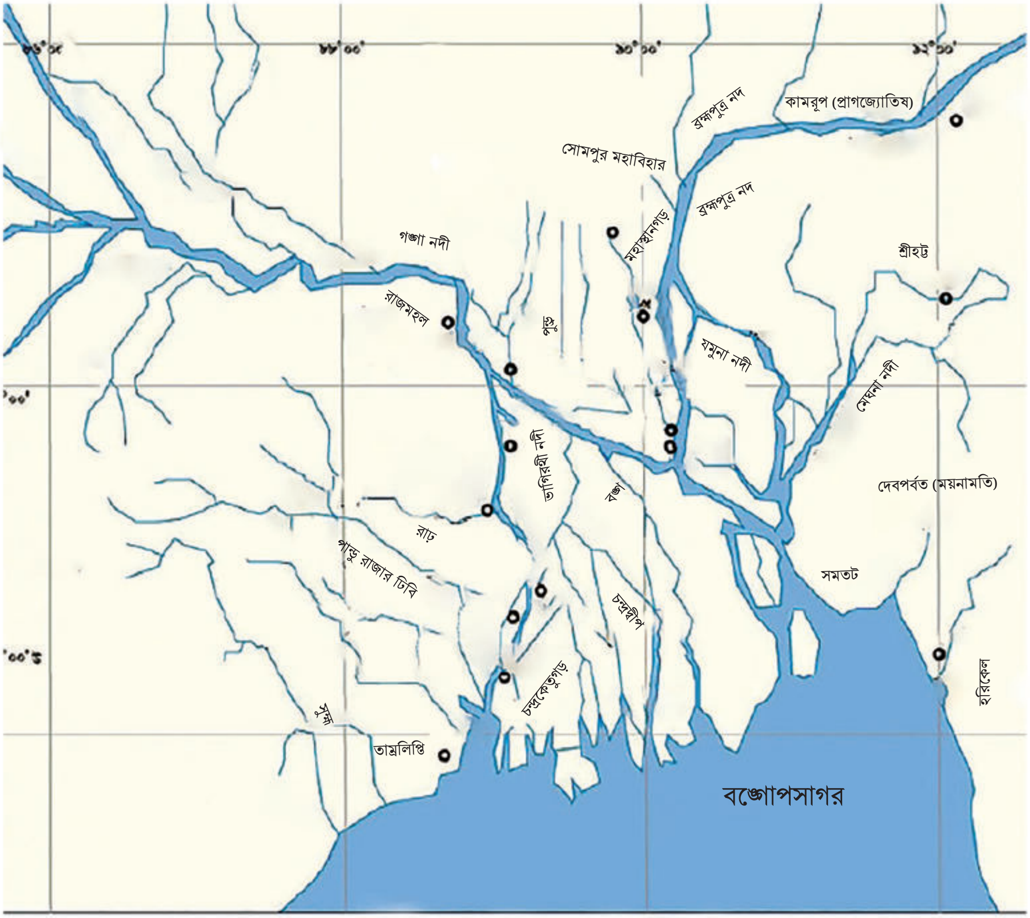

দক্ষিণ এশিয়া
ও
বাংলা অঞ্চল

নদ-নদী

বাংলা অঞ্চল

লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত অংশটি প্রাকৃতিক সীমানা বেষ্টিত বাংলা অঞ্চলের আনুমানিক সীমানা।

যাই হোক, একদিকে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এবং অন্যদিকে ক্ষমতাবান অত্যাচারী শাসকের নানান প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এই বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা প্রায় দুই হাজার বছর কাটিয়েছে, ভূখণ্ডটির কোনো একক রাজনৈতিক পরিচয় তখন ছিল না। ছিল না সুনির্দিষ্ট কোনো সীমানা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নাম-পরিচয় গড়ে তোলা হয়েছিল। সেগুলোরও কোনো সীমানা খুঁজে পাওয়া যায় না। নানান মানুষের বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড, নানান ঘটনা-দুর্ঘটনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর সমন্বয়ের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলা অঞ্চলের মানুষেরা সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি সচেতন হতে থাকে। হাজার বছরের দীর্ঘ পথপরিক্রমা শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম বাংলার কাদামাটি আর পানির ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে ওঠে এসে সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন। সফল হয়েছেন। বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের সুনির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে ১৯৭১ সালে ‘বাংলাদেশ’ নামে স্বাধীন-সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করেছেন। ভাষা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং সকল নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই চালিয়ে যাবার কারণে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুকে ‘বিশ্ববন্ধু’ অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে।

বঙ্গ, বাংলা, বাংলাদেশ– স্থান ও নামের বিবর্তন

বর্তমান আলাপে ‘বাংলাদেশ’ বলতে ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র, ‘বঙ্গ’ বলতে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক ইউনিট বা জনপদ এবং ‘বাংলা’ বা ‘বেঙ্গল’ বলতে একটি ভৌগোলিক একক বা ‘অঞ্চল’ বা ‘ভৌগোলিক সত্তা’কে আমরা বিবেচনায় নিতে পারি। ‘বাংলা’ নাম-পরিচয় মূলত ১৯৪৭-পূর্ব সময়, পরিস্থিতি এবং স্থানিক পরিচিতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক পরিচিতির আওতাভুক্ত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ও মেঘালয় প্রদেশগুলোর অংশবিশেষ। মনে রাখা প্রয়োজন, বাংলার এই আঞ্চলিক ভূখণ্ডেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত এই ভূখণ্ডে জাতি ও রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। স্থানিক এবং কালিক প্রেক্ষাপটে যেমন সীমানাগত হেরফের ঘটেছে, ঠিক তেমনই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন সময়ে এই ভূখণ্ড এবং ভূখণ্ডের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ‘পরিচিতি’ গড়ে উঠেছে।

আলোচ্য বাংলা ভূখণ্ডটি ভূ-প্রাকৃতিক গঠনগত প্রক্রিয়ায় তৈরি এবং এই গঠনে মানুষের কোনো হাত ছিল না। এর একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি, একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র এবং মাঝখানে সমভূমির সাম্য। দেখতে অনেকটা পিরিচের মতো ভূ-প্লেটটি দক্ষিণ দিকে কিছুটা ঢালু। ফলে তিন দিকের পাহাড় বেয়ে নেমে আসা জলরাশি সহজেই দক্ষিণের সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়। ভূ-গঠনপ্রক্রিয়া এ অঞ্চলে এনেছে বৈচিত্র্য। তিন দিকে উঁচু পাহাড়ি লাল মাটির বন্ধনীর মধ্যে দক্ষিণে ঢালু ভূ-ভাগটির একটি বড় অংশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-

মেঘনার বিপুল জলরাশি দ্বারা বয়ে আসা পলি গঠিত প্লাবন সমভূমি, যেখানে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ অবস্থিত। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় :

> 'এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূমি-খন্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-বরেন্দ্র-রাঢ়-সুক্ষ-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগীরথী-করতোয়া-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর-প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এই ভূখন্ডই ঐতিহাসিককালের বাঙালির কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।'

ইতিহাসের অসম গতি

ইতিহাসের অসম গতি মানে হলো নদী বা জঙ্গালের কারণে বিচ্ছিন্ন এলাকায় বা উপ-অঞ্চলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভিন্নতা। বাংলা অঞ্চল বড়ো বড়ো নদীর কারণে অন্তত ৪টি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত। এই উপ-অঞ্চলগুলোতে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনের অভিজ্ঞতা আলাদা। কোনো একটি অংশে মানুষ নিড়ানি দিয়ে কৃষিকাজ করছে তো অপর কোনো অংশে মানুষ হয়তো তখনো কৃষিকাজই শেখেনি। কোনো একটি অংশে নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছে কিন্তু অন্য কোনো অংশে হয়তো তখনো চলছে কৌমভিত্তিক অর্থাৎ গোত্রভিত্তিক জীবন। এক অংশে মুদ্রার প্রচলন ঘটেছে কিন্তু অন্য অংশে হয়তো তখনো মানুষ মুদ্রা চোখেই দেখেনি। ইতিহাসের অসম গতি শিখতে গিয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই এখন ধারণা হয়েছে যে, সরলীকরণ করে যখন যুগ বিভাজন করা হয় তখন তা ইতিহাস সম্পর্কে নানান ভ্রান্তি তৈরি করতে বাধ্য। বাংলার উপ-অঞ্চলগুলোতে বসতি স্থাপনকারী মানুষের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় না নিয়ে গোটা অঞ্চলটিকে এক করে দেখানো এবং একই যুগের অধীনে অঞ্চলটির সবখানে একই রকম অগ্রগতি ঘটেছে তা লেখা বা বর্ণনা করা ইতিহাসের ব্যত্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পরিচয় গঠনের আদিপর্ব: বাংলা অঞ্চলে প্রাণ-প্রকৃতির বোঝাপড়া

হাজার বছর ধরে 'বঙ্গ' এবং 'বঙ্গাল' নাম-পরিচয়টি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকালে বাংলা অঞ্চলের খন্ড খন্ড অংশ শাসনকারী শাসকের অসংখ্য দলিলে এবং গ্রন্থে 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু এর স্পষ্ট কোনো সীমানার উল্লেখ নেই। দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের লিপিসহ আরো বেশ কয়েকটি উৎসে 'বঙ্গাল' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম-পরিচয়ের পাশাপাশি এই দুটি নাম দীর্ঘদিন টিকে থেকেছে।

মানচিত্র: বাংলা অঞ্চল, ব্রিটিশ বাংলা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

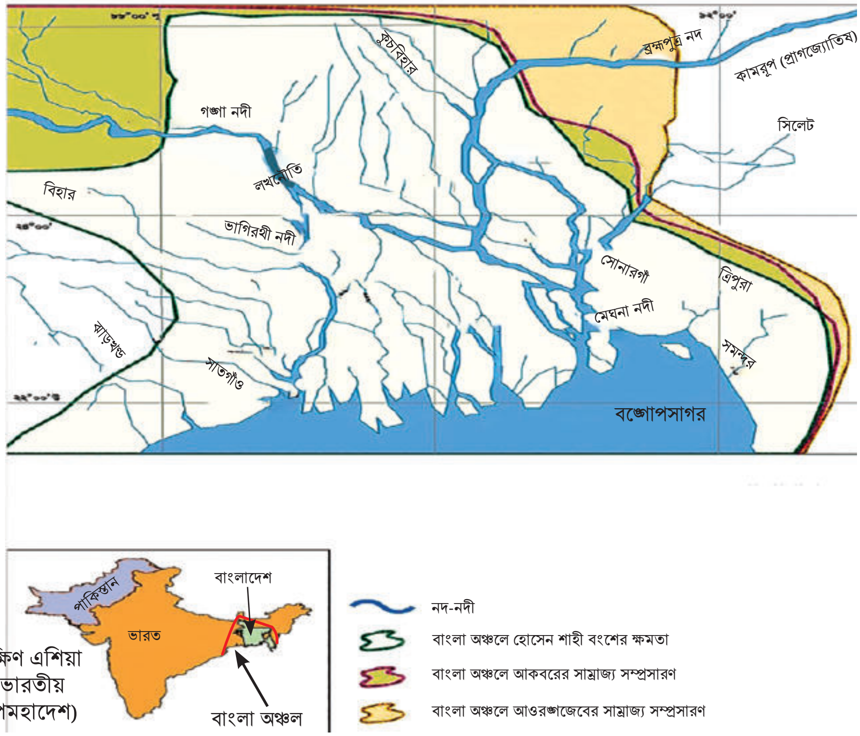

ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশ (বাংলা অঞ্চলের বড়ো একটা অংশ নিয়ে ব্রিটিশ বাংলা প্রদেশ গঠিত হয়েছিল)

পরিচয় গঠনের মধ্যপর্ব: বাঙ্গালা থেকে বেঙ্গাল (বাংলা)

মধ্যযুগে 'গৌড়' এবং 'বঙ্গ' সত্তার পৃথক পরিচয় গড়ে ওঠে 'লখনৌতি' এবং 'সোনারগাঁও' নামের ভিন্ন প্রশাসনিক পরিচয়ের আদলে। এ সময় 'সাতগাঁও' নামেও পৃথক একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র তার বিশেষ পরিচিতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গ ও গৌড় নামের প্রভাব-প্রতিপত্তি তখনও বজায় ছিল। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝিতে পারস্য (ইরান) থেকে আগত শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকা দখল করে 'বাঙ্গালাহ' নামের প্রাতিষ্ঠানিক প্রবর্তন ঘটান। এভাবে 'বঙ্গ' থেকে 'বঙ্গাল' এবং 'বঙ্গাল' থেকে 'বাঙ্গালা' নামের উৎপত্তি হয়। দিল্লির দরবারি ইতিহাসবিদ শামস-ই-সিরাজ আফিফ সুলতান ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' এবং 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ্' পরিচয়ে আখ্যায়িত করেন। এই বাঙ্গালার আইনগত সীমানা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। কেননা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশ ও রাজার ক্ষমতা বলয়ের সংকোচন ও সম্প্রসারণ ঘটে।

১৬ ও ১৭ শতকে পর্তুগিজদের বদৌলতে ইউরোপীয় লেখকদের কাছে বাংলা অঞ্চলের কিছু অংশ 'বেঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। ভারথেমা (১৫১০), বারবোসা (১৫১৪) এবং জাও দ্য ব্যারোসের (১৫৪০-১৫৫০) বর্ণনায় 'বেঙ্গালা' রাজ্য ও শহরের উল্লেখ রয়েছে। সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬৩-১৫৮১), রালফ ফিচ (১৫৮৬) প্রমুখও 'বেঙ্গালা' রাজ্যের অস্তিত্বের কথা লিখেছেন। সমসাময়িক মানচিত্রেও (যেমন রেনেল, ফানডেন ব্রোক প্রমুখ নির্দেশিত মানচিত্র) 'বেঙ্গা লা' রাজ্য বা শহরের অস্তিত্বের চিত্র আঁকা হয়েছে। পর্তুগীজদের দেয়া 'বেঙ্গালা' ইংরেজদের সময়ে 'বেঙ্গল' নামে রূপান্তরিত হয়। ১৯০৫ সালে নানাবিধ ঘটনা পরম্পরায় এই 'বেঙ্গল'কে দ্বি-খণ্ডিত করা হয় যা ইতিহাসে 'বঙ্গভঙ্গ' নামে পরিচিত। বঙ্গের এই ভঙ্গ বেশিদিন টেকেনি, ১৯১১ সালে গোটা অঞ্চলটিকে 'বেঙ্গল' নামে পুনরায় পরিচিতি দেওয়া হয়।

পরিচয় গঠনের সর্বশেষ পর্যায়: বাংলা থেকে বাংলাদেশ

বেঙ্গালাহ নামটি ১৮-২০ শতকে ব্রিটিশদের হাতে 'বেঙ্গল' নামে রূপান্তরিত হয়। এই বেঙ্গল কখনো হয়েছে 'ইস্ট বেঙ্গল' আবার কখনো 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'। ইতিহাসের তথ্যপ্রবাহ একটি বিষয় স্পষ্ট করে জানা যায় আর তা হলো বঙ্গ থেকে বেঙ্গল নাম-পরিচয় বিবর্তন আর রূপান্তরের প্রায় দুই হাজার বছরের ইতিহাসে কখনোই বাংলার সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণেই ভারতবর্ষের সর্বপূর্বপ্রান্তের প্রাকৃতিক সীমানা বিধৃত একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডকে 'বাংলা অঞ্চল' হিসেবে ভূগোলবিদ এবং ইতিহাসবিদগণ বিবেচনা করে থাকেন। এই বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অংশীদার-জনগোষ্ঠীর একটি অংশ অঞ্চলটির পূর্বাংশে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র-পরিচয়ের জন্ম দিয়েছে। বাংলা ভূখণ্ডের হাজার বছরের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে স্বাধীন 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যুদয় ঘটে, বঙ্গ থেকে 'বাংলাদেশ' নির্মাণ প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় এভাবেই রচিত হয়। আর এই পর্যায়েই সম্ভবত প্রথমবারের মতো জনমানুষের ব্যাপক ও বিপুল অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু' থেকে 'বিশ্ববন্ধু': মানবতাবাদী সুর ও সংযোগ সন্ধান

'বঙ্গ' ও 'বাংলাদেশ' এক ঐতিহাসিক কালপরিক্রমা ও কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। এই মন্তব্যেও কোনো অতিশয়োক্তি নেই যে, এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার সর্বশেষ ধাপটির সঙ্গে যে ব্যক্তি-নামের রয়েছে প্রধান সংযোগ তিনি হলেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিপ্রাপ্ত রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমান। ইতিহাসের ঊষালগ্নে ভূ-প্রাকৃতিক সীমানাবেষ্টিত জল-জঙ্গল সমন্বিত বিরল এই ভূখণ্ডে বহু-বিচিত্র চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে একদল মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং ক্রমান্বয়ে সমাজ-সংস্কৃতি রচনার পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই পদক্ষেপ গ্রহণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বঙ্গ ও বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের যে লক্ষণসমূহ ও সুরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'ব্যক্তিত্ব', ও 'নেতৃত্ব'-এর কোনো ঐতিহাসিক সংযোগ রয়েছে কিনা এ পর্যায়ে তা অনুসন্ধান করে দেখা যাক। অনুসন্ধানের এই কাজ করার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা ৩টি গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রন্থ তিনটির নাম 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা', এবং 'আমার দেখা নয়াচীন'।

বঙ্গবন্ধু তাঁর গোটা জীবন তিন ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও পরিচিতির অধীনে অতিবাহিত করেছেন। এগুলো হলো ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাজনৈতিক পরিচিতি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিচিতির এই তিন ধাপেই বঙ্গবন্ধুর জীবন ছিল দ্বন্দ্বমুখর এবং প্রতিনিয়ত ভাঙা-গড়া ও বাঁক বদলে সক্রিয়। উপরে উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থ এবং অগণিত ভাষণগুলোর বঙ্গবন্ধু বলেছেন, তিনি সব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে মানুষের মুক্তির জন্য রাজনীতি করেন। বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেই তিনি তা করার চেষ্টা করেছেন। আর একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ হিসেবে মুক্তির পথও সেই কাঠামোর মধ্যেই খুঁজেছেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ধারাবাহিক চিত্র অঙ্কন করলে তৎকালীন বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোগুলির সঙ্গে তাঁর প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বাংলা অঞ্চলে বিদ্যমান 'অসাম্প্রদায়িক' ও 'মানবতাবাদী' সুরের যে ইঙ্গিত ইতোমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে, তা বঙ্গ বা বাংলা ভূখণ্ডের জল-বৃষ্টি-মাটি-কাদার সঙ্গে মিলেমিশে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধুর 'ব্যক্তিত্বে' সব সময়ই ধারাবাহিকভাবে বজায় থেকেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের তিনটি পর্যায়কে কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কালানুক্রমিকভাবে খুব সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। কালানুক্রমিকভাবে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের প্রয়াস এই কারণে যাতে করে তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বঙ্গের উল্লিখিত আঞ্চলিক 'সুর' ও 'লক্ষণ'-গুলোর সংযোগ এবং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ অনুধাবন করা যায়। এই অনুসন্ধানের ভিত্তি হিসেবে অন্যান্য উৎসের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু রচিত তিনটি গ্রন্থ এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তাঁর ভাষণসমূহকেই মূলত নিবিড় পাঠ এবং সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায় (১৯২১-১৯৪৭)

শেখ মুজিবুর রহমান-এর জীবনে প্রথম রাজনৈতিক চিন্তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬। স্বদেশি আন্দোলনের রেশ তখনো রয়ে গেছে। এই আন্দোলন ও সুভাষ বোসের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত। সময়টা ১৯৩৬ সাল। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজশক্তিবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নাই। স্বাধীনতা আনতে হবে'। স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গেই বঙ্গবন্ধু তখন মেলামেশা করতেন। এরপর ১৯৩৮ সালে তৎকালীন বাংলার শ্রমমন্ত্রী ও মুসলিম লীগ নেতা হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী-র গোপালগঞ্জ আগমন উপলক্ষে তরুণ মুজিব দল-মতনির্বিশেষে স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। হিন্দু ছেলেরা কংগ্রেস নেতাদের কথায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ত্যাগ করতে শুরু করলে শেখ মুজিব বেশ অবাক হন। তিনি লিখেছেন, 'আমার কাছে হিন্দু মুসলমান বলে কোনো জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসঙ্গে গান-বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ানো সবই চলতো।'

দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৭-১৯৭১)

শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টির সূচনা হয় ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের মাধ্যমে সৃষ্ট পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে। ব্রিটিশ রাজশাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' বিভক্ত হয় দ্বিতীয়বারের মতো এবং এর পূর্বাংশের একটি অংশকে যুক্ত করা হয় প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূরবর্তী পাকিস্তান নাম-পরিচয় ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর

সঙ্গে। এভাবেই বঙ্গ বা বাংলার সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলটিকে এবং সেখানে বসবাসকারী মানুষদেরকে কৃত্রিম বিভাজন রেখা টানার মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত/বিযুক্ত করা হয়। উপেক্ষিত হয় তাদের হাজার বছরে গড়ে ওঠা সামষ্টিক অভিজ্ঞতা ও বসতির ঐতিহ্য। ১৯৪৭-১৯৭১ সময়পর্বে শেখ মুজিব উপলব্ধি করেন, নতুন এই কাঠামো কেবলই শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের এক রাজনৈতিক খোলস বদল মাত্র। এই পরিস্থিতি থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য তিনি ‘র‍্যাডাক্লিফ-রচিত সীমারেখার বাস্তবতা মেনে নিয়েই তৎকালীন দ্বন্দ্বমুখর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে ‘বঙ্গ’ থেকে ‘বাংলাদেশ’-এর পরিচয় নির্মাণ, এবং ‘বাঙালি’ নাম-পরিচয় প্রতিষ্ঠার জাতীয়তাবাদী স্তর একটির পর একটি অতিক্রম করতে থাকেন। লক্ষণীয় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেও শেখ মুজিবের ‘ব্যক্তিত্বে’ বঙ্গ বা বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ‘মানবতা’, ‘উদারতা’ ও ‘অসাম্প্রদায়িকতা’র যে কয়েকটি সুর ও লক্ষণ ইতোমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে, তা মুখ্য হিসেবে বিরাজমান দেখা যায়। এগুলোই হয়তো তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁর কর্মকাণ্ডকে দিয়েছে আদর্শিক ভিত্তি।

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল। শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় এসেছেন। ধর্মের নামে যে প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাগ করা হয়েছে তা নিয়ে তিনি ছিলেন ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। এই বিভাজনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম অংশের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান, হিন্দুসহ অন্যদের নিয়ে তিনি গভীর উদ্বিগ্নও ছিলেন। এ সময়ে তিনি ‘গণতান্ত্রিক যুবলীগ’ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার জন্য কাজ শুরু করেন। শেখ মুজিব লিখছেন, এই প্রতিষ্ঠানের “একমাত্র কর্মসূচি হবে সাম্প্রদায়িক মিলনের চেষ্টা, যাতে কোনো দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়, হিন্দুরা দেশ ত্যাগ না করে, যাকে ইংরেজিতে বলে কমিউনাল হারমোনি, তার জন্য চেষ্টা করা”।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে শেখ মুজিব যোগ দেন ভাষা আন্দোলনে। মুসলিম লীগ সমর্থক-কর্মীদের বিরোধিতার মুখেও তিনি এ-আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াননি। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সারাদেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়, ঢাকায় পরিচালিত সেই আন্দোলনে পুলিশি বাধা এবং নির্যাতন উপেক্ষা করে তিনি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ তে তিনি লিখছেন, ‘আমাদের প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরজনকে বেঁধে নিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিল সন্ধ্যার সময়। ফলে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। ঢাকার জনগণের সমর্থনও আমরা পেলাম। যাহোক, ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ’-এ শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক (জেলে বন্দি অবস্থায়) এবং ১৯৫৩ সালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে তাঁর উদ্যোগেই দলের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি প্রত্যাহার করা হয় এবং বাংলার সকল মানুষকে সম্পৃক্ত করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার ভিত্তিতে তিনি রাজনীতিতে ব্রতী হন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের বাঁক-বদল, ভাঙাগড়া এবং পরিচয় নির্মাণে এই সময়কাল ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা প্রশ্নে সক্রিয় আন্দোলনের পাশাপাশি ফরিদপুর, ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার ধানশ্রমিকদের উপর জারি করা পীড়নমূলক সরকারি হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের চলমান আন্দোলনে সমর্থন (১৯৪৯) এবং আরমানিটোলায় দরিদ্র মানুষের খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিলে (১৯৪৯) যোগদান করার কারণে শেখ মুজিব শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়েন এবং গ্রেপ্তার হন। ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মতো পাকিস্তান কাঠামোর অধীনেও শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে গণমানুষকে মুক্ত করার

কাজ এভাবেই তিনি চালিয়ে যেতে থাকেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র-পরিচয় ও রাজনীতির প্রতি নিজের মোহভঙ্গ নিয়ে শেখ মুজিব লিখছেন—

> ‘আমার ভীষণ জেদ হয়েছে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে। যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলাম, এখন দেখি তার উল্টা হয়েছে। এর একটা পরিবর্তন করা দরকার। জনগণ আমাদের জানত এবং আমাদের কাছেই প্রশ্ন করত। স্বাধীন হয়েছে দেশ, তবু মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর হবে না কেন? দুর্নীতি বেড়ে গেছে, খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের জেলে বন্ধ করে রাখা হচ্ছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মুসলিম লীগ নেতারা মানবে না। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প কারখানা গড়া শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। রাজধানী করাচী। সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব বাংলায় কিছু নাই।’

১৯৫২ সাল। শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পাকিস্তানের রাজধানী করাচি যান। করাচির ভূমিরূপ, আবহাওয়া দেখার পর তিনি বাংলার মানুষ বিশেষ করে মেহনতি কৃষক ও শ্রমিকদের মনন ও গড়নের সঙ্গে পাকিস্তানের ভূখন্ড ও মানুষের যে আকাশ-পাতাল দূরত্ব তা গভীরভাবে অনুভব করেন। তিনি লিখেছেন,

> ‘এই প্রথম আমি করাচি দেখলাম; ভাবলাম এই আমাদের রাজধানী! বাঙালিরা কয়জন তাদের রাজধানী দেখতে সুযোগ পাবে! আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সবুজের দেশে, যেদিকে তাকানো যায় সবুজের মেলা। মরুভূমির এই পাষাণ বালু আমাদের পছন্দ হবে কেন? প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনেরও একটা সম্বন্ধ আছে। বালুর দেশের মানুষের মনও বালুর মতো উড়ে বেড়ায়। আর পলিমাটির বাংলার মানুষের মন ঐরকমই নরম, ঐরকমই সবুজ প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যে আমাদের জন্ম, ঐ সৌন্দর্যই ভালোবাসি।’

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে শেখ মুজিবুর রহমান একটি শান্তি সম্মেলনে চীন সফর করেন। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে তিনি দ্বিতীয়বার চীনে যান পাকিস্তানের সংসদীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে। সেখানে ভাষণ প্রদানের সময় তিনি উর্দু বা ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে বেছে নেন। এই দুইবার চীন সফর শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। চীন সফরকালের সময়ের অভিজ্ঞতা মানুষ ও রাজনীতি নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও মতাদর্শিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যা আমার দেখা নয়াচীন গ্রন্থে নানাভাবে ওঠে এসেছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যাক। চীন যাবার পথে শেখ মুজিব মিয়ানমারের রেঙ্গুনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। রাষ্ট্রদূতের বিলাসবহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন দেখে তিনি লিখেছেন, “যাদের টাকা দিয়া এতো জাঁকজমক তাদের অবস্থা চিন্তা করলেই ভালো হতো। তাদের ভাতও নাই, কাপড়ও নাই, থাকবার মতো জায়গাও নাই। তারা কেউ না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। তাদেরই সামনে ছেলে-মেয়েরা না খেয়ে তিলে তিলে মারা যায়।’ সফরকালীন সময়ে চীনের বিভিন্ন স্থান, কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে দেখার ফাঁকে ফাঁকে শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি প্রটোকলের বাইরে গিয়েও কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের

সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন, তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা শুনেছেন, গল্প করেছেন, এমনকি তাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবার খেয়েছেন।

পর্যবেক্ষণে শেখ মুজিব দেখতে পান, খাদ্য বা ওষুধের অভাবে চীনে কোনো কৃষক মারা গেলে সেখানকার সরকারি কর্মচারীদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়। শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। অথচ বাংলার কৃষক ও শ্রমিকদের করুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, গ্রামে একজন কি দুজন মহাজন বা তালুকদার অথবা জমিদার থাকে। গ্রামের গরিব মানুষ কোনো বিপদে পড়লে, না খেয়ে থাকলে, মেয়ের বিবাহের সময় অথবা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লে মহাজনদের কাছ থেকে তারা টাকা ধার নেন জমি বন্ধক, কেউবা বাড়ি বন্ধক দিয়ে। দেখা যায়, আস্তে আস্তে গ্রামের বারো আনা জমি এই মহাজনদের হাতে চলে যায়, আর কৃষকেরা ভূমিহীন অথবা জমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। তারপর একদিন ‘কালের করাল গ্রাসে পড়ে বিনা চিকিৎসায় না খেয়ে মারা যায়’।

দ্বিতীয়বার চীন সফরের আগে ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘ওরা পূর্ব বাংলা নামের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তান নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য।’ ১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘শহিদ দিবস’ ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করে। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তা পালনও করা হয়। কিন্তু ওই বছরই মার্শাল ল জারি হওয়ার পর সরকারি ছুটি এবং শহিদ মিনার তৈরির কাজ বাতিল করা হয়। ১৯৬০ সালে শেখ মুজিব ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি মহকুমায় এবং থানায় নিউক্লিয়াস গঠন করেন। বঙ্গ বা বাংলা ভূখণ্ডের পূর্বাংশের ‘পূর্ব পাকিস্তান’ নাম-পরিচয় তিনি কখনই মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় (১৯৪৭-৭১)-এ বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ নাম-পরিচয় নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৯৬৯ সালে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিপ্রাপ্ত শেখ মুজিবুর রহমান ৫ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের এক আলোচনা সভায় ‘পূর্ব বাংলা’র নামকরণ করেন ‘বাংলাদেশ’ এবং বলেন,

> “একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে ‘বাংলা’ কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকু চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। .... একমাত্র ‘বঙ্গোপসাগর’ ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে ‘বাংলা’ কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি– আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম ‘পূর্ব পাকিস্তান’-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র ‘বাংলাদেশ’।”

ধারণা হিসেবে ‘বাংলাদেশ’ কখন বঙ্গবন্ধুর মাথায় এলো এরকম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘সেই ১৯৪৭ সালে। তখন আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির এক দেশ। বাঙালিরা এক হলে কী না করতে পারত। তারা জগৎ জয় করতে পারত।’

ভাষা শহিদদের স্মরণে আয়োজিত ভোরের র‍্যালিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং তাজউদ্দীন আহমদ। ছবির সময়কাল: ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

১৯৬৪ সালে শেখ মুজিব দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেন। একই বছর গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ, শুরু হয় আইয়ুববিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হন। কারাগার থেকে বের হয়ে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ছয়দফা দাবি পেশ করেন। বঙ্গবন্ধুর ছয় দফাগুলো হলো:

১. পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হবে। নির্বাচন হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র দুটি বিষয় থাকবে, প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অন্যান্য সকল বিষয়ে অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

৩. সারাদেশে হয় অবাধে বিনিয়োগযোগ্য দুধরনের মুদ্রা, না হয় বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একই ধরনের মুদ্রা প্রচলন করা।

৪. সকল প্রকার কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৫. অঙ্গরাজ্যগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে, এর নির্ধারিত অংশ তারা কেন্দ্রকে দেবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলোকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া।

'পাকিস্তান রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন থেকে বাংলার পূর্বাংশের মানুষের মুক্তির সনদ' হিসেবে এই ছয় দফা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও পরিচিতির আওতায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে গেলেও শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান' নাম-পরিচয়ের বদলে তাঁর বক্তব্য ও লেখায় 'পূর্ব বাংলা' শব্দটি বেশি ব্যবহার করেছেন।

সোনার বাঙলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	বাঙলাদেশ	পশ্চিমপাকিস্তান
রাজস্ব খাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	৩০০০ কোটি টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিক দ্রব্য আমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারে চাকুরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকুরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২.৫০ পয়সা
স্বর্ণ প্রতি ভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক পোস্টার। তৎকালীন আওয়ামী লীগের পক্ষে পোস্টারটি তৈরি করেন জনাব নূরুল ইসলাম এবং এঁকেছিলেন শিল্পী হাশেম খান

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রকৃত রূপটি শেখ মুজিব খুব ভালোভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসের লেখা,

> 'আইয়ুব খান সাহেব যাহাই বলুন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতেই হবে একদিন। না দিলে ফলাফল খুবই খারাপ হবে। ইতিহাস এই শিক্ষাই দিয়েছে। যখনই জনাব পূর্ব বাংলায় আসেন, তখনই তাঁকে বিরাট অভ্যর্থনা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় লাখ লাখ টাকা খরচ করে। দেখে মনে হয় তিনি বাদশা হয়ে প্রজাদের দেখতে আসেন। পশ্চিম পাকিস্তান তাঁর দেশ আর পূর্ব বাংলা তাঁর কলোনি।'

১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (পরবর্তীকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত তৎকালীন ঢাকার ইতিহাসের সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসংবর্ধনা এবং আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়। কেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি তা ব্যাখ্যা করে জনসমাবেশে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করলে যে সত্যটি সবচাইতে ভাস্বর হয়ে ওঠে তা হচ্ছে তিনি মানবদরদি- বিশেষ করে বাংলা ও বাঙালির দরদি, প্রকৃত বন্ধু। তাই তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদানের জনসভায় জনতার
মাঝে বঙ্গবন্ধু

গণসংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা' বলে অভিহিত করেন। এছাড়া তিনি রেডিও ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীতের উপর হতে সকল প্রকার বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, 'আমরা এই ব্যবস্থা মানি না। আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িবই, আমরা রবীন্দ্রসংগীত গাহিবই এবং রবীন্দ্রসংগীত এই দেশে গীত হইবেই।'

পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলার মধ্যকার দূরত্ব এবং দুটি পৃথক পরিচয়-সত্তার বিষয় পূর্বেও পরিস্ফুট হয়েছে এমন অসংখ্য উদাহরণে। হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি লোক চাঁদ দেখলে পূর্ব বাংলায় নাকি সরকারি হুকুমে ঈদ করতেই হতো, নামাজ পড়তেই হতো! আবার শেখ মুজিব পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষে কারাগারে গোলাপ ফুল বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন। এসব বর্ণনা বাংলার পৃথক পরিচয়-সত্তার স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী। যাই হোক, শেখ মুজিবুর রহমান সমকালীন রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন করে গেছেন, কারাগারে অন্তরীণ হয়েছেন বহুবার। ১৯৬৭ সালের মে মাসে কারাগারে বসেই তিনি লিখেছেন, 'জেলের ভিতর আমি মরে যেতে পারি তবে এ বিশ্বাস নিয়ে মরব, জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার একদিন আদায় করবে।'

এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বাঁক-বদল এবং পরিচয় নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রচিত হয় ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি পেশ করার মাধ্যমে। তাঁর আন্দোলনের গতিধারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পর থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন এতদঞ্চলের অবিসংবাদিত নেতা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতরে বসে সেই কাঠামোর নিয়মতান্ত্রিক বিরোধিতার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামে তিনি

বাংলার পূর্বাংশের ‘মানুষের মুক্তির পথ’ রচনা করেন। ১৯৭০ সালের ১১ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষদের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান গ্রহণ করে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। ১২ নভেম্বর গোর্কিতে উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটলে নির্বাচনী প্রচারণা বাতিল করে বঙ্গবন্ধু দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান, পাকিস্তানি শাসকদের ঔদাসীন্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং ত্রাণের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি অনুরোধ করেন। ১৯৭০-এর ঘুর্ণিঝড়ের মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যেই ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু মানুষের নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট অর্জন করেন।

তৃতীয় পর্যায় (১৯৭১-১৯৭৫)

বঙ্গ থেকে ‘বঙ্গবন্ধু’ আলোচনা পর্বের শুরুতেই যেমনটা বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু তাঁর গোটা জীবন তিন ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও পরিচিতির মধ্যে অতিবাহিত করেছেন; এবং বিদ্যমান কাঠামোর মধ্য থেকেই শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে মানুষের মুক্তির জন্য মানবতাবাদী রাজনীতি করেছেন। দ্বন্দ্বমুখর রাজনৈতিক পরিচয়, বাঁক-বদল, ভাঙাগড়ায় পূর্ণ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরটি রচিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম ‘বাংলাদেশ’ রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও পরিচিতির অধীনে।

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু ভারত-ভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে ‘মানুষ’কে রক্ষা করার জন্য অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী মনোভাব এবং সাহসী মনোবল নিয়ে কাজ করেছেন। পাকিস্তান অর্জিত হবার পর বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের শাসক শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছেন। ক্রমাগত বাঁক বদল এবং পরিচয় নির্মাণে অনেকগুলো স্তর পেরিয়ে এসে তিনি উপনীত হন ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে এই পর্যায়ে তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যান। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে বিপুল মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান রাষ্ট্র-ধারণার তেইশ বছরের ইতিহাসকে ‘বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস’ বলে অভিহিত করেন। পাকিস্তান শাসকবর্গের শোষণের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে সকল মানুষকে তিনি রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান। এমনকি পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর আগ্রাসী অবস্থান ও টহলের মধ্যেও অত্যন্ত কৌশলে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু বাংলার ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা’র নির্দেশ দেন।

ইতিহাসের সুদীর্ঘ কাল পরিক্রমায় বাংলার মানুষ কখনো প্রকৃতির প্রতিকূলতা কখনো বা প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা, ধর্ম, রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এই অদম্য প্রাণশক্তিই ছিল ৭ই মার্চের ভাষণের প্রাণ যা কিনা বাংলার বিরল ভূ-বৈশিষ্ট্য থেকে উৎসারিত এবং এতদঞ্চলের হাজার বছরের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মানুষের সামষ্টিক অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত। হাজার বছরের ইতিহাসে অস্তিত্ব রক্ষার যে অভিজ্ঞতা এই ভূমির মানুষের রয়েছে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আবুল কাসেম বলেন, ‘ছাত্র-জনতা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সামরিক ব্যক্তিত্ব তথা স্বাধীনতাকামী আপামর বাঙালি জনতার কাছে এই ভাষণ ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সবুজ সংকেত স্বরূপ।’ বঙ্গ থেকে বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর পরিচয় নির্মাণে ৭ মার্চের ভাষণ এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলার মানুষের ধারাবাহিক সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা মার্চে এমন এক নবতর পর্যায়ে উপনীত হয়, যেখানে নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা বাংলার মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে নতুন এক পরিচয় নির্মাণের পথে অগ্রসর হয়।

২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে সংঘটিত হয় ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা। এ রাতেই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক রাত ১টা ৩০ মিনিটে গ্রেপ্তার হবার পূর্বে রাত ১২টা ২০ মিনিটে (২৬শে মার্চ প্রথম প্রহর, ১৯৭১) বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন–

> ‘এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যে যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।’
>
> –বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ (প্রকাশ সাল ২০১২, পৃষ্ঠা-২৯৯)

এভাবে শেখ মুজিবের দেওয়া ‘বাংলাদেশ’ নাম এবং ‘জয় বাংলা’ স্লোগান ধারণ করে ৯ মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

চিত্র: ১৯৭১ সালের বর্বরতম গণহত্যা

পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ রাষ্ট্র-পরিচয়ের নতুন এক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং কাঠামোতে প্রবেশ করেন। এই দিন রেসকোর্স ময়দানে বিপুল সংখ্যক মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। (এই ভাষণের বিস্তারিত জানার জন্য mujib100.gov.bd ওয়েবসাইট দেখা যেতে পারে) এই ভাষণের একপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি উচ্চারণ করে তিনি বলেন,

> ‘রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি। কিন্তু কবিগুরুর সেই কথা আজ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।’

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবেশ করেই বঙ্গবন্ধুর এই উচ্চারণ তাৎপর্যপূর্ণ। ‘বাঙালি’ পরিচয় ছাপিয়ে ‘মানুষ’ পরিচয় প্রতিষ্ঠার দিকে বঙ্গবন্ধুর প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ দৃষ্টান্তমূলক। মুক্তিযুদ্ধে মানুষের ‘আত্মাহুতি’ ও ‘ত্যাগ’-এর কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘এমন নজির বাংলা ছাড়া দুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথায়! এত লোক আর কোথাও প্রাণ দেয় নাই।’

বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের প্রথম দুটি পর্যায়ে যে রাজনৈতিক পরিচিতি, পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে রাজনীতি করেছেন, সেখানে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে প্রধানত শাসক শ্রেণির সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী/রাষ্ট্রপতির পদে আসীন বঙ্গবন্ধু এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন তিনি। সদ্য জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের মানুষের ভেতরেও সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, ঘুষ, চুরি, জোতদারি এবং নানাবিধ অপ-তৎপরতা দেখে বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন অনেকখানিই ফিকে হয়ে যায়। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ কালপর্বে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ভাষণগুলোতে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশেই কিছু মানুষের দূর্নীতি, অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই জন্যই হয়তো তাঁকে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে দেখা যায়।

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২। ভোলার এক জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূমিহীন কৃষকদের ভূমি দান করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। একই বছর ডিসেম্বর মাসে সরকারি কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে তাঁর সম্মানে আয়োজিত একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেন,

> 'মেহনতি মানুষের মৌলিক অভাবসমূহ পূরণ না হইলে বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা নিষ্ফল হইয়া যাইবে। ... ধনী দরিদ্রের ব্যবধান অবশ্যই ঘুচাইতে হইবে। জনগণের স্বার্থের প্রশ্নে আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে কোনোদিন আপস করি নাই।'

শুধু ধনীদরিদ্রের বৈষম্য নয়, জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে 'মানবতা', 'অসাম্প্রদায়িকতা' এবং 'উদারতা'-এর নীতিতে অবিচল থেকে বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের রাজনীতিতে অবিচল ছিলেন বঙ্গবন্ধু। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামো থেকে বাংলাদেশকে তিনি স্বাধীন করেছেন। অথচ স্বাধীনতা অর্জনের এক বছরের মধ্যেই ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> 'সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করার রণকৌশল হিসেবেই আমি জাতীয়তাবাদী দর্শন অনুসরণ করেছি। এই মতবাদ কার্যকর হলে, আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের ভাবীকালের মানুষ ক্রমে ক্রমে জাতীয়তাবাদের গন্ডি পার হয়ে উত্তীর্ণ হবে বিশ্বমানবতাবাদী উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে।'

অপর এক মন্তব্যে বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত ভাষণে নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন,

> 'মুজিবুর রহমান নরম মানুষ, বাংলার মাটি যেমন নরম, পলিমাটি যেমন ভিজলে নরম হয়, আমিও তেমন নরম, আবার চৈত্রের প্রখর রৌদ্রে যেমন শক্ত হয় বাংলার মাটি, আমিও তেমন শক্ত হতে জানি।'

উল্লিখিত দুটি মন্তব্য থেকে বঙ্গবন্ধুর মানসপটের এমন একটি ছবি সামনে চলে আসে যেখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবন, নিরন্তর ভাঙাগড়া, বাঁক-বদল, দ্বন্দ্বের মধ্যেও শাশ্বত মানবতাবাদী সুর বা লক্ষণের অব্যাহত উপস্থিতির

প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষের সামগ্রিক মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িকতাকে নির্মূল করার জন্য বঙ্গবন্ধু বেছে নেন জাতীয়তাবাদ। আবার এই জাতীয়তাবাদের স্তর বা পর্যায়সমূহ অতিক্রম করে তিনি বিশ্বমানবতাবাদের দিকেই গন্তব্য স্থির করেন। এই গন্তব্যের স্বীকৃতিও তিনি অর্জন করেন। বিশ্বশান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরি' পদকপ্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুকে ১৯৭৩ সালের ২৩ মে পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল ভূষিত করেন 'বিশ্ববন্ধু' অভিধায়।

১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজেরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু দেশ-জাতি-বর্ণ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে গিয়ে নিজের অবস্থান নির্দেশ করেন। তিনি বলেন, 'পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শোষক শ্রেণি আরেক ভাগে শোষিত। আমি শোষিতের দলে।' ভাষা বা ধর্ম পরিচয়ের বদলে তিনি শ্রেণিকেন্দ্রিক আলোচনাকে সামনে আনেন এবং পৃথিবীর সব প্রান্তের শোষিত মানুষের পক্ষে নিজের অবস্থান ঘোষণা করেন। এই সম্মেলনে লিবীয় নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি এবং সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বঙ্গবন্ধুর। তাঁরা প্রস্তাব দেন, 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'এটা সম্ভব নয়। কারণ, বাংলাদেশ সবার দেশ। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মানুসারী সবারই দেশ।' আলজেরিয়ার এই সম্মেলনেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠক করেন কিউবার নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও সাহসের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে সেই সময়েই ক্যাস্ট্রো বলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসে এই মানুষটি হিমালয়। আমি এভাবেই হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতা পেয়েছি।'

মানবতাবাদী বিশ্ববন্ধু পরিচয় নির্মাণের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু যেখানেই গিয়েছেন বিশ্ব মানবতা, উদারতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার কথা প্রচার করেছেন। এ সকল আদর্শকে সামনে রেখে তিনি 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর সকল দলের অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের সোনার বাংলাকে শ্মশান করে গেছে। তবে তারা আমাদের সোনার বাংলার মাটিকে নিতে পারেনি।' ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বেতার ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> 'গরিব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যতদিন হাসি না ফুটবে ততদিন আমার মনে শান্তি নাই। এই স্বাধীনতা আমার কাছে তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে যেদিন বাংলাদেশে কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।'

এরপর তিনি দেশের যেসব মানুষেরা অসদুপায়ে টাকা অর্জন করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। একই ভাষণে তিনি আরো বলেন–

> 'আমরা ইতিহাসের একটা বিরাট সংকটকাল অতিক্রম করছি। আমাদের দেশ তিনশো বছর লুণ্ঠিত ও শোষিত হয়েছে। এর সমাজ ও অর্থনীতিতে হাজারো সমস্যা। সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই।'

১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করলে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উপস্থিত প্রতিনিধিদের বিপুল করতালির মধ্যে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন এবং নিজেকে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে ‘পরিচিতি’ প্রদান করেন। মানুষের অজেয় শক্তির প্রতি বিশ্বাস এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার ক্ষমতার ওপর প্রত্যয় ব্যক্ত করে বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘের বক্তৃতা শেষ হয়।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে কুমিল্লা সেনানিবাসে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন অপরাধ ও দুর্নীতিতে জড়িত মানুষের হাতে বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়ার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ‘আমি প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, তোমরাও প্রতিজ্ঞা নাও।’ মানুষকে যারা অত্যাচার করে তাদের উৎখাত করতে হবে বলে তিনি শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু মেহনতি মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতিবাজ শনাক্ত করতে গিয়ে বলেন,

> ‘শিক্ষিত সমাজ চাকরি করেন। আপনার মাইনা দেয় ঐ গরিব কৃষক। আপনার মাইনা দেয় ঐ গরিব শ্রমিক। আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়। আমরা গাড়ি চড়ি ঐ টাকায়। ওদের সম্মান করে কথা বলুন, ইজ্জত করে কথা বলুন। ওরাই মালিক।’

মানুষের কল্যাণে নিজ হাতে স্বদেশ গড়ে তোলার বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ-রকম অসংখ্য উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যায় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনিসুর রহমানের যে আগুন জ্বলেছিল গ্রন্থে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ততম তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৭১-৭৫) এসে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ গড়ার পাশাপাশি ধর্ম-জাতি-ভূমি-ভাষা-সংস্কৃতি হতে উদ্ভূত প্রায় সকল প্রকার ‘গৌরব’ ও ‘শ্রেষ্ঠত্ব’ স্থাপনের উর্ধ্বে ওঠে ‘মানব’ এবং ‘বিশ্বমানব’ রূপে পরিচয় প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন। এ সময়ে তিনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই গিয়েছেন সাম্য, উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতার আদর্শ দৃঢ়ভাবে প্রচার করেছেন। রাজনৈতিক জীবনের ভাঙা-গড়া ও বাঁক-বদলের স্তরসমূহ পেরিয়ে কেবল ‘মানুষ’ হিসেবে পরিচয় ধারণ ও ঘোষণার এক বিশেষ স্তরে বঙ্গবন্ধু নিজেকে উন্নীত করেছিলেন।

দলগত কাজ ২

আমরা পাঠ্যপুস্তক থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। এখন চলো আমরা একজন মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানে এমন কোনো বয়স্ক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিষয়ক কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিই। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য কয়েকটি নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হলো।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা

১. কেনো মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল?

২. পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা কেনো প্রয়োজন ছিল?

৩.বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা কী ছিল?

৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কারা অংশগ্রহণ করেছিল?

....

....

....

এরপর সাক্ষাৎকার এবং পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন সময়ের ঘটনা যেখানে তিনি ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার দৃষ্টান্ত রেখেছেন তার একটি টাইম লাইন তৈরি করি। আমরা প্রয়োজনে নিচের টাইম লাইনের মতো করে একটি টাইম লাইন এঁকে আমাদের অনুসন্ধানের প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করতে পারি।

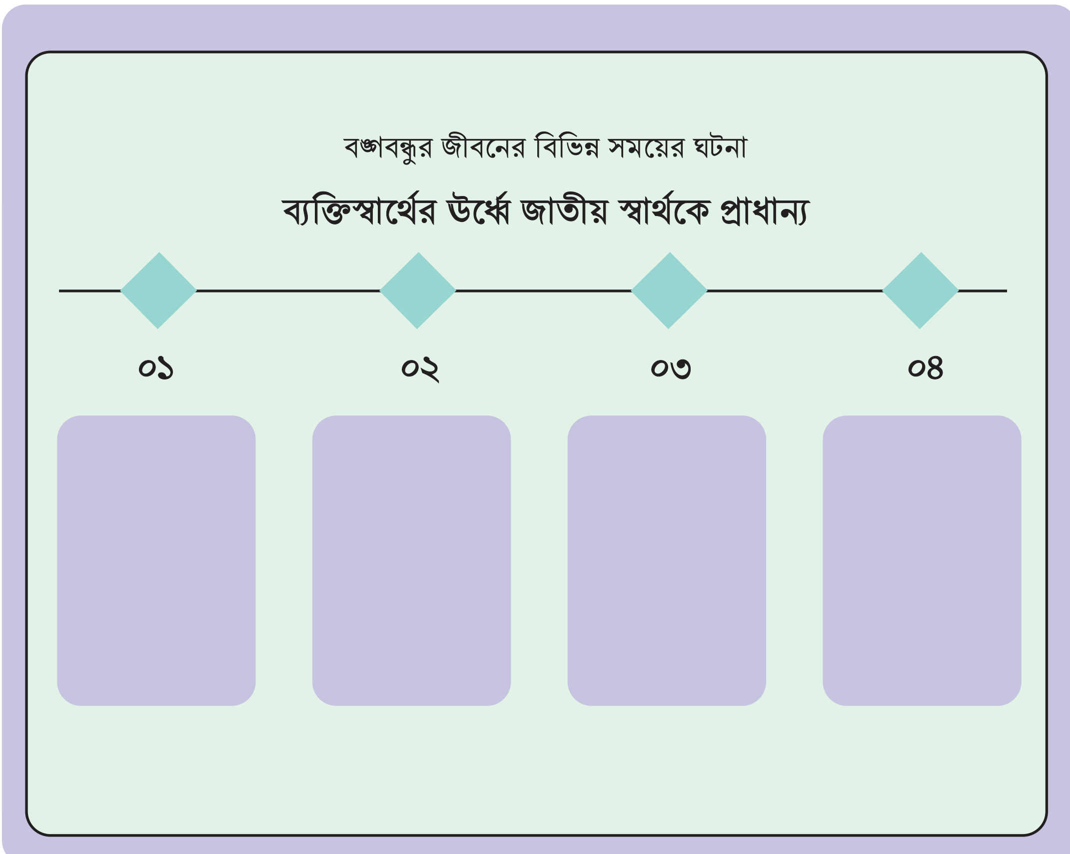

দলগত কাজ ৩

এখন আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিষয়ে আলোচনা করি। এরপর আমরা ‘ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়’ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। এরপর নিচের চিত্রের মতো চিত্র এঁকে পোস্টার পেপারে আমাদের করণীয়গুলো লিখে দেয়ালে টানিয়ে রাখি।

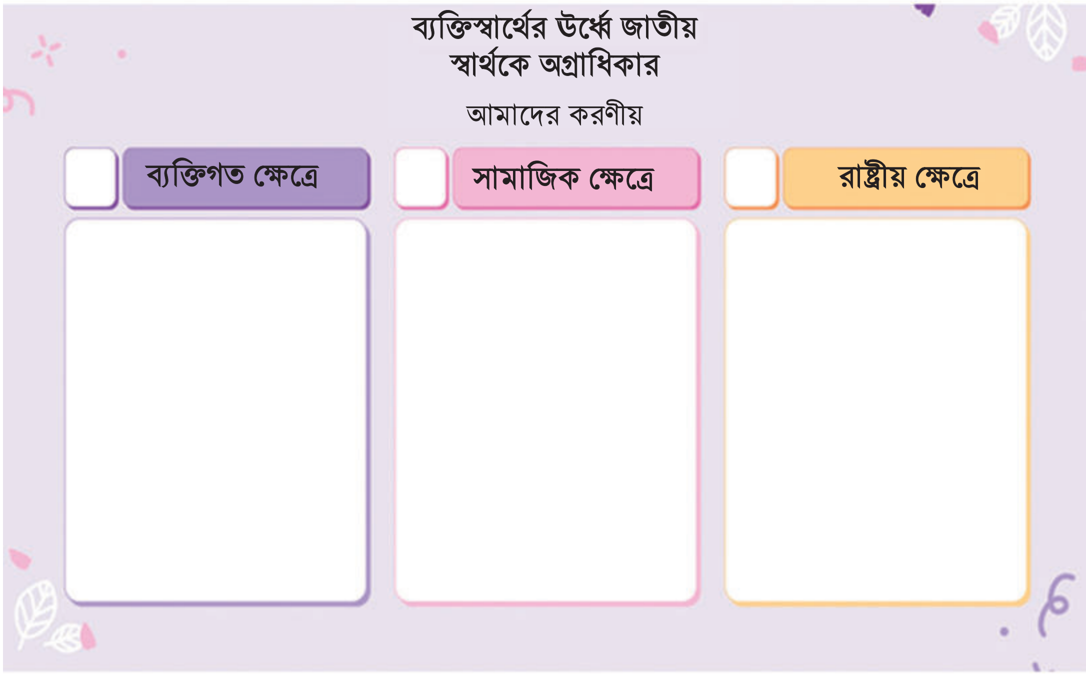

দলগত কাজ ৪

বঙ্গবন্ধু মেলার আয়োজন

আমরা আগে ৫ থেকে ৬ জন মিলে যে দল গঠন করেছি, সেই দলে এবারও কাজ করব। প্রতিটি দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের যেকোনো একটি ঘটনাকে কেস স্টাডি হিসেবে নেব। সেই ঘটনা-সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে একটি নাটিকা/পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করব। আমাদের তৈরি করা নাটিকা/পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ২৬শে মার্চে ‘বঙ্গবন্ধু মেলা’তে উপস্থাপন করব। এই মেলার আয়োজন করার জন্য আমরা বিদ্যালয়ে একটি স্থান ও সময় নির্ধারণ করব। মেলায় উপস্থিত থাকার জন্য আমরা এলাকার বিভিন্ন বিশিষ্টজনকে আমন্ত্রণ জানাব। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তায় আমন্ত্রণ পত্র লিখতে পারি।

রাজনৈতিক কাঠামো ও নাগরিক দায়িত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। আমরা সবাই কোনো না কোনো সমাজে বাস করি। সমাজের একটি গুরুত্বপর্ণ প্রাথমিক কাঠামো হলো পরিবার। মূলত আমাদের এই সামাজিক জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যই গড়ে উঠেছে পরিবার। তাহলে দেখো সমাজ কিংবা রাষ্ট্র সকল কাঠামো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আছে আলাদা আলাদা ব্যক্তি এবং তাদের আলাদা আলাদা ভূমিকা। এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলো বিশ্লেষণ করে এসব ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করব। সেই লক্ষ্যে পুরো শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা কিছু একক ও দলীয় কাজ করব।

স্থানীয়ভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান

আমরা তো জানি, বিদ্যালয় স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক কাঠামো এবং ইউনিয়ন পরিষদ/সিটি কর্পোরেশন একটি রাজনৈতিক কাঠামো। আমাদের প্রত্যেকের পরিবারে সকল কাজ শৃঙ্খলার মাধ্যমে করার জন্য পরিবারের সকল সদস্যকে আলাদা আলাদা ভূমিকা আছে তাই না! তেমনই আমাদের এলাকা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্যও কিছু মানুষ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আমরা এখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে ও ইউনিয়ন পরিষদ/সিটি কর্পোরেশনের যে কোনো একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির থেকে বিদ্যালয়ের এবং স্থানীয় সরকার পরিচালনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করব। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কে তো আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। যদি আবারও জেনে নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে প্রথম শিখন অভিজ্ঞতাটি আরেকবার ভালোভাবে দেখে নেব।

- কাজটি করার জন্য আমরা ২টি পৃথক প্রশ্নমালা তৈরি করে ইউনিয়ন পরিষদ /সিটি কর্পোরেশনের যে কোনো একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে স্থানীয় সরকার পরিচালনা এবং বিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করব। কাজটি আমরা ৫-৬ জনের দলে ভাগ হয়ে করব।

- নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্নমালা ব্যবহার করে আমরা আমাদের অনুসন্ধানের জন্য দুটি প্রশ্নমালা তৈরি করে নেব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নমুনা প্রশ্নমালা

বিদ্যালয়ের কাঠামো ও কার্যক্রম– সম্পর্কিত অনুসন্ধান

প্রশ্নমালা

১. বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম কীভাবে পরিচালনা হয়?

২. বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে কারা কারা যুক্ত আছেন?

৩. কীভাবে এসব দায়িত্ব বণ্টন করা হয়?

৪. একাডেমিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কী কী যুক্ত হলে আরো ভালো হতো বলে আপনি মনে করেন?

৫.........

৬.........

৭.........

ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশন কাঠামো ও কার্যক্রম সম্পর্কিত অনুসন্ধান

প্রশ্নমালা

১. ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশন সরকার কাঠামোর কোন স্তরে আছে?

২. এখানে দায়িত্বগুলো কে/ কারা বন্টন করেন?

৩. মূল কাজগুলো কী কী?

৪. আর কোন কোন কার্যক্রম এখানে যুক্ত হলে ভালো হতো বলে আপনি মনে করেন?

৫............

৬............

৭............

- অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা বিদ্যালয় ও ইউনিয়ন পরিষদে যেসব সেবা পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রে নিজের ভূমিকা চিহ্নিত করে নিচে দেওয়া ছক ব্যবহার করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করব। পোস্টার পেপার হিসেবে আমরা পুরোনো ক্যালেন্ডার বা কাগজের প্যাকেট ব্যবহার করতে পারি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সামাজিক কাঠামো (বিদ্যালয়)		
যেভাবে পরিচালিত হয়	যে ধরনের সেবা পাওয়া যায়	আমার ভূমিকা

রাজনৈতিক কাঠামো (ইউনিয়ন পরিষদ/ সিটি কর্পোরেশন)		
যেভাবে পরিচালিত হয়	যে ধরনের সেবা পাওয়া যায়	আমার ভূমিকা

স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বিশ্লেষণ

আমরা তো স্থানীয়ভাবে বিদ্যমান একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে জানলাম। নিশ্চয়ই এছাড়া আরো অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো স্থানীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে আছে তাই না! চলো তাহলে আমরা যা জানি এবং পাঠ্যবইয়ে বিদ্যমান তথ্যের ভিত্তিতে স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোগুলো বিশ্লেষণ করে নিজ নিজ অবস্থান শনাক্ত করি, পরে আমাদের কী কী ভূমিকা থাকতে পারে তা দলীয়ভাবে আলোচনা করে উপস্থাপন করি।

- নিচে দেওয়া ছক ব্যবহার করে আমরা তালিকা তৈরির কাজটি করতে পারি।

বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো	যে ধরনের সেবা পাওয়া যায়	আমার ভূমিকা
বিদ্যালয়	শিক্ষার্থী	বিদ্যালয়ের নিয়মকানুন মেনে চলা, পরিচ্ছন্নতায় সহযোগিতা করা............

বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো	আমার অবস্থান	আমার ভূমিকা
ইউনিয়ন/ সিটি কর্পোরেশন	নাগরিক	এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণ করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা প্রদান

বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদগুলোর তুলনামূলক যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে নিজের অবস্থান নির্ধারণ

বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাস বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। চলো আমরা এখন সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জেনে আসি। কাজটি করার জন্য আমরা আমাদের পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত রাজনৈতিক কাঠামো ও নাগরিক দায়িত্ব (অনুসন্ধানী অংশ) এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে এই শিখন অভিজ্ঞতা দুটি ভালোভাবে পড়ব। এরপর পাঠ্যবই ও অন্যান্য উৎস হতে বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদগুলো দলীয়ভাবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে আমার অবস্থান চিহ্নিত করব এবং অবস্থানের পক্ষে যৌক্তিক বিশ্লেষণ করব।

বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত তথ্য আমরা নিচে দেওয়া ছক অনুসরণ করে উপস্থাপন করবে।

বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান রাজনৈতিক মতবাদসমূহ	আমার অবস্থান	সপক্ষে যুক্তি

স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে প্রভাব ফেলে এমন কিছু কাজের তালিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো এবং এসব কাঠামোতে আমাদের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে জানলাম। এপর্যায়ে আমরা **গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের সদস্য নির্বাচন করে নবম শ্রেণির জন্য সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন করব।** সক্রিয় নাগরিক ক্লাব গঠন করে এই ক্লাবের একটি কার্যক্রম হিসেবে নিজ এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক

কাঠামোর আলোকে কিছু কাজ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করব যা স্থানীয় কাঠামোগুলোর পাশাপাশি বৈশ্বিক কাঠামোতেও প্রভাব ফেলবে।

প্রথমে আমরা **স্থানীয় ও বৈশ্বিকভাবে বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো–** এর আলোকে আমাদের যে যে ভূমিকা চিহ্নিত করেছিলাম তার মধ্যে ১/২ টি কাজ আমাদের এলাকার সাপেক্ষে নির্ধারণ করে আমাদের নবগঠিত সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করব। কাজটি করার জন্য আমরা শিক্ষক ও এলাকার প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা নেব।

কাজের তালিকা

রাজনৈতিক কাঠামো ও নাগরিক দায়িত্ব (অনুসন্ধানী অংশ)

আজ শ্রেণিকক্ষে এসে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের স্যার একটু যেন উদাস হয়ে আছেন। তাঁর এ মনোভাব দেখে সবাই একটু অবাকই হয়ে গেল। সীমা চুপ থাকার মেয়ে নয়, বলল– স্যার, আপনার কি মন খারাপ? স্যার কিছু না বলে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে একটু নাড়াচাড়া করে বললেন, শোনো–

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;

ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ॥

স্যার থামতেই ওরা হাত তালি দিল এবং সবার হয়ে সুলতানা বলল, চমৎকার একটা গান শোনালেন (বা কবিতা শোনালেন) স্যার আমরা কি পুরো গানটা শুনতে পারি?

স্যার বললেন, তার আগে একটা কাজ করি চলো।

এবার সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, কী কাজ স্যার?

স্যার বললেন, গানের কথাগুলো খেয়াল করো আরেকবার। এবার তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, পৃথিবীটা যেন হিংসায় উন্মত্ত হয়ে আছে, প্রতিদিনই নানা জায়গায় নিষ্ঠুর যুদ্ধবিগ্রহ চলছে। চলার পথ যেন অন্ধকার এবং কুটিল, পদে পদে লোভের প্রতিবন্ধক। এ সকল যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ন্য ভূমিকা পালন করে তার নাম কি তোমরা বলতে পারো। সবাই সমস্বরে বলল জাতিসংঘ। তাহলে চলো, সবাই মিলে জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানি।

জাতিসংঘ গঠনের পটভূমি

যুদ্ধ কখনো শান্তির বাহক হতে পারে না। যুদ্ধ আনে ধ্বংস, দুর্ভোগ এবং অশান্তি। বিশ্বজুড়ে হাহাকার, নিপীড়ন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এবং প্রায় মাঝামাঝি সময়ে দুটো বিশ্বযুদ্ধ আমাদের প্রিয় পৃথিবীকে অনেকটাই নিঃস্ব করে গেছে। এর একটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং অন্যটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। পৃথিবীব্যাপী জাতিগত দ্বন্দ্ব মেটানোর উদ্দেশ্যে শান্তির মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা কিছু মানুষ যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে চুপ করে বসে থাকেননি। সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টায় অবিচল ছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর পরই ১৯২০ সালের ১০ জানুয়ারি গোটা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'লিগ অব নেশনস' গঠিত হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে 'লিগ অব নেশনস' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই আরেকটা যুদ্ধ এসে কড়া নাড়া শুরু করল। ১৯৩৯ সালে শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ছয় কোটি মানুষ প্রাণ হারান; পঙ্গু ও আহত হন বহু লক্ষ মানুষ। অনেকেই ঘরহারা হন। কেউ কেউ পঙ্গুত্বকে আজীবনের সঙ্গী করেন।

বহু দেশ যুদ্ধে তাদের কর্মক্ষম যুবকদের হারিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। তোমরা জানো এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের ছোট্ট দুটি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা ফেলেছিল। তাতে মুহূর্তের মধ্যে হিরোশিমায় ৬৬ হাজার মানুষ ও নাগাসাকিতে ৪০ হাজার মানুষ প্রাণ হারান। আর আণবিক তেজস্ক্রিয়তায় আহত হয়ে দীর্ঘ পঙ্গু জীবন কাটিয়ে আরও প্রায় দুই লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। সেদিন দুটি নগরীই তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ

এ যুদ্ধ শুরু হয় একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বর্তমান বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাজধানী সারায়েভোতে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যর (আধুনিক অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি) যুবরাজ ফারডিনাগুকে সার্বীয় জাতীয়তাবাদীরা গুলি করে হত্যা করলে যুদ্ধের সূচনা হয়। হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল ২৮ জুন ১৯১৪ সালে। যে পক্ষ আক্রমণ করেছিল তাদের বলা হয় অক্ষ শক্তি বা কেন্দ্রীয় শক্তি। এই পক্ষে ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও তুরস্ক। অপর পক্ষকে বলা হয় মিত্রশক্তি। এই পক্ষে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও জাপান। অক্ষশক্তির পরাজয়ের মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয় ১৯১৮ সালে। এই চার বছরের যুদ্ধে ইউরোপের আরও দেশ জড়িয়ে পড়েছিল এবং রণাঙ্গন ইউরোপ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছিল। এ যুদ্ধে প্রায় এক কোটি মানুষ প্রাণ হারান এবং দ্বিগুণ মানুষ আহত হন। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জার্মানি ও তুরস্কের শক্তি খর্ব হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

বলা হয় প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানে যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল (বিশেষত ভার্সাই চুক্তি) তার মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। এই চুক্তি জার্মানির জন্য অবমাননা ও গ্লানিকর ছিল। ফলে মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে সেখানে অ্যাডলফ হিটলারের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী নাৎসি পার্টি ক্ষমতাসীন হয়। তারপর থেকেই শুরু হয় জার্মানির শক্তি সঞ্চয় ও বড়ো রকম যুদ্ধের প্রস্তুতি। পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর। এবারেও উভয় পক্ষে শক্তি সমাবেশ ঘটতে থাকে। জার্মানির নেতৃত্বে গঠিত অক্ষশক্তিতে ছিল ইতালি ও জাপান। মিত্রশক্তি হিসেবে ছিল ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম ধাক্কায় জার্মানি একে একে ইউরোপের দেশ পোল্যান্ড, হল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং ফ্রান্স দখল করে। তারা পূর্ব দিকেও বিজয়াভিযান পরিচালনা করেছে। আক্রান্ত রাশিয়া (সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন স্ট্যালিনের নেতৃত্বে জার্মানির আক্রমণ রুখে দেয় এবং পাল্টা অভিযান শুরু করে। এই যুদ্ধে চার্চিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডও প্রবল মনোবল দেখিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে সফল হতে থাকে।

এ যুদ্ধ একদিকে মারণাস্ত্রের ক্ষমতা ও সংখ্যা বাড়িয়েছে, অন্যদিকে আফ্রিকা ও এশিয়ায় স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথ তৈরি করেছিল। যুদ্ধে ব্যাপক হারে তরুণদের মৃত্যু হওয়ায় বিধ্বস্ত ইউরোপে নারীদের কর্মজগতে প্রবেশের বাস্তবতা তৈরি হয়। এতে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হয়। তবে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় তাদেরকে ঘিরে নতুন দুটি বলয় তৈরি হয়ে পুনরায় বিভাজন ও উত্তেজনা তৈরি করে। একে বলা হয় স্নায়ুযুদ্ধের (cold war) কাল। সরাসরি দুই পক্ষে যুদ্ধ না হলেও অস্ত্র প্রতিযোগিতা, অস্ত্রসজ্জা ও উত্তেজনা চলতেই থাকে। বিশ্বের নানা স্থানে সশস্ত্র সংঘাতও কখনো থামেনি।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরে তাই বলেছিলেন– যুদ্ধকে জয় করা গেছে, শান্তিকে নয় (The war is won but not peace)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে যেন নির্বাকও করে তোলে। তবে কেউ কেউ পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন করে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীতা অনুভব করেন। এই প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার উদ্যোগ নেন। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিশ্ব উত্তেজনা কমাতে অনেকগুলো শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক চার্টার (Atlantic Charter)-এ স্বাক্ষর করেন। এ সনদে বিশ্বের সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আক্রমণকারীদের নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা হয়েছিল। এসব আদর্শের উপর ভিত্তি করেই পরে জাতিসংঘ সনদ রচিত হয়। তবে জাতিসংঘ নামটি এসেছে ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারি ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিল, সেই ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে । এ চারটি দেশ এক ঘোষণাপত্রে আটলান্টিক চার্টারে বর্ণিত নীতি ও আদর্শের প্রতি তাদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেছিল যা 'United Nations Declaration' বা জাতিসংঘ ঘোষণা নামে পরিচিত। পরে ২ জানুয়ারি আরো ২২টি রাষ্ট্র এ ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানায়। জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট হিসেবে মস্কো ঘোষণা, তেহরান

সম্মেলন, ডুম্বারটন ওকস সম্মেলন ও ইয়াল্টা সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা মস্কোতে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন, যা মস্কো ঘোষণা বা 'Moscow Declaration' নামে পরিচিতি । মস্কো ঘোষণায় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, 'এ সংস্থা সকল শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌমত্ব ও সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।' বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছোটো বড়ো শান্তিপ্রিয় সব দেশের জন্য এ সংগঠনের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তেহরানে বিশ্ব রাজনীতির তিন শীর্ষ নেতা, রুজভেল্ট (যুক্তরাষ্ট্র), স্ট্যালিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ও চার্চিল (ব্রিটেন) অপর এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা জানান যে, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় যোগদানের জন্য বিশ্বের সকল ছোটো ও বড়ো দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাঁরা আরও জানিয়েছিলেন যে, বিশ্ব শান্তি রক্ষায় তাঁদের উদ্যোগ সফল হবে। এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল জাতি যুদ্ধের ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠতে পারবে। যে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তার রূপরেখা প্রণীত ও গৃহীত হয় ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ওয়াশিংটনের ডুম্বারটন ওকস সম্মেলনে। প্রথম পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে এবং তা চলে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। সম্মেলনে একটি বিশ্ব সংস্থা গঠন ও এর কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সম্মেলনে বিশ্বসংস্থার নামকরণ করা হয় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' বা জাতিসংঘ। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে বিশ্ব সংস্থার চারটি শাখা থাকবে– সকল সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ সভা, ১১ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও একটি সচিবালয়। নিরাপত্তা পরিষদ গঠনে স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যের প্রস্তাব করা হয়। বলা হয় পাঁচটি দেশ স্থায়ী সদস্য এবং ছয়টি দেশ অস্থায়ী সদস্যপদ পাবে। অস্থায়ী সদস্যপদ সম্পর্কে বলা হয়েছিল দুইবছর পরপর সাধারণ সভা কর্তৃক এরা নির্বাচিত হবে। ডুম্বারটন ওকস পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইয়াল্টায় একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগ দেন রুজভেল্ট,স্ট্যালিন ও চার্চিল। ওই সম্মেলনে বৃহৎ পাঁচটি শক্তি যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, চীন ও ফ্রান্সকে ভেটো ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাঁরা এমন সিদ্ধান্ত দেন যে, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে দ্রুত প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সংস্থাটি গঠন করা হবে। ইয়াল্টা শীর্ষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি সনদ রচনা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে ১৯৪৫ সালের ২৫ এপ্রিল থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হন। ২৬ জুন ১১১টি ধারা সংবলিত সনদটি অনুমোদিত হয়। তাতে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটো ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। তবে সর্বসম্মতভাবে সনদটি স্বাক্ষরিত হয় সে বছর ২৪ অক্টোবর । মোট ৫১টি দেশ মূল সনদে স্বাক্ষর করেছিল। তাই আমরা প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর 'জাতিসংঘ দিবস'

পালন করি। সারা বিশ্বের স্বাধীন দেশগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা 'জাতিসংঘ'-এর সদস্য। বর্তমানে ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র। আরো দুইটি দেশ পর্যবেক্ষক দেশের তালিকায় রয়েছে । দেশগুলো হলো ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘের সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। জেনেভা, ভিয়েনা ও নাইজেরিয়াতে এর শাখা অফিস রয়েছে।

জাতিসংঘ সনদের ১ নম্বর ধারায় চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা;

২. প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে সাম্যের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা;

৩. অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সেই সঙ্গে মানবাধিকার ও মানুষের মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা; এবং

৪. উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য এই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে সকল জাতির ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।

জাতিসংঘ সনদের ২ নম্বর ধারায় সাতটি মৌলিক নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১ নম্বর ধারায় যেসব উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য এ নীতিমালাগুলো অপরিহার্য। জাতিসংঘ সনদে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রতিটি দেশ এই সাতটি মৌলিক নীতিকে সামনে রেখেই তাদের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালনা করবে। এই সাতটি নীতি হচ্ছে–

ক) প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও সমতা নীতির উপর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত;

খ) প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অধিকারের ব্যাপারে জাতিসংঘ সনদে যে বিধান ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে , তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে;

গ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র লক্ষ্য রাখবে, সদস্যরাষ্ট্রগুলো অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এমন কিছু করবে না, যাতে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়;

ঘ) প্রতিটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে;

ঙ) জাতিসংঘ গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলো সমর্থন করবে;

চ) জাতিসংঘ সদস্য নয় এমন দেশ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে যাতে এই নীতিগুলো অনুসরণ করে জাতিসংঘ সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে;

ছ) জাতিসংঘ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না । কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তা যদি বিঘ্নিত হয়, তাহলে জাতিসংঘ ঐদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

জাতিসংঘের অঙ্গ বা শাখাসমূহ

সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের ছয়টি শাখা আছে। শাখাগুলো হচ্ছে-

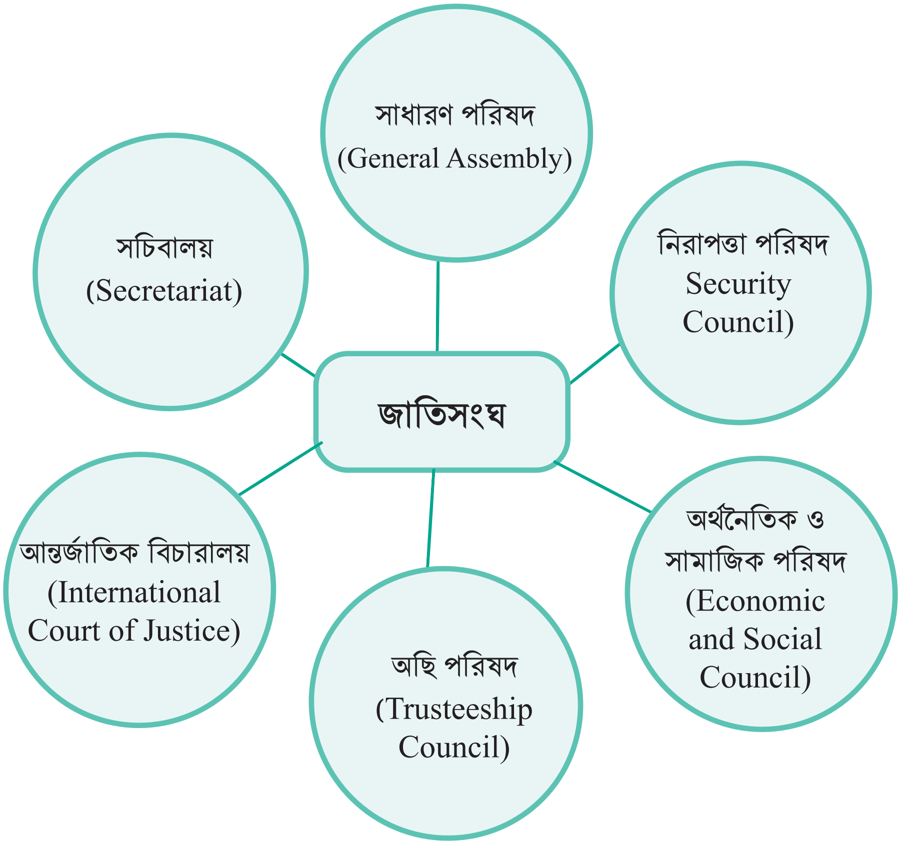

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য। তাই আমাদের দেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বাংলাদেশ ১৯৭৯-৮০ সালের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে দ্বায়িত্ব পালন করে। ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়। ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪২তম অধিবেশনে হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের বিভিন্ন আবাসিক ও অনাবাসিক সংস্থাগুলো এদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDG) পর ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে সহায়তা প্রদান বা সহায়ক ভূমিকা পালন এই সংস্থা গুলোর প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের সম্পর্কের সূচনা হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধু একটি মুক্তির আন্দোলন নয়, এটি অন্যায়ভাবে শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এবং মৌলিক মানবাধিকার

প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘ প্রথমত যুক্ত হয়েছিল মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে অবস্থান প্রকাশ করার জন্য।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা চেয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ-থান্টের কাছে। সে সময়ে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ঢাকাস্থ প্রতিনিধির সঙ্গে দেখাও করেছিলেন তাঁরা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের উপর যে গণহত্যা সংঘটিত হয় , তা সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অন্যান্য বিশ্বনেতার সঙ্গে সেদিন জাতিসংঘের মহাসচিব উ-থান্ট এই গণহত্যাকে নিন্দা জানিয়ে একে 'মানব ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়' বলে অভিহিত করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সরকার গঠনের পর এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের জনমত ও রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায় করা। এ উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকারের একটি বিশেষ প্রতিনিধিদলকে ১৯৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ প্লাজায় একটি সাংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়ে দেয় যে আপস সম্ভাবনার পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি। ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘ অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্য নিরাপত্তা পরিষদের অফিসিয়াল ডকুমেণ্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়।

শরণার্থীদের সহায়তাদান

দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটিতে জাতিসংঘ সক্রিয় ছিল, সেটা হচ্ছে শরণার্থীদের সাহায্য প্রদান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অমানবিক অত্যাচার ও গণহত্যার কারণে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর ছেড়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থীদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে ব্যবস্থাপনা ও অর্থের প্রয়োজন ছিল, তা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এককভাবে মেটানো সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশের ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালে ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের সহায়তার কাজে জাতিসংঘের এই সম্পৃক্তির ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কৌশলগতভাবে লাভবান হয়। পাকিস্তান এবং আরো কিছু দেশ এ যুদ্ধকে পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' এবং ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব বলে চিত্রিত করার যে অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল, জাতিসংঘের এ সাহায্যের ফলে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। জাতিসংঘের শরণার্থী-সংক্রান্ত হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দীন আগা খানসহ উচ্চপদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বিভিন্ন শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ইউএনএইচসিআর ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ইউনিসেফ প্রভৃতি জাতিসংঘ সংস্থা শরণার্থীদের জন্য কাজ শুরু করে।

১৯৭১ সালের জুন মাসে বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে প্যারিসে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের যে বৈঠক হয়, তাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত নতুন সাহায্য দিতে দাতাগোষ্ঠী অস্বীকার করে। 'পূর্ব পাকিস্তান কার্যত সরকারবিহীন রয়েছে'– বিশ্বব্যাংকের এ মন্তব্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করে। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) আলোচ্যসূচিতেও বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা গুরুত্বপূর্ণভাবে উত্থাপিত হয়।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ বৃহৎ আকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়। ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম জাতিসংঘ রিলিফ অপারেশন ঢাকা (আনরড)

নামে পরিচিত। ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন এবং আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। স্যার রবার্ট জ্যাকসনের পরিচালনায় শুরু হয় এই ত্রাণ কাজ। এই কার্যক্রমের ব্যাপ্তির ফলে আনরডের নাম কিছু দিনের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হল আনরব (UNRB)-এ , যার পুরো নাম বাংলাদেশ জাতিসংঘ ত্রাণ কার্যক্রম।

মহাসচিবের বাংলাদেশ সফর

বাংলাদেশ-জাতিসংঘ সম্পর্ক আরো জোরদার হয় যখন ১৯৭৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উভয় নেতা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সফর দ্বারা জাতিসংঘের সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। তখন জাতিসংঘের সহায়তায় যুদ্ধকালীন বিধ্বস্ত চালনা পোর্টে ডুবে যাওয়া জাহাজগুলো অপসারণ করা হয়। এছাড়া ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানে আটকা পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতেও জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

জাতিসংঘের যেসব সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে	
UNDP	UNDP: (United Nations Development Programme) উন্নয়ন কর্মসূচি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি সহায়ক সংস্থা। ১৯৬৫ সালের ২২ নভেম্বর এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ইউএনডিপির সহায়তায় সহস্রাব্দ উন্নয়নের (MDG) আটটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, দারিদ্র্য হার হ্রাস এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে বিশেষ করে শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে অবদানের জন্য জাতিসংঘের এওয়ার্ড লাভ করেন। বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের সতেরোটি লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে কাজ চলছে।
UNICEF	UNICEF: (United Nations Chidren's Fund) জাতিসংঘ শিশু তহবিল। ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অগণিত শিশু অনাথ হয়েছিল। এই শিশুদের সাহায্যের জন্য একটি তহবিল তৈরি করার সিদ্ধান্ত থেকেই এই সংস্থা। আমাদের দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ কাজ করছে।

UNESCO	UNESCO: (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর লন্ডন সম্মেলনে ১৬ নভেম্বর ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৬ সালে এই সংস্থাটি জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো জাতিসংঘের এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য।
FAO	FAO: (Food & Agriculture Organization) জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা। ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর সদর দপ্তর ইটালির রোমে। বাংলাদেশের বিশাল বর্ধিত জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করছে।
WHO	WHO: (World Health Organization) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেছে।
UNHCR	UNHCR: (United Nations High Commission for Refugees) উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনারের কার্যালয় বা ইউএনএইচসিআর। এটি ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দুইবার, ১৯৫৪ এবং ১৯৮১ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার ইস্যুতে এই কার্যালয় মধ্যস্থতা করছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর দৈনন্দিন খরচ মেটানোর ক্ষেত্রেও বড়ো অবদান রাখছে এই সংস্থা। এছাড়া বাংলাদেশে বিহারি জনগোষ্ঠীর আবাসনসহ অন্যান্য ইস্যুতে এই সংস্থা ব্যাপক অবদান রেখেছে।
UNIFEM	UNIFEM: (United Nations Development Fund for Women) জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম। জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থা। বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নে এ সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করছে । নারীদের অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্ত করছে। নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

UNFPA	UNFPA: (United Nations Population Fund) জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল বা ইউএনএফপিএ এর কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কৌশল এবং প্রোটোকল তৈরি করা, জন্মনিয়ন্ত্রণে সচেতন করা এবং বাল্যবিবাহ, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বন্ধ, প্রসূতি মাতাদের যত্ন ইত্যাদি। সংস্থাটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
ILO	ILO: (International Labour Organization) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা। শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও তাদের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। সংক্ষেপে আইএলও (ILO) নামে পরিচিত। ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ১১ এপ্রিল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সামাজিক ন্যায়বিচার , আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য সর্বজনীন ও দীর্ঘমেয়াদি শান্তির জন্য সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্য অর্জনে সংস্থাটি কাজ করে চলেছে। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত। মূলত শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস, স্বচ্ছন্দ জীবনের উপযোগী মজুরি ও স্বাস্থ্যসম্মত মানবিক কর্মপরিবেশের মতো অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের বিভিন্ন রকম সমস্যা সমাধান ও মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে গতিশীল রাখার প্রতিও এ সংস্থা নজর রাখে। ফলে ILO জাতিসংঘের প্রথম বিশেষ সংস্থা হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

উপরোক্ত সংস্থাগুলো ছাড়াও জাতিসংঘের আরও অনেকগুলো উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করছে।

এরপরে একদিন ক্লাসে এসে স্যার বললেন, খেয়াল করেছ, বিশ্ব প্রেক্ষাপট থেকে আমরা কিন্তু বারবার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে এসেছি। চলো, আমরা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে শান্তি, নিরাপত্তা উন্নয়নের জন্য যেভাবে কাজ হয়, তার মতোই স্থানীয় পর্যায়ের কাজ সম্পর্কেও জানব।

শিক্ষার্থীরা সবাই উৎসাহের সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে তাঁকে সমর্থন জানাল। তখন স্যার এ বিষয়ে তাদের বিস্তারিতভাবে জানালেন।

আমরা সকলেই জানি প্রতি দুই বছর পরপর আমাদের স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচন হয়। এতে একজন সভাপতি ও কয়েকজন অভিভাবক সদস্য নির্বাচিত হন। প্রধান শিক্ষক মহোদয় পদাধিকার বলে সদস্য সচিব এবং দুই বা ততোধিক শিক্ষক প্রতিনিধি শিক্ষকদের ভোটে নির্বাচিত হন। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি যেমন স্কুলে পড়ালেখার মান উন্নয়ন এবং স্কুলের সার্বিক উন্নতির জন্য কাজ করেন, সব সময় খোঁজখবর নেন, তেমনি আমাদের এলাকার উন্নয়ন, সুবিধা-অসুবিধা দেখার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সিটি কর্পোরেশন/পৌর সভা/ ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। আমরা একজন কাউন্সিলর/পৌর মেয়র/ইউপি চেয়ারম্যান বা মেম্বারের কাছ থেকে স্থানীয় সরকার পরিচালনার কাঠামো ও কার্যক্রম সম্পর্কে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করব।

সিটি কর্পোরেশন এলাকার একটা স্কুলের ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় রেখে ৫/৬ জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিলেন। আসিরের নেতৃত্বে একটি দল এলাকার কাউন্সিলর সাহেবের কাছে গেল।

তাঁর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সানা জানতে চাইলো স্থানীয় সরকার কী?

দেশের প্রান্তিক স্তরের বা তৃণমূল পর্যায়ের শাসন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে নির্বাচিত সরকারব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে। এলাকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ সরকার গঠিত হয়। স্থানীয় সরকার স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিকদের যথাযথভাবে তাৎক্ষণিক বিভিন্ন সেবা প্রদান করতে পারে।

আমাদের দেশে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে জেলা পর্যায়ে রয়েছে জেলা পরিষদ, উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা পরিষদ এবং গ্রাম পর্যায়ে সাধারণত কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ। এছাড়াও ছোটো ছোটো শহর এলাকায় পৌরসভা (যেমন: নাঙ্গলকোট, হাটহাজারী, লামা, কুতুবদিয়া ইত্যাদি) এবং বড়ো বড়ো শহরগুলোতে রয়েছে সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ইত্যাদি)। এগুলো স্থানীয় সরকারের অংশ। আমরা জানি বাংলাদেশে তিনটি পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদের পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থানীয় সরকার পরিষদও রয়েছে ।

শোভন জানতে চাইল, স্থানীয় সরকার পরিষদের কাঠামো তাহলে আমরা কীভাবে ভাবতে পারি?

কাউন্সিলর সাহেব একটা কাঠামো তাদের দেখালেন। স্থানীয় সরকার পরিচালনার কাঠামোটি নিম্নরূপ—

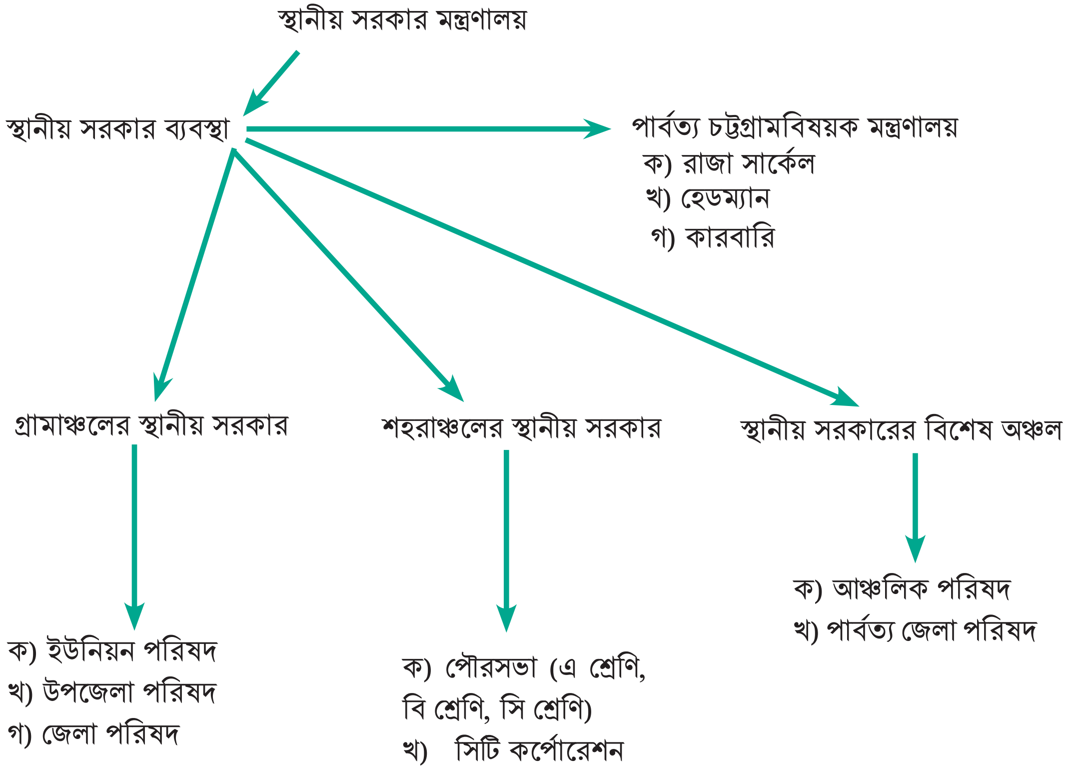

উপরের ছকে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর বিন্যাস দেখানো হয়েছে।

আমরা জানি, আমাদের এই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি আয়তনে বেশি বড়ো না হলেও লোকসংখ্যা অনেক বেশি। তাই কেন্দ্রে থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রান্তিক অঞ্চলের ছোটো-বড়ো বহু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না। তা বিবেচনায় নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ের ছোটোখাটো সমস্যার সমাধান সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে দুটো লাভ ক) কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ কমে এবং খ) স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলোরও সুষ্ঠু সমাধান হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা অনেক বেশি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দিন দিন স্থানীয় সরকার কাঠামো জনগণের কাছে পরিচিত ও বিকশিত হয়ে উঠছে।

ক) ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামো: আমরা প্রথমেই ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের ইতিহাস সম্পর্কে জানব। এটি আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান । ব্রিটিশপূর্ব আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রাম এলাকায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি কাজ করছে। ব্রিটিশ আমলে গ্রাম এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করার জন্য চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন ১৮৭০ প্রবর্তিত হয়। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও

বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৮৫ সালে স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গীয় স্থানীয় আইন পাস হয়। এই আইনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা বোর্ড ও জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯১৯ সালের পল্লি আইনে চৌকিদারি পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ইউনিয়ন বোর্ড নামে একটি মাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তান আমলে এর নাম হয় ইউনিয়ন কাউন্সিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ– এই তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকারব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধিত আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়।

আমরা জানি, ইউনিয়ন পরিষদ হলো স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর বা প্রাথমিক স্তর। কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। আমাদের দেশে বর্তমানে চার হাজার পাঁচশ একাত্তরটি ইউনিয়ন পরিষদ আছে। গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সরকার হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এর মূল লক্ষ্য হলো গ্রামের মানুষের সেবা প্রদান এবং গ্রামীণ সমস্যার সমাধান ও তৃণমূলের মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোতে রয়েছেন–

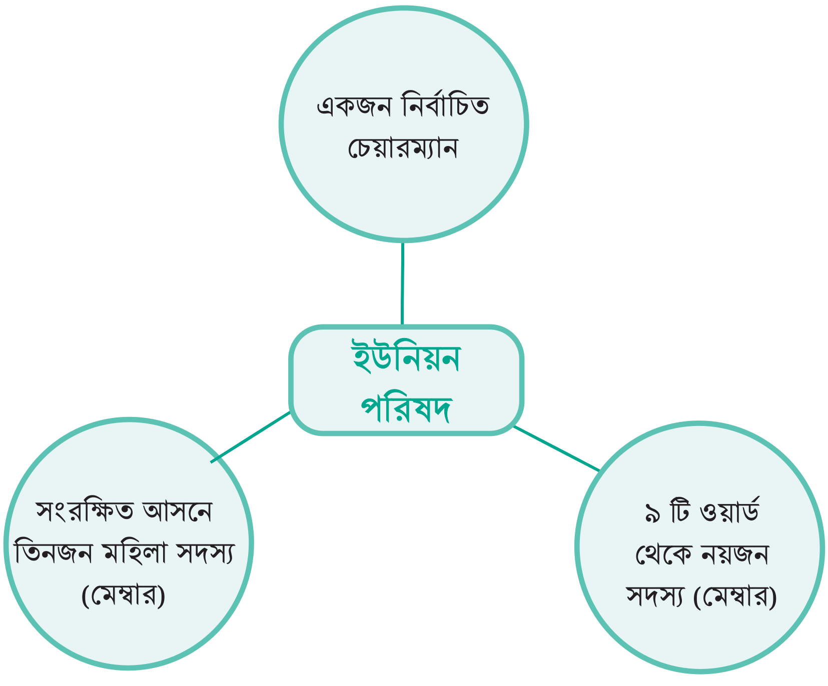

ইউনিয়ন পরিষদের কাজ

এলাকার উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ অনেক দায়িত্ব পালন করে। এর মধ্যে কিছু মুখ্য কাজ ও কিছু ঐচ্ছিক কাজ রয়েছে। যেমন:

ক) শৃঙ্খলা রক্ষা: ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান কাজ হলো গ্রামের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য

- প্রতিটি ইউনিয়নে কিছুসংখ্যক চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ করা;
- বিশৃঙ্খলা ও চোরাচালান বন্ধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিরসনে ভূমিকা পালন;
- গ্রাম আদালত সম্পর্কিত দায়িত্ব সম্পাদন;
- পারিবারিক বিরোধের আপস-মীমাংসা;

খ) কাজ ও সেবা: এক কথায় এ সংস্থার মূল কাজ হলো সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে ইউনিয়নে অবস্থিত কৃষি, মৎস্য, পশুপালন ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার সেবা ও কার্যক্রম জনগণকে অবহিতকরণ। এর প্রধান কাজগুলো হলো-

- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্থার কর্মসূচির অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- দারিদ্র্য বিমোচন ;
- স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন;
- আত্ম-কর্মসংস্থান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
- এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কাজ তো রয়েছেই।

গ) অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন: এলাকার কৃষি উন্নয়নের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। যেমন–

- গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন সাধন;
- বাজার সৃষ্টি;
- মৎস্য চাষ ও পশু পালনের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;
- উন্নত বীজ, চারা ও সার বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- জনগণের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কাজ।

এ ছাড়া রয়েছে ঐচ্ছিক কাজ:

- এলাকার রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ;
- এতিম, দুস্থ, গরিব ও বিধবাদের সাহায্য করা;
- প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা;
- সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত ও তদারকি করা;
- এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণ করা;
- ইউনিয়নকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা;
- দুস্থ ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন;
- সকল প্রকার শুমারি পরিচালনার দায়িত্ব পালন;
- সরকারি সম্পত্তি যেমন: সড়ক, সেতু, খাল, বাঁধ, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা প্রদান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা;
- চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
- জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপাদানগুলো সহজলভ্য ও সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান;
- বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞানদান ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
- এলাকার মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ;
- এলাকার জমির খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা এবং খাজনা প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- এলাকায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বা অপরাধ সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করা;
- বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন: ইভ টিজিং, যৌতুক প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- এলাকার শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সভা-সমাবেশের আয়োজন;
- প্রতিটি গ্রামে শিক্ষা চর্চার উদ্দেশ্যে পাঠাগার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- রোগব্যাধি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য জনগণকে টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- বর্ষার মৌসুমে গাছের চারা লাগানোর জন্য স্কুলের শিক্ষার্থী ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

খ) উপজেলা পরিষদের কাঠামো: ১৯৮৩ সালে প্রথম উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো উপজেলা পরিষদ। কয়েকটি ইউনিয়ন নিয়ে একটি উপজেলা গঠিত হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থাটি নানা কারণে স্থায়ী রূপ লাভ করেনি। তাই উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ পুনঃপ্রচলন এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধনকল্পে ৬ এপ্রিল ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ আইন পাস হয়। এ আইন 'উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন ২০০৯' নামে পরিচিত। স্থানীয় জনগণের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ গঠনের বিধান রয়েছে। বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে:

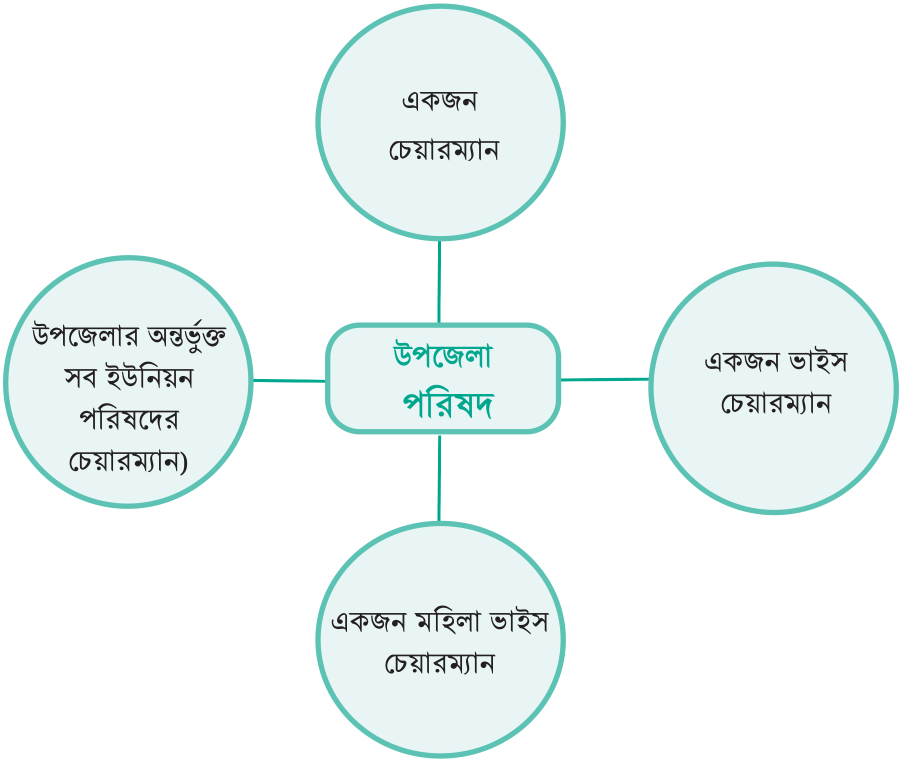

উপজেলা পরিষদের কাজ–

- উপজেলা পরিষদ পাঁচসালাসহ বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করে;
- সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও তার সমন্বয় সাধন করে;
- বিভিন্ন ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

বলা বাহুল্য এ সকল কাজের সফলতা নির্ভর করবে উপজেলার জনগণের আন্তরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

গ) জেলা পরিষদ গঠন কাঠামো: কয়েকটি উপজেলা নিয়ে একটি জেলা গঠিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ৬ জুলাই ২০০০ সালে 'জেলা পরিষদ আইন ২০০০' প্রবর্তন করে। আমাদের দেশে ৬৪টি জেলা পরিষদের মধ্যে ৬১টি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে আছে। আইনের বিধান অনুযায়ী বান্দরবান পার্বত্য জেলা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা– এই তিনটি জেলা পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যমান আইনে জেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সাধারণ সদস্য এবং পাঁচজন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য থাকেন । জেলা পরিষদের কার্যকাল ৫ বছর।

জেলা পরিষদের কাজ

জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করাই জেলা পরিষদের কাজ। জেলা পরিষদের কাজকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে– ১. প্রধান কাজ ২. ঐচ্ছিক কাজ।

এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান কাজ হলো–

- জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ তদারকি,
- উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও ব্যক্তির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা ও সহযোগিতা করা;
- উপজেলা ও পৌরসভার সংরক্ষিত এলাকার বাইরে রাস্তাঘাট নির্মাণ;
- সেতু, কালভার্ট নির্মাণ;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ;
- বেকার জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- অনাথ আশ্রম নির্মাণ;
- গ্রন্থাগার তৈরি ও নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা;
- কৃষি খামার স্থাপন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করা;
- এছাড়া জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের কাজ;
- উপজেলা ও পৌরসভাগুলোকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান;
- বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ;
- যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজও জেলা পরিষদ করে থাকে।

ঐচ্ছিক কাজ:

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্থ মঞ্জুরি প্রদান ও শিক্ষা উন্নয়নের সহায়ক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জনসাধারণের জন্য খেলাধুলার আয়োজন ও উন্নয়ন;
- তথ্যকেন্দ্র স্থাপন;
- জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন;
- শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগ গ্রহণ;
- গৃহহীনদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা;
- বিধবা সদন, এতিমখানা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
- সামাজিক অনাচার যেমন: মাদক সেবন, জুয়া, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি প্রতিরোধ;
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ;
- সালিশী ও আপসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আদর্শ কৃষি খামার স্থাপন;
- উন্নত কৃষিপদ্ধতির প্রসার ঘটানো;
- আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও সংরক্ষণ;
- উন্নত চাষ পদ্ধতিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পতিত জমি চাষে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বাঁধ নির্মাণ ও প্রয়োজনে মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সেচের পানি সরবরাহ,সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- জেলার বনভূমি সংরক্ষণ;
- গ্রামাঞ্চলের শিল্প-কারখানাগুলো সচল রাখার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ করা;
- গ্রামাঞ্চলের শিল্প-কারখানা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা;
- উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন;
- ধর্মীয় উপসনালয়, যেমন: মসজিদ, মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও গির্জার উন্নয়ন এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার চর্চার প্রসার ও উন্নতি সাধনের জন্য জেলা পরিষদ কাজ করে।

ঘ) পৌরসভা গঠন : শহর এলাকার স্থানীয় সরকার হিসেবে পৌরসভা পরিচিত। বাংলাদেশের প্রতিটি শহর এলাকায় একটি করে পৌরসভা রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে ৩৩০টি পৌরসভা আছে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একজন মেয়র নির্বাচিত হন। প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। শহর বা পৌর এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যার তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন পৌরসভার সদস্য সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে।

পৌরসভার কাজ

- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য হোস্টেল নির্মাণ;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান;
- বিনামূল্যে বই বিতরণ;
- বাধ্যতামূলক ও গণশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;
- স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করা;
- শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- বিধি মোতাবেক ঘরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা;
- চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তাঘাটের নামকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- দ্রুতগতির যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা;
- রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো, পার্ক উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা;
- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন;
- ত্রাণ ও পুর্নবাসন;
- এতিম ও দুস্থদের জন্য এতিমখানা পরিচালনা;
- লাইব্রেরি ও ক্লাব গঠন;
- ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ;
- খেলাধূলার ব্যবস্থা;

- মিলনায়তন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ;
- জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন;
- মহামারি ও সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ;
- চিকিৎসা কেন্দ্র গঠন এবং সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- দুর্যোগকালে জনগণকে সচেতন করা ইত্যাদি পৌরসভার কাজ।

ঙ) সিটি কর্পোরেশন গঠন: বাংলাদেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন আছে। ঢাকা উত্তর,ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ– এই প্রতিটি জেলা শহরে আছে একটি করে সিটি কর্পোরেশন। সিটি কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হয় মেয়র। মেয়রের কাজে সহযোগিতা করেন কাউন্সিলররা। সিটি কর্পোরেশনের আয়তনের ভিত্তিতে কাউন্সিলর সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। সিটি কর্পোরেশন যেসব কাজ করে তার মধ্যে রয়েছে–

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- মানসম্মত শিক্ষা সুনিশ্চিত করা;
- কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা;
- জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা;
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পানিনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা;
- স্বাস্থ্যকর ও ভেজালমুক্ত খাদ্য বিক্রি নিশ্চিত করা;
- শহরের পরিবেশ রক্ষার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- নিয়মানুযায়ী ঘরবাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা;
- সকল ধর্মের মানুষের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ নিশ্চিত করা;
- সড়ক নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা;

- রাতের বেলায় সড়কে আলো নিশ্চিত করা;
- রাস্তার দুই ধারে গাছ লাগানো, পার্ক উদ্যান প্রতিষ্ঠা ও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সংরক্ষণ করা;
- ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ট্রেড লাইসেন্স সরবরাহ করা;
- বিশেষ সময়ের বাজার ব্যবস্থাপনা যেমন: ঈদুল আজহার সময় গরুর বাজার ব্যবস্থাপনা;
- সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা;
- জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- খেলাধুলার আয়োজন করা;
- সমাজকল্যাণমূলক কাজ;
- আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, যেমন: সেলাই শেখানো, গাড়ি চালানো শেখানো, ডেন্টিং-পেইন্টিং, ব্লক-বাটিকের কাজ;
- তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা ইত্যাদি সিটি কর্পোরেশনের কাজ।

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ বিভিন্ন সংস্থার কাজে মধ্যে কিছু মিল রয়েছে। অর্থাৎ একই কাজ একাধিক সংস্থা করে থাকে। আবার কাজে ভিন্নতা থাকলেও এর মধ্যেও মিল রয়েছে। সব কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণ ও সমাজর উপকার এবং জীবনমানের উন্নতি সাধন করা।

স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব

৮৫ হাজারেরও অধিক গ্রামের সমন্বয়ে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটি গঠিত। সবুজের বুকে লাল টুকটুকে সূর্যে আঁকা আছে প্রায় ১৭ কোটি মানুষের মুখচ্ছবি। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫৬ হাজার ৯৭৭ বর্গমাইলের আমাদের এই মাতৃভূমি। রাষ্ট্রের আয়তন খুব বড়ো না হলেও জনসংখ্যা বেশি। কেন্দ্রে বসে এত বড়ো দেশের উন্নয়ন পরিচালনা এবং নানা রকম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। তাই সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া এবং স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য এ ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ যেমন কমে, তেমনি স্থানীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানও সহজ হয়। বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো স্থানীয় সরকারব্যবস্থা।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট: রাজনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

মানুষের ইতিহাসের সুদূর অতীতে যাযাবর বৃত্তির কথা তোমরা জেনেছ। নিরাপদ জীবন এবং খাদ্যের সংস্থানে মানুষ এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াত করত। এই প্রক্রিয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া এবং বাংলা অঞ্চলের তৈরি হয়েছিল এক গভীর সংযোগ। বিশ্বের নানান অংশ থেকে বিভিন্ন যোদ্ধাদল, শাসক, বণিকগোষ্ঠী ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের দিকে এসেছে, সম্পদ ও ক্ষমতা দখল করেছে, শাসন ও শোষণ করেছে, অনেকেই বসতি স্থাপন করেছে এবং ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি নির্মাণ ও বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে।

শাসকশ্রেণির নির্ধারণ করে দেওয়া রাজস্ব প্রদান করে, বিধিবিধান মেনে নিয়েই মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়ে গেছেন। তবে মানুষ যে সব সময়ই বিনা বাক্য ব্যয়ে শাসকদের সকল আদেশ মেনে গৎবাঁধা জীবনযাপন করেছে তা কিছুতেই বলা যাবে না। বিভিন্ন সময়েই দেখা যায়, অত্যাচারী শাসককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য মানুষ অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, বিপ্লব ও বিদ্রোহ করেছে। এসবের মধ্য দিয়েই মানুষ ক্রমে ক্রমে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের গোঁড়ার কথা

পৃথিবীতে প্রথম কবে রাজা ও রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল? বিভিন্ন গবেষণার আলোকে ইতিহাসের পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে, আজ থেকে প্রায় সাত-আট হাজার বছর আগেই মানুষ যখন নগর সভ্যতা গড়ে তুলতে শুরু করে, তখনই রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। এই রাষ্ট্র বা রাজ্যব্যবস্থার উদ্ভবের পেছনেও কৃষির ভূমিকা ছিল ব্যাপক। আদি যুগের শিকার ও সংগ্রহজীবী মানুষ যখন স্থায়ী বসতি স্থাপন করে কৃষিকাজ শুরু করে তখন তাদের জীবনব্যবস্থা বদলে যায়। কৃষি জমির চাহিদা বেড়ে যায়। জমির উপর ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং তা রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। কৃষি থেকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ উৎপাদিত হতে থাকে। শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে শিকার ও সংগ্রহ করে বেড়াতো তখন একেকটি গোত্রে একেকজন গোত্রপতি থাকত। কিন্তু স্থায়ী বসতি স্থাপনের পর গোত্র প্রথার পরিবর্তে বৃহৎ সমাজ গড়ে ওঠে। নানান শ্রেণি পেশার মানুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এই মানুষদের নিরাপত্তা, বাইরের আক্রমণ থেকে নিজেদের সুরক্ষা, আইন-কানুন তৈরি ও তা বাস্তবায়নের দরকার হয়। আর এভাবেই একটি শক্ত কাঠামো গড়ে ওঠে। গোত্রপতি বা দলপতিদের মধ্য থেকেই কেউ একজন আরও বেশি শক্তি অর্জন করে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করে রাজার আসনে আসীন হন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন ধর্মগুরুরাও। রাজা এবং ধর্মগুরুরা মিলে নগরগুলোতে একটি শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে তাঁরা অনেক বেশি শক্তি ও সম্পদ সঞ্চয় করেন। নিজেদের জন্য সুরক্ষিত দুর্গের ভেতর উন্নত বাসস্থান নির্মাণ করেন। সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে নিজেদের

নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এভাবে সমাজে অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষ থেকে রাজা ও ধর্মগুরুরা নিজেদের আলাদা করে ফেলেন। নগরের সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, বণিক ও কৃষকদের নিরাপত্তা দেবার নাম করে কর বা খাজনা আদায় করেন। বিপুল অর্থের মালিকানা লাভ করেন। শুধু তা-ই নয়, একজন শাসক বা রাজার মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানই যেন রাজা হয়, সেই ব্যবস্থাও তাঁরা করে যান। এভাবেই রাজা ও রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, হরপ্পা, গ্রিক-রোমান সভ্যতাগুলোর বিকাশের সঙ্গে এই রাজতন্ত্রের বিকাশের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। রাজ্য ও রাজতন্ত্রের আদি রূপ দেখা যায় এই সভ্যতাগুলোতেই। রাজা ছিলেন একজন যোদ্ধা ও যোদ্ধাদের প্রধান। তার জীবন ছিল অসীম সম্পদ আর ক্ষমতায় পূর্ণ। রাজার সহযোগী ধর্মগুরু, উপদেষ্টা এবং সেনাপতিরাও ছিলেন সেই ক্ষমতার অংশ। তারা ছিলেন অভিজাত শ্রেণির অন্তর্গত। রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির আরও একটি প্রধান উপায় ছিল যুদ্ধবিগ্রহ। বিভিন্ন নতুন অঞ্চলে আক্রমণ করে, ধন-সম্পদ লুট করে রাজারা নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করতেন। পরাজিত এলাকা থেকে সাধারণ মানুষদের বন্দি করে নিয়ে এসে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতেন। নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করতেন। অন্যদিকে রাজা ও পুরোহিতেরা সাধারণ মানুষের জন্য রচনা করতেন এমনকিছু আইন যার ফলে রাজা ও রাজতন্ত্রের প্রতি মানুষের আনুগত্য বৃদ্ধি পেত। নিয়মিত কর-খাজনা দিয়ে, রাজার আদেশ মেনে চলতে বাধ্য হতো।

প্রাচীন মিশরের রাজা (ফারাও): নিজেদের দাবি করতেন তারা দেবতার বংশধর

কৃষির উপর ভিত্তি করে প্রাচীন মিশরে যখন নগর গড়ে ওঠে তখনই সেখানে রাজা এবং রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। মিশরীয় রাজাদের উপাধি ছিল ফারাও বা ফেরাউন। ফারাও শব্দের অর্থ হচ্ছে, সুবৃহৎ বাড়ি। মিশরের রাজাগণ সুবিশাল প্রাসাদে বসবাস করতেন বলেই হয়তো তাদের এই নাম দেওয়া হয়। আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে মিশরে রাজতন্ত্রের সূচনা হয় এবং একে একে অনেকগুলো রাজবংশের উত্থান ঘটে সেখানে। মিশরের বিখ্যাত ফারাওদের মধ্যে মেনেস, কুফু, আমেন হোটেপ এবং তুতেনখামেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তুতেনখামেন

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

নেফারতিতির সমাধি-মন্দিরের দেয়ালে আঁকা চিত্রে দেখানো হয়েছে, তিনি বসে 'সেনেট' নামের একটা খেলা খেলছেন। অনুমান করা হয়, খেলাটা বর্তমান দাবা খেলার মতন কোনো খেলা ছিল।

দেয়ালে আঁকা মিশরের চাষাবাদের ছবি

মিশরের ফারাওগণ ছিলেন বিপুল সম্পদ ও সামরিক ক্ষমতার অধিকারী। নিজেদের তারা সূর্যদেবতা 'রে'-এর পুত্র বলে মনে করতেন। ফারাওগণ ছিলেন রাজ্যের সকল সম্পদ এবং সকল মানুষের প্রাণের মালিক। ফারাওদের ক্ষমতাকে সুসংহত করতে রাজ্যের পুরোহিত বা ধর্মগুরুরাও বিশেষ ভূমিকা রাখতেন। ধর্মীয় নেতারা ফারাওদের সম্পর্কে ভালো ভালো কথা প্রচার করতেন। ফারাওগণ শুধু এই জন্মে নয়, মৃত্যুর পরেও মিশরের মানুষদের রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে প্রচারণা চালাতেন। ধর্মগুরুদের প্রচারণার ফলে ফারাওগণ এতই পবিত্র হয়ে ওঠেন যে, সাধারণ মানুষ তাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করত না। মৃত্যুর পর তাদের দেহ যেন অক্ষত থাকে এবং পরকালে আবারও শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্যই মূলত তাদের দেহ মমি করে বিশালাকার পিরামিডের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হতো। মৃতদেহের সঙ্গে মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে দেওয়া হতো। ফারাওগণ তাদের চারপাশে সুবিশাল সৈন্যদল, উচ্চপদস্থ অমাত্য এবং ধর্মগুরুদের রাখতেন। এরা ছিল সবাই সুবিধাভোগী উচ্চশ্রেণির মানুষ।

স্পার্টা: একটি বর্বর ও পশ্চাৎপদ সামরিক রাষ্ট্র

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার নাম আমরা সকলেই শুনেছি। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল অনেকগুলো ছোটো ছোটো নগররাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে। নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৭৫০ থেকে ৫৫০ প্রাক্ সাধারণ অব্দের মধ্যে এই নগররাষ্ট্রগুলোর বিকাশ ঘটে। স্পার্টা ছিল একটি সামরিক রাষ্ট্র। স্পার্টার রাজা ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের প্রজারা তাঁর আদেশকে আইন হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য ছিল। স্পার্টা ছিল একটি যুদ্ধবাজ রাজার নগরী। এখানে নতুন শিশুর জন্ম হলে প্রথমেই শিশুটিকে একটি সংস্থায় নিয়ে যাওয়া হতো। শিশুটিকে যদি সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান দেখাত তবে তার লালন-পালনের অনুমতি দেওয়া হতো। আর যদি দুর্বল ও অসুস্থ মনে হতো তবে তাকে পাহাড়ের উপর থেকে ছুড়ে ফেলে হত্যা করা হতো।

স্পার্টার রাজা ও অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা একজন শিশু বড়ো হয়ে যোদ্ধা হতে পারবে কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে তবেই তাকে বাঁচিয়ে রাখার অনুমতি দিতেন। মাত্র সাত বছর বয়সেই এসব শিশুকে তাদের পরিবার থেকে কেড়ে নিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণে লাগিয়ে দিতেন। খাড়াই পর্বতে, তীব্র শীত ও গরমের মধ্যে সামান্য একখণ্ড বস্ত্র আর অল্প একটু খাদ্য দিয়ে শিশুদের কঠোর ও নির্দয় একটি জীবনের দিকে ঠেলে দেওয়া হতো। এরপর এরা বড়ো হলে সৈন্যদলে নেওয়া হতো। বিভিন্ন রাজ্যে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও হত্যার কাজে লিপ্ত করা হতো। আর এর মাধ্যমে যে সম্পদ অর্জিত হতো, তা দিয়ে স্পার্টার রাজা ও অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা বিলাসী জীবনযাপন করতেন। গ্রিসের অন্যান্য নগররাষ্ট্রগুলোর তুলনায় স্পার্টার মানুষের জীবন ছিল নীরস ও কঠোর। মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাত ও যুদ্ধবিগ্রহের কারণে শিল্প, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চায় তাঁরা ছিলেন খুবই পশ্চাৎপদ। সভ্যতার ইতিহাসে, মানুষের কল্যাণে, জ্ঞান ও শিল্পের উন্নয়নে তাঁরা তাই সামান্যতম অবদানও রাখতে পারেননি।

এথেন্স: প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথম যারা গণতন্ত্র বা মানুষের অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার স্পার্টা সমসাময়িক একটি নগররাষ্ট্রের নাম হচ্ছে এথেন্স। শুরুর দিকে এথেন্সেও একজন রাজার শাসন এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র চালু ছিল। সমাজে চার শ্রেণির মানুষ ছিল। এর মধ্যে শুধু ধনী অভিজাতরাই রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করত। সাধারণ কৃষক, বণিক, কারিগর ও দাসরা ছিল রাজনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

সাধারণ পূর্বাব্দ সপ্তম শতকে এথেন্সের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। অভিজাত শাসক ও যোদ্ধাদের অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস এবং সম্পদ সঞ্চয়ের ফলে সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সকল ভূমির মালিকানা চলে যায় অভিজাত শ্রেণির হাতে। এর ফলে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক ও ঋণগ্রস্ত শ্রমিকেরা অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। ভূমির উপর মালিকানা, ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবিতে এই আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। মানুষের এই দাবির মুখে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংস্কার সাধনে বাধ্য হন সেখানকার শাসকেরা। সোলন, ক্লিসথিনিস, পেরিক্লিস নামের শাসকেরা এমন কিছু নিয়ম-নীতি নিয়ে আসেন যার ফলে শাসক ও অভিজাত শ্রেণির মানুষদের একচেটিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হতে থাকে আর মানুষের অধিকার বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জমির উপর কৃষকদের মালিকানা, ঋণের দায়ে সাধারণ প্রজাদের ক্রীতদাসে পরিণত না করার আইন হয় এথেন্সে। এরপর সাধারণ কৃষক, বণিক ও কারিগর শ্রেণির মানুষদের নিয়ে একটি অ্যাসেমব্লি গঠন করা হয়। ১০ দিন পরপর এই অ্যাসেমব্লির অধিবেশন বসত। অধিবেশনে যেকোনো নাগরিক রাষ্ট্রের আইন, প্রশাসন, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি-সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করতে পারত। গণপরিষদ ছাড়াও গোপন ভোটে নির্বাচিত ৫০০ সদস্যের একটি পরিষদ ছিল, যারা আইন ও বিচারকার্য ঠিকঠাক হচ্ছে কি না, তা তদারকি করতেন। এছাড়া ১০ জন সেনানায়কের একটি পরিষদ ছিল। এই পরিষদ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তা গণপরিষদের সদস্যদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল।

প্রাচীন গ্রিসের এথেন্সেই প্রথম রাজ্য পরিচালনা এবং আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত কাজে সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ শুরু হয়। যদিও এথেন্সের বিপুলসংখ্যক দাস এবং নারীরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল, তবুও এথেন্সকে বলা হয় গণতন্ত্রের সূতিকাগার বা আঁতুড়ঘর। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এথেন্সে যে শাসনব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়, বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে তারই পরিণত ফল হিসেবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সে সময়ের অন্যতম প্রধান নগররাষ্ট্র এথেন্সের নগরের মূল কেন্দ্র বা অ্যাক্রোপলিসেরে বর্তমান আলোকচিত্র (Source: history4kids.co)

এথেনিয়ান অ্যাক্রোপলিস: দেবী এথেনার পার্থেনন মন্দির (Source: history4kids.co)

অনুশীলনী

প্রাচীন মিশর, স্পার্টা ও এথেন্সের রাজনৈতিক সংগঠন, সমাজ ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আমরা জেনেছি। উপরের পাঠের আলোকে এই তিনটি স্থানের মানুষের রাজনৈতিক জীবনধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরে নিচের ছকটি পূরণ করি–

মিশর	স্পার্টা	এথেন্স

সাম্রাজ্যবাদের যুগ

বাংলা অঞ্চল রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, প্রাচীন নগর সভ্যতা এবং জনপদভিত্তিক রাজনৈতিক ইউনিটগুলোর মধ্য থেকেই একসময় একেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান ঘটেছে। এরপর যুদ্ধ ও রক্তপাতের মাধ্যমে চারদিকে দখল অভিযান চালিয়ে বিশাল সাম্রাজ্যে রূপদান করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার মৌর্য, গুপ্ত এবং বাংলার পাল বংশ এরূপ বংশানুক্রমিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম উদাহরণ। বাংলা এবং দক্ষিণ এশিয়ার মতো বিশ্বের অন্য অনেক অঞ্চলে ঠিক একই সময়ে অনেকগুলো ক্ষমতালোভী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান ঘটে। এরা পৃথিবীর বিস্তৃত অংশ জুড়ে হত্যা, লুন্ঠন ও দখল অভিযান পরিচালনা করে নিজেদের রাজ্য সীমানা বৃদ্ধি করে। এসব শক্তির উত্থান পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস ও মানুষের রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পৃথিবীর ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে যাদের নাম সবার আগে নিতে হয়, তার মধ্যে ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার, রোমান সাম্রাজ্যের জুলিয়াস সিজার, ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্লামেন, মঙ্গোলীয় যোদ্ধা চেঙ্গিস খান, গজনভী বংশের শাসক সুলতান মাহমুদ, ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জার্মানির হিটলার এবং ইটালির বেনিতো মুসোলিনির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ পূর্বাব্দ পঞ্চম শতকের শুরুর দিকে স্পার্টান যোদ্ধারা এথেন্সের উপর দখল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা করে। স্পার্টা ছিল একটি সামরিক রাষ্ট্র। এথেন্সের গৌরব নষ্ট করা এবং সম্পদ দখলের লোভেই মূলত এই আক্রমণ পরিচালিত করে। এই যুদ্ধে একসময় গ্রিসের সবগুলো নগররাষ্ট্রই জড়িয়ে পড়ে। সমগ্র গ্রিস স্পার্টা এবং এথেন্স– এই দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ সুদীর্ঘ ৩০ বছর ব্যাপী স্থায়ী হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পেনোপনেশীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। ত্রিশ বছর ধরে চলমান এই যুদ্ধের ফলে এথেন্সের সুসজ্জিত ঘরবাড়ি, বাগান, শস্যক্ষেত্র সবকিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। খাদ্যের অভাব ও মহামারিতে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দি হয়ে অনেকেই স্পার্টার দাসে পরিণত হয়। দীর্ঘ এই যুদ্ধের সময়ে গ্রিসের শক্তিশালী নগরগুলো যখন দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই গ্রিসের উত্তর দিকে অবস্থিত ম্যাসিডোন নামে একটি রাষ্ট্র শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসতে শুরু করে। ম্যাসিডোনের শাসক দ্বিতীয় ফিলিপ্পো একটি শক্তিশালী পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদল গঠন করে গ্রিসের দুর্বল নগরগুলো দখল করে নিতে শুরু করেন। এভাবে সমগ্র গ্রিসের উপর দখল প্রতিষ্ঠার পর ফিলিপ্পো পারস্য আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। পারস্যের উর্বর ভূমি, মূল্যবান ধন-সম্পদ এবং দাস-দাসীদের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্যই মূলত ফিলিপ্পো পারস্য অভিযানের প্রস্তুতি নেন। কিন্তু এই অভিযান শুরু হবার আগেই ফিলিপ্পো মারা যান। সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর বিশ বছরের পুত্র আলেকজান্ডার। ইতিহাসের অনেক বইপত্রে যাকে 'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট' বলেও অভিহিত করা হয়।

পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি অতিকায় সৈন্যদল নিয়ে প্রথমেই এশিয়ার মাইনর অঞ্চলে আক্রমণ চালান। এরপর পারসিকদের পরাজিত করে ভূমধ্যসাগরের তীর ধরে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আলেকজান্ডারের নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার এক নির্মম দলিল হয়ে রয়েছে। তাঁর সমর অভিযানের মুখে যারাই বাধা দিতে চেয়েছে, তিনি তাদের হয় হত্যা করেছেন, নয়তো বন্দি করে দাসে পরিণত করেছেন। তির নামক একটি শহর দখল করার পর আলেকজান্ডারের নির্দেশে ৮ হাজার লোককে হত্যা করা হয়, ৩০ হাজার লোককে বন্দি করে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আলেকজান্ডারের আক্রমণের মুখে পড়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, অসংখ্য ঘরবাড়ি, নগর ও শস্যক্ষেত্র বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছে। মিশর, মেসোপটেমিয়া, মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে প্রাচীন ভারতবর্ষে পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত আলেকজান্ডারের দখল অভিযান বিস্তৃত হয়। তিন বছরের লাগাতার যুদ্ধে এশিয়ার বিস্তৃত এক অঞ্চলজুড়ে তিনি ত্রাসের সঞ্চার করেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

৩২৩ সাধারণ পূর্বাব্দে তিনি সামান্য জ্বরে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আলেকজান্ডার তখন তাঁর সকল সৈন্য ও সেনাপতিদের নিয়ে ব্যাবিলনে অবস্থান করছিলেন। মৃত্যুর পর আলেকজান্ডারের দেহ সমাধিস্থ করার পূর্বেই তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে রাজ্যের মালিকানা নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে যায়। দখলদার শাসকদের দখলকার্যকে মহানভাবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু মানুষের রক্ত ও লাশের উপর দিয়ে যে গৌরব তারা প্রচার করতে চায়, তা আদৌ গৌরব, নাকি লজ্জার তা আমাদের নতুন করে অবশ্যই ভাবতে হবে। মিথ্যা ও অযৌক্তিক গৌরব প্রচারের চেষ্টা ইতিহাসকে বিকৃত করে। সত্য থেকে সবাইকে বঞ্চিত করে।

জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ

জাতিরাষ্ট্র বলতে মূলত একক জাতিগত পরিচয় বা জাতীয় আদর্শকে ভিত্তি করে গঠিত রাষ্ট্রকে বোঝায়। সাধারণত জাতিরাষ্ট্রগুলোয় জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মননশীলতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিজস্ব জাতিগত তত্ত্ব ও মূল্যবোধকে এগিয়ে নিয়ে জাতিরাষ্ট্রগুলো বিশ্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বার্নসের মতে, জাতিরাষ্ট্রের ধারণা ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। মূলত 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র'– এর ভিত্তিতেই স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়। তবে আধুনিক যুগে জাতিরাষ্ট্রের ধারণা খুব প্রসঙ্গিক নয়। কারণ, বর্তমানকালে বেশির ভাগ দেশেই একাধিক ভাষা-জাতি গোষ্ঠীর সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হচ্ছে। যেমন: ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ফরাসি বিপ্লব

ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতার রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব। এই বিপ্লব ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ ধারণ করে যাত্রা শুরু করে এবং একই সঙ্গে দেশের রোমান ক্যাথলিক চার্চের সকল গোঁড়ামি ত্যাগ করে নিজেদের পুনর্গঠন করতে বাধ্য হয়। ফরাসি বিপ্লব পশ্চিমা রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। যার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা নিরঙ্কুশ রাজনীতি এবং অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতা ভেঙে নাগরিক অধিকারের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। ইতিহাসবিদগণ এই বিপ্লবকে মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করেন।

ফরাসি বিপ্লবের মূলনীতি ছিল, 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'। এই স্লোগানটিই বিপ্লবের চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছিল যার মাধ্যমে সামরিক এবং অহিংস উভয়বিধ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উপর ভিত্তি করেই ১৭৮৯ সালের ২৬ আগস্ট মানবিক ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণা করা হয়। যার মূল বিষয়বস্তু ছিল, 'সব মানুষই স্বাধীন, সব মানুষেরই সমান অধিকার ভোগ করা উচিত। আইনের দৃষ্টিতে সব নাগরিকই সমান।' রেনেসাঁর মতোই ফরাসি বিপ্লবও আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তার জগতে নতুন ধারার জন্ম দেয়। ফরাসি শাসক চতুর্দশ লুইয়ের শাসনকালে (সাধারণ অব্দ ১৬৫১-১৭১৫) ফ্রান্স একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পঞ্চদশ লুই এবং ষোড়শ লুই-এর সময়ে ফ্রান্সে আর্থসামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক দুর্বলতা একসঙ্গে হয়ে ফ্রান্সে বিপ্লব পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যার বিস্ফোরণ ঘটে ১৪ জুলাই, ১৭৮৯ সাধারণ অব্দে বাস্তিল কারাদুর্গ আক্রমণ ও এর পতনের মধ্য দিয়ে। সূচিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের নতুন অধ্যায় ফরাসি বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবের এই অবস্থাকে অনেকগুলো ছোটো-বড়ো খরস্রোতা নদীর সংমিশ্রণে হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে ওঠা বিধ্বংসী বন্যার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

ফরাসি বিপ্লব শুধু ফ্রান্সেই নয়, বলতে গেলে ইউরোপ জুড়েই সুবিধাভোগী অভিজাতদের বিরুদ্ধে, অবাধ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিদ্রোহ বিপ্লবে রূপ নিয়েছিল। রাজা ষোড়শ লুই-এর পতনের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পতন হয়েছিল। একই সঙ্গে বিপ্লবী মনোভাব সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজনীতিতে রাজতন্ত্রের স্থলে গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, একজন স্বতন্ত্র মানুষ) ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের অধিকার কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রাজনীতি ও ক্ষমতায় আবির্ভূত হয় সাধারণ মানুষ। ইউরোপজুড়েই তখন রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে।

রাজতন্ত্রের পতন এবং মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ফরাসি বিপ্লবের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে চলো একটি টীকা লিখি।

ঔপনিবেশিকবাদ, বিশ্বযুদ্ধ এবং মানুষের মুক্তির লড়াই

জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব, ফরাসি বিপ্লব, রেনেসাঁ প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নতুন ধারার সূচনা হলেও এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার অনেকগুলো দেশে সেই আলো তো পৌঁছায়নি, বরং ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কলোনি হিসেবে নির্দয়ভাবে শাসন ও শোষণের শিকার হচ্ছিল। বিশেষ করে আফ্রিকা এবং এশিয়ায়।

এই দখলদারিত্বের পরিণতি ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের লাভ-ক্ষতি, ক্ষয়-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে কেন্দ্র করে ইউরোপের রাজনীতিতে পরাপস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০ শতকের প্রথমার্ধেই ইউরোপে বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

একদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, অন্যদিকে রাজনীতিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের সরকার ব্যবস্থা, বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে ইউরোপ জুড়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আগ্রাসী হয়ে ওঠে এবং একটি যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ফলে বিশ্বসভ্যতা ২০ শতকের প্রথমার্ধেই দুটো রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ মোকাবিলা করে। এ সময় নিজেদের প্রয়োজনে বা দাস ব্যবসার অংশ হিসেবে উপনিবেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে অভিবাসন ঘটে। তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাদের নিজস্বতা বজায় থাকে। সাধারণ অব্দ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগিজসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিশেষ করে এশিয়া এবং আফ্রিকায় দখলকৃত ভূখণ্ডগুলো থেকে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং সেখানে নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। যেমন: দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতবর্ষে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম। তেমনি আফ্রিকায়ও সুদান, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। তাছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব শান্তি রক্ষার স্বার্থে সব দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস

আমরা বর্তমানকালের আরও একটি দেশের কথা সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করব। সেটি হচ্ছে আমেরিকা। তোমরা যদি আমেরিকার দিকে লক্ষ করো, দেখবে– আজকের যে শক্তিশালী-সমৃদ্ধ আমেরিকা, শান্তিপ্রিয় আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যতা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন এবং অপরিচিত ছিল। উন্নত ও আধুনিক সামরিক কৌশলও তাদের জানা ছিল না। আমেরিকায় বহু বছর ধরে যারা বাস করছিল, তাদের বলা হয় আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান। তারা একেবারেই সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। সাধারণ অব্দ ১৬ শতক পর্যন্ত তীর, ধনুক, বল্লম, বর্শা– এসব হাতিয়ারের সঙ্গেই পরিচিত ছিল। ইউরোপ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীদের সহজেই আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদের পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল আমেরিকাতেও ইনকা সভ্যতা, মায়া সভ্যতা, আজতেক সভ্যতা প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সমৃদ্ধ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর আমেরিকায় দখলদারিত্বের প্রথম আঘাত আনে স্পেন। স্থানীয় অধিবাসীদের দমন করে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

একইভাবে ব্রিটিশরাও সাধারণ অব্দ ১৬ থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত আমেরিকায় দখলদারিত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাববলয় তৈরি করেছিল। তারা ভার্জিনিয়াসহ একে একে ১৩টি উপনিবেশ স্থাপন করে। বাদ যায়নি ফ্রান্সও। তারাও আমেরিকার পোর্ট রয়্যাল, কানাডার কুউবেকে দুটি ঘাঁটি স্থাপন করে প্রভাববলয় সৃষ্টি করে। এভাবেই আমেরিকাজুড়ে ইউরোপীয় দখলদারিত্ব সৃষ্টি হয়। তবে আমেরিকা দখলের বিষয়টি ছিল মূলত আবিষ্কারের মাধ্যমে। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে আমেরিকার নতুন নতুন ভূখণ্ডে ইউরোপীয়রা আসতে শুরু করে, আবিষ্কার করতে থাকে এবং নিজেদের ক্ষমতা ও দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে এশিয়া আফ্রিকার মতো আমেরিকাতেও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি তৈরি হয়। জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসনদের মতো দেশপ্রেমীক নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ফলে ১৮ শতকের শেষের দিকে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আমেরিকা। ৪ জুলাই ১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

তবে ইউরোপীয়রা একে একে আমেরিকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলেও ইউরোপের মতো রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল না আমেরিকায়। আমেরিকায় স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকেই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত ছিল, এখনো আছে।

ইতিহাস জানার উপায় এবং যুগ বিভাজন সমস্যা

এই শিখন অভিজ্ঞতাটি সাজানো হয়েছে 'ইতিহাস জানার উপায় এবং যুগ বিভাজন' এবং 'বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশ: রাজনৈতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ' এই দুটি বিষয়কে নিয়ে। প্রথমে আমরা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পাঠ করে নিজেদের মতামত দেব। সহপাঠীদের মধ্যে একই ঘটনার বিভিন্ন মতামত শনাক্ত করব। আমাদের বইতে প্রদত্ত ইতিহাস জানার উপায় জানব এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করব। বইতে দেওয়া যেকোনো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা একাধিক উৎস যেমন: বই, পত্রিকা, টিভি বা রেডিও চ্যানেলের আর্কাইভ, ভিডিও, অনলাইন আর্টিকেল ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করব। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হব। এরপর নিজেদের এলাকার কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বাছাই করে এলাকার পরিচিত কয়েকজনের কাছ থেকে মতামত এবং বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবে। এরপর 'ইতিহাসের দলিল' নামে একটি সাময়িকী তৈরি করে সেখানে এলাকার ইতিহাস তুলে ধরব।

এখন আমরা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে জেনে নিই। ঘটনাটি হচ্ছে, শুভঙ্কর দাস নামে একজন গণিতবিদ সম্পর্কে। তার তৈরি করা মানসাঙ্ক কীভাবে ইংরেজ আমলে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার আড়ালে হারিয়ে যায়। শুধু তা-ই নয় তাঁর নামে তৈরি প্রবাদ– 'শুভঙ্করের ফাঁকি' যুগ যুগ ধরে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চলো, তাহলে আমরা জেনে নিই সে ঘটনাটি।

শুভঙ্কর কী আসলেই ফাঁকি দিয়েছিলেন?

'শুভঙ্করের ফাঁকি' বাগধারাটি দিয়ে প্রতারণা করা, ফাঁকি বা ধোঁকা দেয়া বোঝায়। এর অর্থ হলো 'হিসাব নিকাশের মারপ্যাঁচে আসল বিষয় রেখে কর্তৃপক্ষ বা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ফায়দা হাসিল করার কৌশল'।

আমাদের অনেকের মনেই হয়তো প্রশ্ন জাগছে– কে এই শুভঙ্কর? তিনি কী এমন ফাঁকিবাজি কাজ করলেন? চলো এটার পেছনের ইতিহাসটা একটু জানা যাক।

শুভঙ্কর ছিলেন একজন অসাধারণ গণিতবিদ। তিনি আর্যার (গণিত-সংক্রান্ত কতকগুলো বিধি) মাধ্যমে জটিল অঙ্কের সমাধান দিয়েছেন। আগে ক্যালকুলেটর ছিল না। তিনি মানসাঙ্ক বা মুখে মুখে বড়ো বড়ো অঙ্ক কষায় দক্ষ ছিলেন।

১৮৫৫ সালে ইংরেজ শিক্ষাবিদ ও ধর্মপ্রচারক রেভারেন্ড জেমস লং এর বক্তব্য ছিল শুভঙ্করের ছন্দোবদ্ধ সূত্রে গাঁথা সাধারণ গাণিতিক নিয়মগুলো গত দেড়শ বছর ধরে প্রায় চল্লিশ হাজার বাংলা পাঠশালা মুখরিত করে রেখেছে।

এত বড়ো মাপের একজন গণিতবিদকে নিয়ে তাহলে কারা এমন অপবাদ দিল? তা একটু পরেই আমরা জানতে পারব। তার আগে চলো শুভঙ্করের একটি আর্যা সম্পর্কে জেনে নিই।

সরোবরে বিকশিত কমল নিকর।
মধুলোভে এল তথা অনেক ভ্রমর।
প্রতি পদ্মে বসি ভ্রমর যুগল।
অলিহীন রহে তবে একটি কমল।
একেক ভ্রমর বসে প্রতিটি কমলে।
বাকি রহে এক অলি, সংখ্যা দেহ বলে।

এর অর্থ একটি জলাধারে কমল বা পদ্ম ফুল ফুটে আছে। সেখানে মধু সংগ্রহে কয়েকটি মৌমাছি বসল। প্রতিটি পদ্মে দুটি করে ভ্রমর বসল। এতে একটি পদ্ম ফাঁকা রইল। অন্যদিকে প্রতিটি পদ্মে একটি করে ভ্রমর বসলে বাকি একটি ভ্রমর ফাঁকা থাকে।

এই মানসাঙ্ক আধুনিক পদ্ধতিতে সমাধান করলে দাঁড়ায়:
পদ্ম সংখ্যা X এবং ভ্রমর সংখ্যা Y হলে,
Y=২(X-১)......(১)
Y=x-১.........(২)
(১) ও (২) নং সমাধান করে পাই,
X=৩, Y=৪

অর্থাৎ সরোবরে ৩টি পদ্ম ও ৪টি ভ্রমর ছিল।

এভাবে তিনি ছন্দের তালে তালে গণিতের সমাধান করতেন। তাঁর লেখা ‘ছত্রিশ কারখানা’ নামক পুস্তকে দুই হাজারের মতো এরকম শ্লোক ছিল। এতে অনেক ফারসি শব্দও আছে।
১৭৫৭ অব্দে পলাশী যুদ্ধের আগেও বাংলার ছাত্ররা শুভঙ্করের আর্যা পড়ত বলে জানা যায়।

ইংরেজরা এই দেশ দখল করার পর ইংরেজি শিক্ষায় মোহগ্রস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন। নিজেদের ভালো জিনিসকে বিসর্জন দিয়ে বলতে থাকেন– শুভঙ্কর ফাঁকি দিয়ে বা গোঁজামিল দিয়ে অঙ্ক মেলান। সেই থেকে প্রবাদ হয়– শুভঙ্করের ফাঁকি।

কয়েকশ বছর পরে এখন ঐতিহাসিক গবেষণায় ওঠে এসেছে তাঁর অসাধারণ মেধা এবং বাংলার গণিতে তাঁর অবদানের কথা। ঢাকা ও কলকাতার বেশ কয়েকটি পত্রিকায় এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। (সংগৃহীত, মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান, অ্যাসোসিয়েট ফেলো, রয়েল হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি, মানবজমিন, ঈদসংখ্যা, ২০২৩)

অনুশীলনী কাজ ১

এখন আমরা উপরের ঘটনা সম্পর্কে নিজেদের মতামত লিখি। মতামত লেখা শেষ হয়ে গেলে নিজের মতামত বলি এবং সহপাঠীদের লেখা মতামত শুনি। এরপর নিজের মতামতের সঙ্গে সহপাঠীদের মতামতের মিল ও অমিল খুঁজি।

আমরা খেয়াল করলে দেখব একই ঘটনা আমরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে মতামত দিচ্ছি। তাছাড়া সত্যিকার ইতিহাস জানার জন্য লোকমুখে প্রচলিত কথার উপর নির্ভর করলে হয় না। বিভিন্ন লিখিত উৎস যেমন: দলিল, দস্তাবেজ, বিভিন্ন ঐতিহাসিক বই, পত্রিকা ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। প্রকৃত ইতিহাস বর্ণনা বা ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের অংশটুকু পড়ে নিই।

ইতিহাস পাঠ ও অনুসন্ধান মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দের বিষয়। ইতিহাসের পাঠ মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ এবং যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করে। অতীত না জানলে মানুষের কোনো বর্তমান থাকে না। আর মানুষের ভবিষ্যৎ তার অতীত কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে। সুতরাং অতীতে মানুষের অর্জিত নানান অভিজ্ঞতার বিজ্ঞানসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত সকল মানুষ, সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য অতীব জরুরি ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই যে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বসূরিরা এই পৃথিবীতে নানান চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে টিকে ছিলেন, তাঁদের সেইসব অভিজ্ঞতা, নানান কাজকর্ম বা জীবনধারার ধারাবাহিক বর্ণনা যখন নির্ভরযোগ্য উৎস ও প্রমাণের ভিত্তিতে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানা ও বোঝার চেষ্টা করা হয়, তখনই তা ইতিহাস হয়ে ওঠে।

মানুষ লক্ষ বছর ধরে কীভাবে পৃথিবীর বুকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, কৃষি ও নগর বিপ্লব ঘটিয়েছে, ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্ম উদ্ভাবন করেছে, রাজ্য-রাষ্ট্র নির্মাণ করে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে তার ইতিহাস নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে জানা প্রয়োজন। আর এই ইতিহাস যিনি নিয়ম মেনে অনুসন্ধান করবেন তিনি হলেন ইতিহাসবিদ। একজন পেশাদার ইতিহাসবিদ ইতিহাস অনুসন্ধানের নিয়মতান্ত্রিক কলাকৌশল ও পদ্ধতিগুলো নির্মোহভাবে প্রয়োগ করে ইতিহাস লেখেন। ইতিহাস অনুসন্ধান বা জানার নিয়মতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন না করলে একজন মানুষ, একটি সমাজ, কোনো দেশ কিংবা জাতি দিগ্‌ভ্রান্ত আর বিভ্রান্ত হতে বাধ্য।

ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করলেই কি ইতিহাস হয়?

ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করলেই কি ইতিহাস হয়? না, হয় না। অনেক সময় মনগড়া কাহিনিকে ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। অনেক পেশাদার ইতিহাসবিদও নানান স্বার্থের কারণে এমন কাজ করতে পারেন। তাই কোনো একটা তথ্য, ঘটনা কিংবা কাহিনিকে ইতিহাস বলে দাবি করলেই তা ইতিহাস হয়ে যায় না। যথোপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ হাজির করে এবং সেগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবল তা ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে।

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. রোমিলা থাপারের গ্রন্থে আছে ইতিহাসের নাম ব্যবহার করা বইয়ের পাতায় ছাপানো যেকোনো বর্ণনা কিংবা কোনো ব্যক্তি ইতিহাস শব্দ ব্যবহার করে কোনো কিছু লিখলেই বা বললেই তা ইতিহাস হয় না। সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি কিংবা মানুষের জীবনে অতীতে ঘটে যাওয়া যেকোনো ঘটনার বর্ণনা তখনই ইতিহাস হবে যখন তা রচনার সময়–

- ইতিহাসের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে;
- উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে;
- যথাসম্ভব নির্মোহ-নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হবে; আর
- নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রেখে বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন উপাদান ও উৎসের ভিত্তিতে ইতিহাস জানতে হয়। ইতিহাস কেবল অতীতে রাজা-বাদশাহদের জীবন-কাহিনি নয়, তাদের সফলতা, যুদ্ধজয় অথবা রাজত্ব বিস্তারের বিবরণ নয়। ইতিহাসের পরিধি অনেক ব্যাপক। হাজারো প্রতিকূলতা জয় করে পৃথিবীর বুকে মানুষের টিকে থাকার যোগ্যতা আর দক্ষতার বিবরণ ইতিহাসের মুখ্য বিষয়।

যেসব উপাদান ও উৎস থেকে ইতিহাস জানার চেষ্টা করা হয়, সেগুলোর সমালোচনামূলকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুবই জরুরি। সেগুলোতে কারও কোনো পক্ষপাত বা নিজস্ব মতামত প্রকাশিত হয়েছে কি না, তা যাচাই করে দেখাও অবশ্য কর্তব্য।

চলো দুটো উদাহরণ থেকে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করি। প্রাচীন ভারতের সপ্তম শতকের শাসক হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট রচিত 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে লেখক শাসকের এমন গুণকীর্তন করেছেন যা সত্যকে অনেক ক্ষেত্রেই ছাড়িয়ে গেছে। এই গুণকীর্তন কিন্তু ইতিহাস নয়। গুণকীর্তনের মধ্য থেকে যেটুকু সত্য আছে তা খুঁজে বের করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলেই কেবল তা ইতিহাসে জায়গা পেতে পারে। ইতিহাসের গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণ করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই আর উৎসকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে এই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

স্থান ও কালের ভিন্নতায় ইতিহাসের ভিন্নতা

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস জানা, বোঝা ও লেখার উপায় অর্থাৎ কলা কৌশল ও পদ্ধতিগত দিকগুলো নিয়ে চলো সংক্ষেপে আলোচনা করে সহজভাবে বিষয়টা বুঝতে চেষ্টা করি।

স্থান ও কাল নির্ধারণ: ইতিহাস চর্চায় যথাযথভাবে স্থান ও কাল নির্ধারণ করা একজন ইতিহাসবিদের প্রথম কর্তব্য। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের ইতিহাস নানান সময়ে নানান রকম হয়। আবার একটি স্থানের ইতিহাসের সঙ্গে অন্য অনেক স্থানের ঘটনা যুক্ত থাকে। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই স্থান এবং কাল বিষয়ে ইতিহাসবিদকে সচেতন থাকতে হয়।

দরবারি ইতিহাসচর্চার অসুবিধা বা সমস্যা: ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উৎসের স্বল্পতা একটি প্রধান সমস্যা। ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বাংলার ক্ষেত্রে যেসব লিখিত উৎস পাওয়া যায় তার অধিকাংশই নানান পর্যটক

এবং রাজদরবারে বসে লেখা। এসব লেখায় রাজাদের গুণকীর্তন বেশি থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের কথা খুব কমই জানা যায়। আর এই রাজা-বাদশাহদের গুণকীর্তনকেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইতিহাস বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই চলেছে ১৮০০ সাল পর্যন্ত। এরপর ব্রিটিশদের হাতে যে ইতিহাসচর্চা হয়েছে, সেখানেও ঔপনিবেশিক স্বার্থের প্রতিফলন দেখা যায়। ইতিহাসের পাঠক ও লেখকদের তাই খুব সাবধানে উৎস নির্বাচন করে নানানভাবে বিশ্লেষণ করে সঠিক ইতিহাস খুঁজে বের করতে হয়।

নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি: ইতিহাসের আরেকটি জরুরি বিষয় হচ্ছে ইতিহাসবিদের নির্মোহ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। ইতিহাস লিখতে বসে ইতিহাসবিদ যদি কোনো বিশেষ ভাষা, ধর্ম, অঞ্চল, রাজ্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির পক্ষ গ্রহণ করে ফেলেন, তবে সেই ইতিহাস আর নিরপেক্ষ থাকে না। সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠে সকল ভাষা, জনপদ, জনজাতি তথা মানুষের কণ্ঠস্বর হতে হয় ইতিহাসকে। বিশেষ কোনো গোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি বা অর্থনৈতিক গৌরব আর মহিমাকে তুলে ধরার কাজ ইতিহাসের নয়।

সাধারণীকরণের সমস্যা: ইতিহাসে সাধারণীকরণের সমস্যা সবচেয়ে প্রকট। একজন ইতিহাসবিদ বর্তমান পৃথিবীর বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে অতীত পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ড নিয়ে কাজ করেন। বর্তমানের নানান প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, ধ্যান-ধারণা আর ভাষা-ধর্ম-রাজনীতি তাঁর অনুসন্ধানকে নানান মাত্রায় প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে গিয়ে অনেক সময় বর্তমান বাংলাদেশ কিংবা বর্তমান ভারতকে বুঝানো হয়। প্রতিটি ধর্মের যে ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক রূপ রয়েছে, তার যথাযথ প্রতিফলন ইতিহাসের গবেষণায় থাকা একান্ত দরকার। ইতিহাসের কোনো বয়ানে ভাষা-ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো মানুষকেই ছোটো করে দেখার কোনো সুযোগ ইতিহাসে নেই। মানুষকে হেয় করে কোনো মন্তব্য করাটা ইতিহাসের সরাসরি ব্যত্যয়।

জেনে রাখা ভালো

বৈচিত্র্য আর ভিন্নতাকে অস্বীকার করতে গিয়েই আমরা ইতিহাসে সাধারণীকরণের সংকটে পড়ি। এই সংকট থেকে আমাদের অবশ্যই বের হতে হবে। পরিচয়, পেশা, শ্রেণি, শিক্ষা, কাজের ধরন, পোশাক, কথা বলা, ভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি কোনো কারণেই কাউকে আলাদা মনে করা ঠিক নয়। কারণ, একটা বিষয় সব সময় মনে রাখতে হবে, ভিন্নতা আছে বলেই আমাদের পৃথিবীটা এত সুন্দর। একবার ভেবে দেখি, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির ভিন্ন গাছ না থেকে যদি শুধু এক প্রকারের গাছ থাকত তবে কি পৃথিবী এখনকার মতো এত সুন্দর লাগত? তাই ভিন্নতাকে, বৈচিত্র্যকে আমাদের সব সময় সমান চোখে নিজেদের মতো করেই দেখতে হবে। আমাদের আজকের সমাজে হয়তো এর চর্চা পুরোপুরিভাবে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমরা জানি, আমাদের হাত ধরেই বৈচিত্র্যকে বরণ করে নেওয়ার সুন্দর সংস্কৃতি আমাদের দেশে এবং দেশের গণ্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর সবখানে চালু হবে।

ভারতীয় উপমহাদেশ, বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রাগিতিহাস এবং ইতিহাসের যুগ বা কালবিভাজন

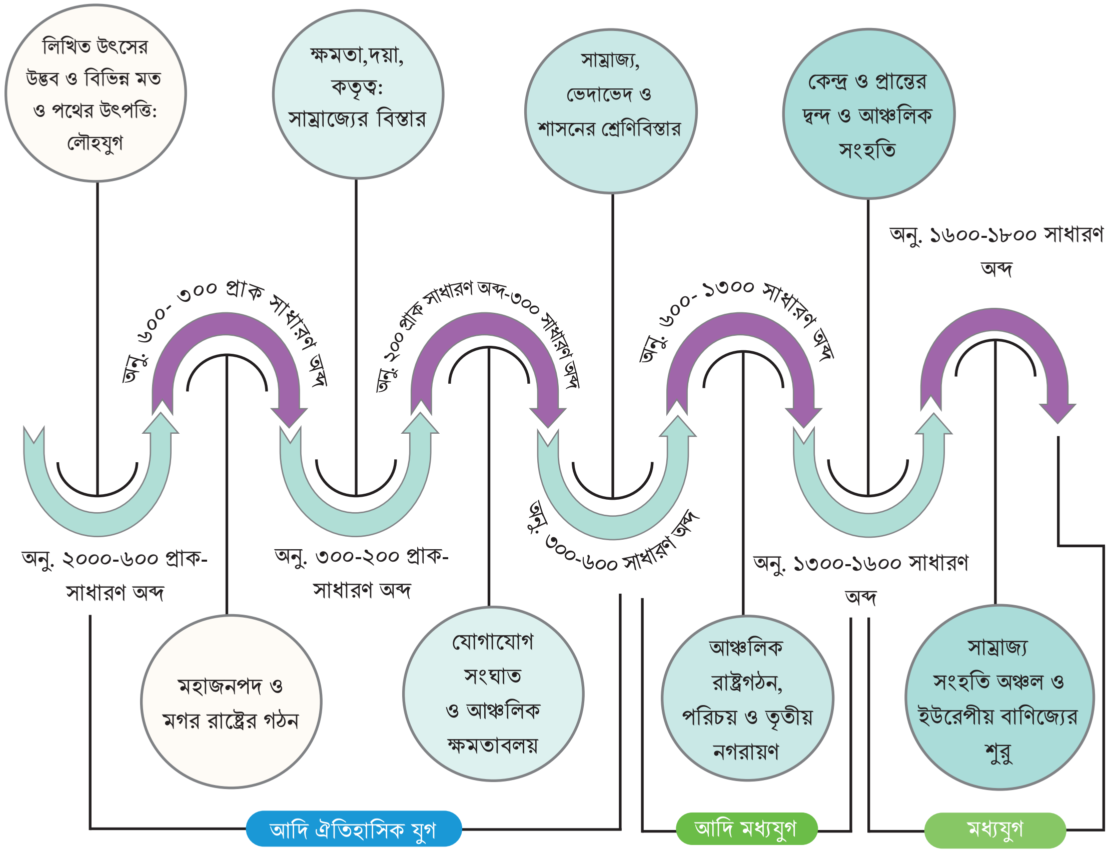

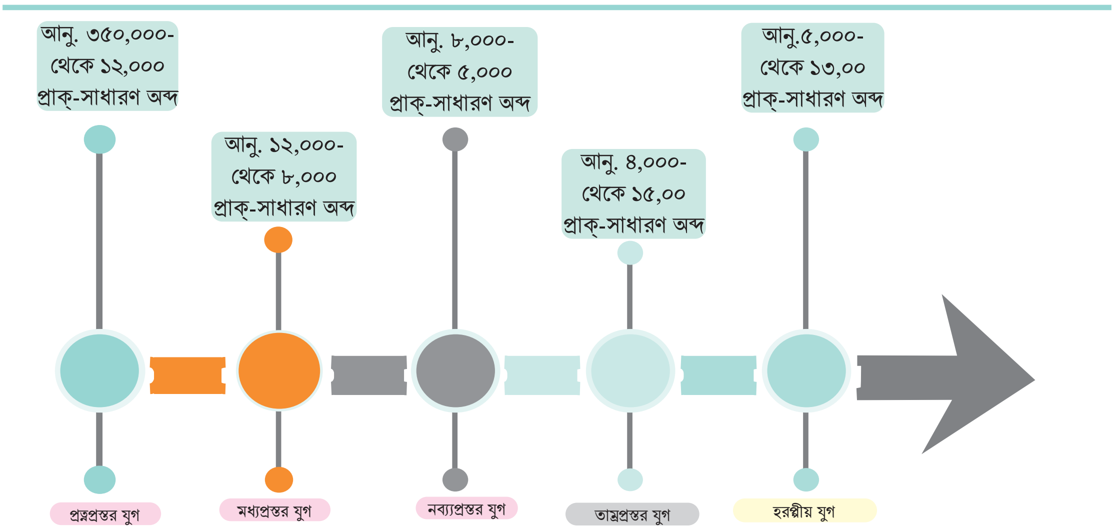

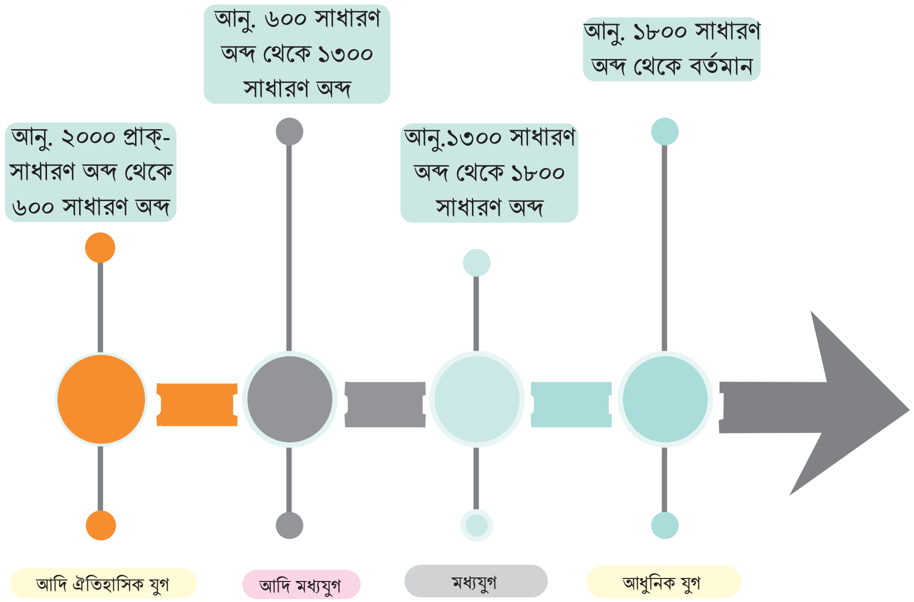

ইতিহাসে যুগ বা কাল বিভাজন

ইতিহাসের যেকোনো আলোচনায় যুগ বা কাল বিভাজন বা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগ বা কাল বিভাজনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে একাধিক সময় কাঠামোর মধ্যে বিভক্ত করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশ বা এর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস মোটামুটিভাবে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়– প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ। ইউরোপের ইতিহাসেও এরকম কালবিভাজন রয়েছে। কালবিভাজন করা হয় মূলত এমন কোনো ঐতিহাসিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিস্থিতির ভিত্তিতে, যা কি না একটি ভূখণ্ডের বিপুলসংখ্যক মানুষের জীবনে যুগান্তকারী কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তরকে ইঙ্গিত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের যত অর্জন, পরিবর্তন বা রূপান্তর সেটি সব অঞ্চলে একই সময়ে হয়নি। মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনা ঘটেছে। তাই ইতিহাসের কাল বিভাজনও ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য।

লিখিত উৎস বা উপাদান প্রাপ্তি এবং তার পাঠোদ্ধারের ভিত্তিতে ‘ঐতিহাসিক যুগ’ শুরু হয় বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন। লিপি আবিষ্কারের পূর্ববর্তী সময় ‘প্রাগৈতিহাসিক কাল’ বা যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগকে কেউ কেউ সেই সময়ের রাজা বা শাসকদের নামে কিংবা তাদের বংশের নামে ডাকেন। কেউ বলেন, রাজাদের বংশের নামে যুগের নাম না হয়ে এমন কোনো নাম হোক, যা সকল মানুষের ইতিহাসের কথা বলবে।

তাই মৌর্য বংশের নামে মৌর্য যুগ, গুপ্ত রাজবংশের নামে গুপ্ত যুগ, পাল রাজবংশের নামে পাল যুগ, সুলতানদের শাসনকালকে সুলতানি আমল, মোগল রাজবংশের শাসনামলকে মোগল যুগ ডাকার পরিবর্তে অনেকেই প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও ব্রিটিশ যুগ বা আধুনিক যুগ বলে অভিহিত করে থাকেন।

জেনে রাখা ভালো

জেমস মিল। একজন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ। ১৮১৭ সালে তিনি লিখেছিলেন 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস'। এই গ্রন্থেই তিনি প্রথমবার হিন্দু যুগ, বৌদ্ধ যুগ, মুসলিম যুগ ইত্যাদি কাল বিভাজন ব্যবহার করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, নিজেদের সময়কে তিনি খ্রিষ্টানযুগ না বলে লেখেন ব্রিটিশ যুগ। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার স্পষ্ট করে বলেন, কাল বিভাজন নিয়ে এই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশদেরই সৃষ্টি। ভারত এবং বাংলাদেশের একশ্রেণির ইতিহাসবিদ এখনো এই কাল বিভাজন অনুসরণ করেই ইতিহাস চর্চা করেন যা যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য নয়, ইতিহাসসম্মত একেবারেই নয়।

তোমরা হয়তো জেনে থাকবে যে, যিশু খ্রিষ্টের জন্মসালকে ভিত্তি বছর ধরে এর পূর্বের সময়কালকে বলা হয়েছে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ এবং পরের সময়কাল পরিচিতি পেয়েছে খ্রিষ্টাব্দ নামে। আধুনিক ইতিহাসবিদগণ ইতিহাসের কাল বা যুগ বিভাজনকে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রভাব থেকে বের করে এনে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতি প্রদানের জন্য ভিত্তিসাল শূন্যকে সাধারণ সাল (অব্দ) ধরে নতুন কালক্রমের ধারণা চালু করেছেন। একারণেই খ্রিষ্টপূর্বাব্দ হয়েছে সাধারণ পূর্বাব্দ বা প্রাক্-সাধারণ অব্দ এবং খ্রিষ্টাব্দ হয়েছে সাধারণ অব্দ।

আমরা নতুন অনেক কিছুই শিখছি। এসব শিখতে গিয়ে পুরোনো দিনের অনেক বিষয় এবং তথ্য জানতে পেরে নিশ্চয়ই অনেক অবাকও হচ্ছি! অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, বড় বড় শিক্ষাবিদ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি যারা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন, তাঁরাও ইতিহাস পড়তে গিয়ে, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ঠিক আমাদের মতোই অবাক হন। কেন অবাক হন জানো? কারণ, আমরা প্রত্যেকেই বাস করি নিজ নিজ সময়ে, বর্তমানে। আর বর্তমানে থেকে যখন অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে পড়তে যাই, তখন দেখা যায়, এখনকার অনেক কিছুর সঙ্গেই অতীতের কোনো মিল নেই। একই বিষয় বা ধারণা অতীতে ছিল এক রকম আর পরবর্তী সময়ে হয়ে যায় অন্যরকম। বর্তমানে বসে অতীত নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাই একজন ইতিহাসবিদকে বেশ বেগ পেতে হয়।

একটু গোলমেলে ঠেকছে, তাই না? একটা উদাহরণ দিয়ে বললেই খুব সহজে বুঝতে পারবে। আমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, 'বিদেশি' বলতে কী বুঝায়? আমরা চোখ বন্ধ করে বলব, বিদেশি হলো তাঁরাই যাঁরা আমাদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরে থেকে এই দেশে এসেছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো 'বিদেশী' কে? তাহলে তিনি কী বলতেন জানো? তিনি বলতেন, অপরিচিত কোনো ব্যক্তি যে আমাদের গ্রামে বা অঞ্চলে থাকে না, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ নয়, তিনি বা তাঁরাই বিদেশি।

আবার ধরো, আমরা যে বললাম বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারা আসবেন তারাই বিদেশি। এখন এই বাংলাদেশ বলতে আমরা যে ভূখণ্ডকে বুঝি, তা কি প্রাচীনকালে একই রকম ছিল? না, ছিল না। একেক সময়ে বাংলা অঞ্চল ছিল একেক রকম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে অঞ্চল বা দেশের সীমানা

পাল্টে গেছে, বদলে গেছে মানচিত্র। মানচিত্রের কথা যখন এলোই, চলো প্রাচীন বাংলার একটা মানচিত্র দেখে আসি। এই মানচিত্রটি তোমার বইয়ের ৩২নং পৃষ্ঠায় দেখতে পারো। যিনি মানচিত্র তৈরি করেন তাঁকে মানচিত্রকার বা Cartographer বলা হয়।

এই যে দেশি, বিদেশি, স্থানীয়, বহিরাগত ইত্যাদি শব্দ বইয়ের পাতায় আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করি, এগুলো দিয়ে আমরা আসলে কী বুঝাই? পৃথিবীর বুকে জাতি-রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পূর্বের যেকোনো জনগোষ্ঠীর ইতিহাস বর্ণনায় এই শব্দগুলোর রাজনৈতিক অপব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। কেউ দেশি, কেউ বিদেশি, কেউ স্থানীয় আর কেউ বা কেনো বহিরাগত হবেন? কোনো একটি ভূখণ্ডে সকলেই তো হতে পারেন বিভিন্ন সময়ের বসতি স্থাপনকারী।

স্থান ও কালের ভিন্নতায় ইতিহাসের ভিন্নতা হতে বাধ্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক, চিন্তারও বদল হয়। আর এই বদলে যাওয়াটা ভাষা, শব্দ, সংস্কৃতি, অভ্যাস, জীবনযাপন থেকে শুরু করে সবকিছুর উপরই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কথা হলো, এই বদলে যাওয়ার সঙ্গে আমাদের আজকের পাঠের সম্পর্ক কোথায়? আমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম 'ইতিহাস জানার উপায়'। শিরোনাম পড়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছ যে, আদি ঐতিহাসিক কাল, আদি মধ্যযুগ এবং মধ্যযুগের ইতিহাসে বাংলা অঞ্চলে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক কেমন ছিল, একে অপরের সঙ্গে বা এক জায়গার মানুষ অন্য জায়গার মানুষের সঙ্গে কীভাবে মিশত এবং এই মিশতে গিয়ে কী কী নতুন ধারণা বা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত এবং অভ্যস্ত হতো, সেসবের যৌক্তিক এবং গ্রহণযোগ্য বয়ান ইতিহাসে কীভাবে স্থান পেতে পারে তা নিয়েই আমাদের আলাপ।

আর এই আলাপের বড় অংশ জুড়েই রয়েছে বদলে যাওয়া ইতিহাস, সংস্কৃতি, মিশ্রণ এবং নতুন ধারণার উৎপত্তির বয়ান তৈরি হয় কীভাবে? এই বয়ান কারা তৈরি করেন? কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটি বয়ান তৈরির পেছনে কোনো অপরাজনীতি কাজ করে? ইতিহাস জানার উপায় নিয়ে আমাদের এই চলমান আলাপের প্রধান কারণ হলো, যেকোনো বিভ্রান্তিকর তথ্য, বাদ দিয়ে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করতে শেখা। ইতিহাসে কীভাবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তা অনুধাবন করতে পারাও এই আলাপের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমরা নিশ্চই এখন বুঝতে পেরেছি ইতিহাস খুঁজতে হলে আমাদের বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। এখন আমরা যেকোনো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা শনাক্ত করব। সেই ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশ: রাজনৈতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা অঞ্চলের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ইতিহাস অনুসন্ধান করব আজ আমরা। দীর্ঘ এই আলাপের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করব কীভাবে রাষ্ট্র নামের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়েছে, কী ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। আমরা আরও অনুধাবন করব, রাষ্ট্র ও শাসক শ্রেণির সঙ্গে ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে মানুষের সম্পর্ক কেমন ছিল এবং কী ধরনের প্রতিকূলতা মানুষ জয় করেছে।

সাধারণ মানুষের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সেই সব বিপ্লব আর বিদ্রোহে জনমানুষের অনেক নেতাই নেতৃত্ব দিয়েছেন। হাজার বছরে গড়ে ওঠা রাজনীতি আর রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাঁদের হাত ধরেই এসেছে পরিবর্তন। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে নিজেদের জীবন পর্যন্ত তাঁরা বিলিয়ে নানান উত্থান-পতন আর ভাঙা-গড়ার অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে। বাংলা অঞ্চলের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসের সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ এবং দৃষ্টান্তমূলক এই ঘটনার যিনি রূপকার তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একমাত্র নেতা যিনি বাংলা অঞ্চলের কাদা-মাটি, নদী-নালা, বিল, হাওর-বাঁওড়, বৃষ্টি আর সবুজের ভেতর দিয়ে ওঠে এসে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর আগে বাংলার ইতিহাসে এই ভূখন্ড থেকে ওঠে আসা আর কোনো নেতা সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য, সকল ধর্মের সকল মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য জীবন বাজি রেখে কাজ করেন নি। গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার এক অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান শেখ মুজিবই সর্বপ্রথম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন।

বাংলা অঞ্চলে প্রাচীন জনপদ: রাজনীতির সূচনা

ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ছোটো ছোটো অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় গড়ে উঠতে শুরু করে। একক ও ঐক্যবদ্ধ কোনো রাজ্য বাংলা অঞ্চলে ছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাম-পরিচয়গুলোকে বলা হয় জনপদ বা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক একক। জনপদগুলো গড়ে উঠেছিল বাংলায় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের আগমনের বহু আগেই। প্রাচীনকালে লিখিত বৌদ্ধ ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলো থেকে আমরা যে কটি জনপদের নাম জানতে পারি, তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটির পরিচয় সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

বঙ্গ

বঙ্গ নামক কোনো একটি কৌম বা জনগোষ্ঠীর হাত ধরে বঙ্গ জনপদের জন্ম হয়েছিল বলে জানা যায়। এই শব্দের অর্থ 'জলাভূমি' বা 'কার্পাস তুলা'। তবে বাংলার মতো জল-কাদা ও জঙ্গালের ভূখণ্ডে মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ে এই জনগোষ্ঠী বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। মহাকবি কালিদাসের লেখা থেকে জানা যায়, নৌযুদ্ধে বঙ্গীয়রা ছিল খুবই দক্ষ। বাংলার জলভিত্তিক সক্রিয় ব-দ্বীপ এলাকা তথা, বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা-ফরিদপুরের বৃহত্তর এলাকায় প্রাচীন বঙ্গ জনপদ গড়ে উঠেছিল। এর সীমানা কখনো কখনো পশ্চিম দিকেও সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের প্রধান অংশটি অতীতের বিভিন্ন কালপর্বে বঙ্গের আওতাভুক্ত ছিল।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পুন্ড্র

পুণ্ড্র বাংলার আরেকটি প্রাচীনতম জনপদ। পুন্ড্র নামের একটি জনগোষ্ঠীর থেকেই এই জনপদের উৎপত্তি। এই জনপদের কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রনগর। এই পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রাপ্ত প্রত্নস্থল বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে। পুণ্ড্র জনপদেরই একটি অংশের নাম প্রাচীনকালে বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিল। তোমরা জেনে আনন্দ পাবে যে, প্রাচীনকালে এই পুণ্ড্র শব্দটির অর্থ ছিল ইক্ষু বা আখ।

রাঢ়

বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর উভয় তীরের এক বিস্তৃত জনপদ হিসেবে ছিল এর অবস্থান। দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত এই জনপদ বিস্তৃত ছিল। এই রাঢ়েই আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে তাম্র-প্রস্তর যুগের সূচনা ঘটেছিল। অজয় নদের তীরে পাণ্ডু রাজার ঢিবি নামে পরিচিত স্থানে বাংলার আদি মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি রচনার সর্বপ্রথম নিদর্শন পাওয়া গেছে। আবার রাঢ় এলাকাতেই আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে তাম্রলিপ্তি নামে একটি নৌ এবং সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠেছিল। বাংলার সবচেয়ে পুরোনো এই বন্দর ধরে বাংলার শস্য, বস্ত্র, সুগন্ধি মসলা গ্রিসসহ বর্তমান ইউরোপের নানান স্থানে রপ্তানি হতো।

সমতট

সমতট ছিল বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের জনপদ। মেঘনা নদীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে বর্তমান কুমিল্লা-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম এবং ভারতের ত্রিপুরার প্রধান অংশ নিয়ে এই জনপদ গড়ে উঠেছিল। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সুয়ান জাং (হিউয়েন সাং) নামে একজন চৈনিক পর্যটক বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি, প্রাচীন সমতট ছিল বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান একটি কেন্দ্র। এখানে তিনি অনেক স্থাপনা দেখেছিলেন। এই স্থাপনাগুলোকে বলা হতো বিহার। বিহারগুলোতে বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুরা বসবাস করতেন, ধর্ম এবং জ্ঞান চর্চা করতেন।

বাংলার প্রাচীন এই জনপদগুলোর কথা আমরা জানতে পারি প্রধানত বৈদিক সাহিত্য থেকে। বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল আর্য ভাষার মানুষের হাতে। এসব গ্রন্থে বাংলার প্রাচীন জনপদের কথা এলেও খুব সম্মানজনকভাবে আসেনি। অধিকাংশ কেন এই রকম বলা হয়েছে জানো? পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে যখন আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করছিলেন তখন এই অঞ্চলে অনেক আগে থেকে যাঁরা বসবাস করছিলেন তাঁদের বাধার মুখে তাঁরা পড়েছিলেন। আধিপত্য বিস্তারে এই দ্বন্দ্বের কারণেই সেই সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলা অঞ্চলের মানুষদের তুচ্ছ করে দেখানো হয়েছে।

যাহোক, আর্যদের মধ্য থেকেই একসময় মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান ঘটে। এইসব রাজশক্তির হাত ধরে বাংলায় আর্য ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বা বৈদিক সংস্কৃতি প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে এইসব জনপদের নগরকেন্দ্রিক মানুষের ওপরও আর্য ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

বাংলা অঞ্চলে মৌর্য ও গুপ্তদের রাজনীতি ও ক্ষমতা সম্প্রসারণ

মৌর্যদের পর উত্তর ভারতে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন গুপ্ত বংশের সম্রাটগণ। এই বংশের সম্রাটদের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রমুখ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৌর্যদের মতো গুপ্তরাও রাজ্য সম্প্রসারণবাদী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বাংলা অঞ্চলে সৈন্য অভিযান পরিচালনা করে বঙ্গ, পুন্ড্র প্রভৃতি জনপদ নিয়ন্ত্রণে নেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে সমতট পর্যন্ত গুপ্তদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল বলে গুপ্তদের বিভিন্ন উৎস হতে জানা যায়।

শাসনকাজ পরিচালনার জন্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে সম্রাট বড়ো বড়ো যোদ্ধা এবং সেনাপতিদের পাঠাতেন। উচ্চপদস্থ এই প্রশাসকেরা বাইরে থেকে এসে বাংলা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের পাশাপাশি আসতেন নতুন ধর্ম-সংস্কৃতি আর অনেক বিদ্বান, পুরোহিত, ব্যবসায়ী মানুষজন। রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি নতুন ধর্ম-সংস্কৃতি বিস্তারেও তারা কাজ করতেন। এভাবে দীর্ঘকাল চলতে থাকে। কোনো এক সময় কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিলে কিংবা সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়লে বাংলা অঞ্চলের উচ্চপদস্থ সামরিক ব্যক্তিদের অনেকেই নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা দিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতেন। বাংলা অঞ্চলে যেসব রাজার নাম তোমরা পাবে তাদের অধিকাংশই দেখবে বাংলা ভূখণ্ডের সীমানার বাইরে বহুদূর থেকে এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। তার মানে কী জানো? তার মানে হচ্ছে, বাংলায় আদি যে অধিবাসীরা ছিলেন রাজক্ষমতা তাঁদের হাতে ছিল না। তাঁরা ছিলেন সাধারণ। প্রতিকূল প্রকৃতি আর নিজেদের বাঁচিয়ে জীবন-ধারণ করাই ছিল তাঁদের জন্য সবচাইতে বড়ো চ্যালেঞ্জ। বাংলা অঞ্চলে তাই যখনই কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার নেতৃত্ব দিয়েছেন বাইরের অঞ্চল থেকে আসা কোনো কোনো যোদ্ধা।

বাংলা অঞ্চল: গুপ্ত পরবর্তীকালীন রাজনৈতিক অবস্থা

ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে উত্তর ভারতকেন্দ্রিক গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে কেন্দ্র থেকে দূরের রাজ্যগুলো তখন আবারও স্বাধীন হতে শুরু করে। এই সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মতো পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসত্তা গড়ে ওঠার খবর পাওয়া যায়। বঙ্গ তেমনই একটি রাজ্যসত্তা হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। বঙ্গ রাজ্যের উত্থান হয়েছিল গোপচন্দ্র নামে একজন শাসকের হাত ধরে ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় দশকে। রাজ্যটির কেন্দ্রস্থল ছিল বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায়। আর খুব সম্ভবত বিস্তৃত ছিল গঙ্গা নদীর দুই স্রোতোধারা অর্থাৎ পদ্মা ও ভাগীরথী নদীর অন্তর্বর্তী ভূভাগের প্রধান অংশে। এই হিসেবে বঙ্গ রাজ্যের সীমানা বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, যশোরের বৃহত্তর এলাকা এবং বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাংশব্যাপী বিস্তৃত হয়েছিল বলে ইতিহাসবিদ বিএন মুখার্জী গবেষণা করে জানিয়েছেন। গোপচন্দ্র ছাড়াও ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব, দ্বাদশাদিত্য, সুধন্যাদিত্য ছিলেন বঙ্গ রাজ্যের পাঁচ জন রাজা। তাঁদের জারি করা তাম্রশাসন ও মুদ্রা পাওয়া গেছে। আনুমানিক ৫২৫ থেকে ৬০০ সালের মধ্যে এই সকল রাজা বঙ্গের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গৌড় নামে আরেকটি রাজ্যসত্তার উত্থান ঘটেছিল সপ্তম শতকের শুরুর দিকে রাজা শশাঙ্কের হাত ধরে। গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ যা এখন বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলা প্রদেশের মুর্শিদাবাদ জেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এই গৌড় রাজ্যসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাংলা অঞ্চলের উত্তরাংশ এবং পশ্চিমাংশের বিস্তৃত এক এলাকা; যার মধ্যে ছিল বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুরের এলাকাসমূহ এবং বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এবং বিহারের অংশবিশেষ। তবে হ্যাঁ, বঙ্গ এবং গৌড়ের সীমানা যে সব সময়

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

একই ছিল তা কিছুতেই বলা যাবে না। রাজাদের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমানাও বদল হয়ে যেত। কখনো এসব রাজ্যের রাজারা অভিযান চালিয়ে নতুন এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন, আবার কখনো অন্য এলাকার রাজাদের আক্রমণের ফলে নিজ রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়েছে।

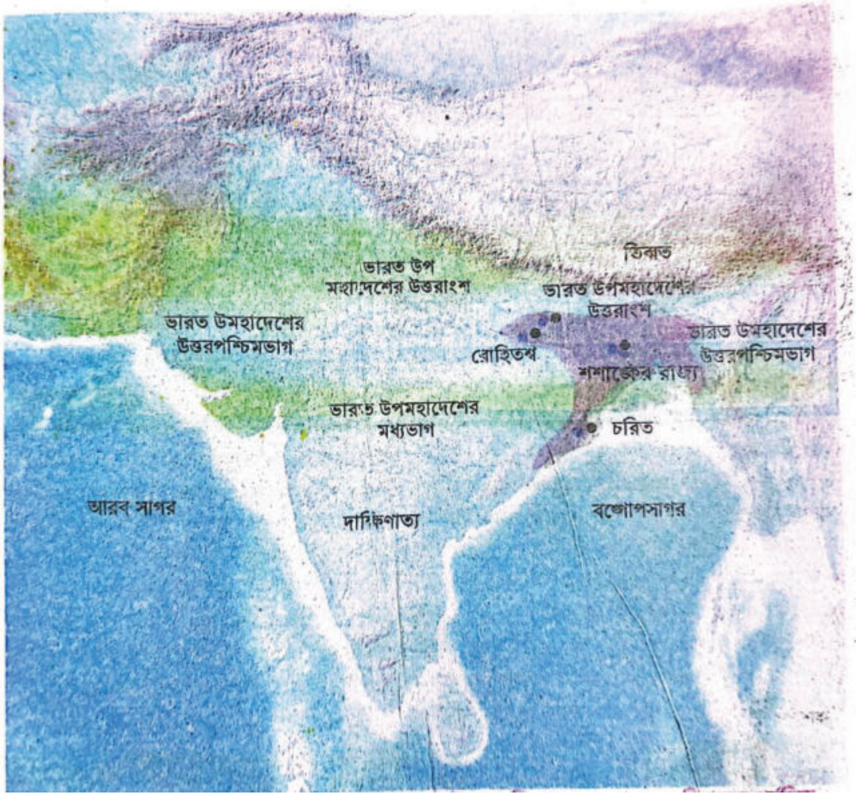

শশাঙ্কের রাজত্বের আনুমানিক বিস্তার

এই কৃতিত্বের পাশাপাশি শশাঙ্ক নিজের শক্তি প্রদর্শনের জন্য তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা-কেন্দ্র মগধ, উৎকল এবং কঙ্গোদের দিকেও সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন বলে তাম্রশাসন, মুদ্রা এবং অন্যান্য সাহিত্যিক উৎস থেকে জানা যায়। শশাঙ্ককে বাংলা অঞ্চলের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শাসক বলা যেতে পারে। নিজের রাজ্যের বাইরে উত্তর ভারতের দিকে সৈন্য পরিচালনার মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করেছিলেন। শশাঙ্কের পর বাংলার পাল বংশের শাসক ধর্মপাল এবং দেবপালও একইভাবে সাম্রাজ্যবাদী কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছিলেন। মগধ এবং কনৌজে আধিপত্য বিস্তার করে নিজেদের আধিপত্য বৃদ্ধিতে এবং গৌরব প্রচারে তৎপর হয়েছিলেন।

মাৎস্যন্যায় ও পাল রাজাদের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বাংলা অঞ্চলে শক্তিশালী কোনো শাসক ছিলেন না। এর ফলে বাংলায় বহিঃশক্তির আক্রমণ শুরু হয়। বাংলার অভ্যন্তরেও সামন্তরাজারা একে অন্যকে হত্যা করে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এর ফলে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। প্রায় একশ বছর ধরে চলমান এই অরাজকতা ইতিহাসে 'মাৎস্যন্যায়' নামে পরিচিত। পুকুরে বড়ো মাছ ছোটো মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল

পরিস্থিতিকে বলে মাৎস্যন্যায়। শব্দটি প্রথম কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন। যাহোক, এই অরাজকতার অবসান হয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে গোপাল নামে একজন শাসকের হাত ধরে বাংলায় পাল বংশের উত্থানের মধ্য দিয়ে। এই বংশের রাজারা সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

পাল বংশের শাসকদের মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল, প্রথম মহীপাল এবং রামপালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপালের মৃত্যুর পর ৭৮১ সালে তাঁর পুত্র ধর্মপাল ক্ষমতায় আরোহণ করেন। পাল বংশের অন্যতম ক্ষমতাধর রাজা বলা হয় তাঁকে। ধর্মপালের রাজত্বকালে পাল বংশ এতই ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে যে, উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ এবং রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার বংশের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ক্ষমতা প্রদর্শন ও আধিপত্য বিস্তারের এই লড়াই ইতিহাসে 'ত্রিশক্তির সংঘর্ষ' নামে পরিচিত। এই সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়ে ধর্মপাল প্রতিপক্ষের উভয়ের কাছেই পরাজিত হলেও পরে কিছুকালের জন্য বারাণসী এবং প্রয়াগ দখল করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী এলাকা পর্যন্ত বাংলার রাজ্য সীমানা বিস্তৃত করেন। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল ক্ষমতায় বসেন। দেবপালের সময়েই পাল বংশের রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

পাল সাম্রাজ্যের মানচিত্র

কৈবর্ত বিদ্রোহ

দেবপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের আধিপত্য ক্রমে কমে আসতে থাকে এবং তাঁদের রাজ্যসীমাও হ্রাস পেতে শুরু করে। এমনই এক দুর্বল শাসকের সময়ে বাংলার উত্তরাংশে বরেন্দ্র এলাকায় কৈবর্তদের একটি বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। কৈবর্ত শব্দের মানে হচ্ছে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নেতা দিব্যোক ছিলেন একজন সামন্ত জমিদার। দিব্যোকের নেতৃত্বে পাল বংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র এলাকায় কৈবর্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার ইতিহাসে এই কৈবর্ত বিদ্রোহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। এই সময়েই প্রথম রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে অস্ত্র ধারণ করতে দেখা যায়। অন্যান্য সামন্ত শক্তির সমর্থন থাকলেও দিব্যোক মূলত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই বরেন্দ্র দখল করেছিলেন।

বরেন্দ্র থেকে ক্ষমতা হারালেও পাল শাসনের অবসান হয়নি। বরেন্দ্র এলাকায় যখন কৈবর্ত শাসন বিদ্যমান তখন রামপাল নামে একজন পালবংশীয় রাজা ক্ষমতায় বসেন। রামপাল তাঁর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রকূট, মগধ, রাঢ় সহ চৌদ্দটি রাজ্যের রাজাদের কাছ থেকে সৈন্য ও অস্ত্রসহায়তা নিয়ে বরেন্দ্র আক্রমণ করেন। বরেন্দ্রের শাসনক্ষমতায় তখন দিব্যোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম। ভীম এবং রামপালের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ভীম পরাজিত ও নিহত হন। বরেন্দ্র আবারও পাল সাম্রাজের অধীনে চলে আসে। তবে এই রামপালই ছিলেন পাল বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী রাজা। এরপর মদনপালের সময় পালবংশের পতন ঘটে।

দেব ও চন্দ্র রাজাদের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

পাল রাজবংশের উত্থান হয়েছিল বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম অংশে বরেন্দ্র এলাকায়। তাঁদের ক্ষমতার কেন্দ্রও ছিল উত্তর-পশ্চিম অংশে এবং মগধের অংশবিশেষে। আঞ্চলিক বাংলার উত্তর-পশ্চিম দিকে যখন পাল রাজাদের শাসন চলছে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তখন অনেকগুলো পৃথক ও স্বাধীন রাজবংশের শাসন চলছিল। এঁদের মধ্যে ভদ্র বংশ, খড়গ বংশ, দেব বংশ এবং চন্দ্র বংশের শাসকেরা নদী দিয়ে বিভাজিত বাংলার খানিকটা অংশে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে রাজত্ব করেন। রাজবংশগুলোর রাজধানী ছিল যথাক্রমে কর্মান্ত-বসাক, দেবপর্বত এবং বিক্রমপুর। দেব বংশের রাজাদের রাজধানীর নাম ছিল দেবপর্বত। ক্ষীরোদা নামের একটি নদীকে আশ্রয় করে প্রাচীন দেবপর্বত নগরী গড়ে উঠেছিল। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের কোনো একটি স্থানে ছিল দেবপর্বতের অবস্থান। শান্তিদেব, বীরদেব, আনন্দদেব, ভবদেব ছিলেন দেব বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা। এদের ক্ষমতা কেন্দ্রভূমি ছিল প্রধানত প্রাচীন সমতট এলাকা। বাংলা অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ ধরা হয় চন্দ্র বংশকে।

দশম শতাব্দীর শুরু থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চন্দ্র বংশের রাজারা ক্ষমতায় ছিলেন। এই বংশের উল্লেখযোগ্য দুজন রাজা হলেন ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং শ্রীচন্দ্র। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের রোহিতগিরি ছিল চন্দ্র বংশের রাজাদের উত্থানের কেন্দ্র। এখান থেকেই তাঁরা বঙ্গ ও সমতট এলাকায় ক্ষমতা বিস্তার করেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র ক্ষমতায় বসেন। শ্রীচন্দ্রের সময় চন্দ্র বংশের উত্তর-পূর্ব দিকে কামরূপ এবং উত্তরে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শ্রীচন্দ্র কামরূপে দখল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এবং সাফল্য লাভ করেছিলেন। প্রাচীন শ্রীহট্ট (বর্তমান সিলেট) ছিল চন্দ্র বংশের রাজ্যভুক্ত। পাল এবং চন্দ্র বংশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল বলে জানা যায়। শ্রীচন্দ্রের সময়ে চন্দ্র বংশের রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর।

সেন রাজাদের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আঞ্চলিক বাংলার একটি অংশে (রাঢ় এবং গৌড়) সেন রাজবংশের উত্থান ঘটে। সেন রাজাদের আদি নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট। বরেন্দ্র পুনরুদ্ধারে যারা সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে রামপালকে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিজয় সেন। রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে বিজয় সেন বাংলার কিছু অংশ দখল করে নেন। বিজয় সেন একদিকে পাল বংশের রাজা মদনপালকে পরাজিত করে বাংলার উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং অন্যদিকে বর্ম রাজাকে পরাজিত করে দক্ষিণ-পূর্ব অংশ দখল করে নেন। এছাড়াও কামরূপ, কলিঙ্গ, মিথিলা আক্রমণসহ নানান স্থানে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ক্রমেই আঞ্চলিক বাংলার প্রায় সবটুকু অংশের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ জয় করার পর বিজয় সেন বিক্রমপুরে (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) সেন রাজবংশের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

বিজয় সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন এবং লক্ষণ সেন বংশানুক্রমে সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রয়োদশ শতকের শুরু এবং লক্ষণ সেনের শাসনকালের শেষদিকে তুর্কি-আফগান যোদ্ধা বখতিয়ার খলজি ভারতবর্ষের পূর্বদিকে আক্রমণ পরিচালনা করে সেন সাম্রাজ্যে ভাঙনের সূচনা ঘটান। সেনদের ক্ষমতা বর্তমান বাংলাদেশের বিক্রমপুরে সীমিত হয়ে পড়ে আর বাংলা অঞ্চলের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু অংশ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অংশবিশেষ) তুর্কি খলজিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

তুর্কি-আফগান খলজিদের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমাংশে তুর্কি-আফগান যোদ্ধা ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজির হাত ধরে নতুন এক রাজনীতি আর ক্ষমতা বিস্তারের ইতিহাস গড়ে ওঠে। বখতিয়ার খলজি ছিলেন জাতিতে তুর্কি এবং আফগানিস্তানের গরমসির এলাকার অধিবাসী। অযোধ্যার শাসনকর্তা হুসামউদ্দীনের অধীনে ভারতের উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় ভিউলী ও ভাগত নামের দুটি পরগনার জায়গির লাভ করেন। ভিউলী এবং ভাগতে বসেই বখতিয়ার কিছু সৈন্য সংগ্রহ করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এরপর পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ও জমিদারি এলাকায় আকস্মিক আক্রমণের মধ্য দিয়ে মগধ পর্যন্ত অগ্রসর হন। আকস্মিক আক্রমণের নীতি অনুসরণ করেই বখতিয়ার একদিন গোপনে প্রস্তুতি ও খোঁজখবর নিয়ে ঝাড়খন্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সেন রাজার প্রাসাদ অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন। বলা হয়ে থাকে, ঝাড়খন্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বখতিয়ার এত দ্রুত সৈন্য পরিচালনা করেন যে তাঁর সঙ্গে মাত্র সতেরো-আঠারোজন সৈন্য রাজপ্রাসাদে পৌঁছাতে পেরেছিলেন।

এভাবেই বখতিয়ার খলজি আমাদের বাংলা অঞ্চলের একটি অংশ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন। রাজা লক্ষণ সেনকে বিক্রমপুরের রাজধানীতে ফিরে যেতে বাধ্য করে প্রতিষ্ঠা করেন খলজি বংশের শাসন। লখনৌতিতে স্থাপিত হয় তাঁদের রাজধানী। খলজি রাজাদের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি ছিল ভারতের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। ধীরে ধীরে পির, সুফি, দরবেশ ও সুলতানগণ তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় প্রচলিত ইসলামি সংস্কৃতি বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেন।

দিল্লির সুলতান এবং মোগল শাসকগণ বাংলার জল-জঙ্গলে নিয়মিত নিষ্কর জমি দান করতেন। তাঁদের ভূমি সম্প্রসারণ নীতি বাংলা অঞ্চলে ইসলাম বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিল বলে রিচার্ড ইটন, অসীম রায় এবং মমতাজুর রহমান তরফদার সূত্রে জানা যায়। পরবর্তীকালে আরো নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলা অঞ্চলে নানান ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও এই ভূমির সকল মানুষ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক আশ্চর্য বন্ধনে আবদ্ধ। ধর্মের চেয়ে মানুষ পরিচয় সব সময়ই এখানে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম– সবাই মানবতার জয়গান করেছেন। মধ্যযুগের কবির ভাষায়–

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'!

তোমরা পরবর্তীতে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস আরও বিস্তৃত পরিসরে পাঠ করার সুযোগ পাবে, তখন উৎসের গভীরতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। কিন্তু একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কেবল রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস পাঠ করে এই ভূমির মানুষকে তুমি মোটেই জানতে ও বুঝতে পারবে না। মানুষকে জানতে হলে মানুষের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি– সবই জানতে হবে। তোমরা

দেখবে, বিভিন্ন শতাব্দীতে বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান হচ্ছে। উত্তর ভারতের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ তৎপরতার বিপরীতে চলছে ভারতেরই বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভারতের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চল নিয়ন্ত্রণকারী শাসকদের সঙ্গেও চলেছে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। বাংলার একেকটি অংশে আলাদা রাজবংশ শাসন করেছে। বাইরে থেকে বিশাল যোদ্ধার দল এসে দখল করে নিয়েছে বাংলার ভূভাগ। এভাবেই কালক্রমে বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন মেরুকরণ ঘটেছে। বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা রাজনীতি আর রাজনৈতিক সংস্কৃতির গঠন ও রূপান্তরে ধীরে ধীরে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন।

যাহোক, মধ্য এশিয়া থেকে আগত যোদ্ধারা পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত ছিলেন। জল-জঙ্গল বেষ্টিত বাংলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে যুদ্ধ পরিচালনা করার সক্ষমতা তাঁদের ছিল না। বখতিয়ার তাই পূর্ব দিকে (যেখানে বর্তমান বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে) সেন শাসিত এলাকায় প্রবেশ না করে তিব্বতের দিকে পরবর্তী অভিযান পরিচালনা করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরপর বখতিয়ারের সেনাপতি আলী মর্দান খলজি লখনৌতির সিংহাসন নিয়ন্ত্রণে নেন। আলী মর্দানের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগ নিয়ে বখতিয়ারের অপর দুই সেনাপতি শীরান খলজি এবং গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজির বিবাদ শুরু হয়। ত্রিপক্ষীয় এই দ্বন্দ্বে শীরান এবং মর্দান দুজনেই নিহত হন। লখনৌতির ক্ষমতায় বসেন গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি। বখতিয়ার খলজি লখনৌতিতে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। দিল্লির শাসনকর্তা কুতুবউদ্দীন আইবাক ও গজনীর সুলতান মোহাম্মদ ঘোরীর প্রতি মৃত্যু অবধি আনুগত্য প্রদর্শন করে গিয়েছেন। লখনৌতিকে প্রথম স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়ে নিজের নামে খুতবা প্রচার ও মুদ্রা জারি করেন আলী মর্দান খলজি। গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি ক্ষমতায় আরোহণ করার পর মর্দানের পন্থা অনুসরণ করেন। তিনি দিল্লির মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে নিজের নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করেন। ১২১২ থেকে ১২২৭ পর্যন্ত প্রায় ১৫ বছর লখনৌতি শাসন করেন সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজি। ১২২৭ সালের দিকে ইওজ খলজি যখন বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাজ্য বিস্তারের জন্য সেন রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র নাসিরউদ্দীন লখনৌতি আক্রমণ করেন। ইওজ খলজি তা প্রতিহত করতে দ্রুত ছুটে যান লখনৌতির দিকে। সেখানে গিয়ে তিনি দিল্লির সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েন ও সপরিবার নিহত হন।

ইওজ খলজির মৃত্যুর পর ভারতের তৎকালীন অন্যান্য বহু আঞ্চলিক রাজ্যের মতো লখনৌতি রাজ্য দীর্ঘকালের জন্য দিল্লির শাসকদের অধীনে চলে যায়। লখনৌতির শাসনকর্তা প্রেরিত হয় দিল্লি থেকে। দিল্লির সুলতানের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন লখনৌতির শাসকেরা। আনুগত্যের বদলে কেউ বিদ্রোহ করলে এবং যথাযথ রাজস্ব প্রদান না করলে কেন্দ্রীয় শাসকেরা সৈন্য প্রেরণ করে স্থানীয় শাসকদের উচ্ছেদ করে নতুন শাসক নিয়োগ দিতেন। এ সময়কালে লখনৌতি রাজ্যে যাঁরা শাসনকর্তা হিসেবে আসেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দিল্লির শাসকদের ক্রীতদাস। এজন্য এই সময়কে অনেকে 'দাস শাসন' বা 'মামলুক শাসন' বলেও অভিহিত করে থাকেন।

বাংলা অঞ্চলে ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী বংশের রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়

দিল্লি এবং লখনৌতির শাসকদের উভয়েই মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে চলেছে ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই লখনৌতির বিদ্রোহী শাসকগণ সুযোগ পেলেই লখনৌতির দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমর অভিযান পরিচালনা করে রাজ্য সম্প্রসারণ করতেন। এসব অভিযানের ফলে বাংলা অঞ্চলের বৃহৎ অংশ লখনৌতির শাসকদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৩৩৮ সালের মধ্যে লখনৌতির পাশাপাশি বাংলায় আরও দুটি শক্তিকেন্দ্র

তৈরি হয়। একটি হচ্ছে, লখনৌতির দক্ষিণ দিকে সাতগাঁ, অন্যটি দক্ষিণ পূর্ব দিকে সোনারগাঁ। দিল্লির সুলতানগণ লখনৌতির পাশাপাশি বাকি দুটি কেন্দ্রেও শাসনকর্তা নিয়োগ দিতেন।

সোনারগাঁ

বাংলার পৃথক তিনটি শাসনকেন্দ্র নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাংলা অঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশে শাসক হিসেবে স্বাধীন সুলতানি শাসনকালের সূচনা করেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। ১৩৪২ সালে লখনৌতির ক্ষমতায় বসেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, প্রথমে লখনৌতির দক্ষিণের শাসনকেন্দ্র সাতগাঁ নিয়ন্ত্রণে নেন। এরপর নেপাল ও ত্রিহুত আক্রমণ করে প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করেন। ১৩৫২ সালে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁ আক্রমণ করেন এবং গাজি শাহকে পরাজিত করে সোনারগাঁ দখল করে নেন। তিনটি প্রশাসনিক কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রায় সিংহভাগ জায়গা তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আনতে সক্ষম হন। দিল্লির মুসলমান সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক বাংলার মুসলমান সুলতান ইলিয়াস শাহকে উচ্ছেদ করার জন্য বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। ইলিয়াস শাহ সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে একডালা নামে একটি দুর্গে আশ্রয় নেন। বাংলার বৈরী আবহাওয়া, বর্ষার জল, জঙ্গল ও মশার উপদ্রবে দিল্লির সৈন্যরা বেশি দিন টিকতে পারেননি। ফিরোজ শাহ তুগলক বাধ্য হয়েই দিল্লি ফিরে যান।

দিল্লির দরবারি ঘটনাপঞ্জি লেখক শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাঁর লেখা একটি গ্রন্থে ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই বাঙ্গালাহ', 'শাহ-ই-বাঙ্গালীয়ান' এবং 'সুলতানই বাঙ্গালাহ' বলে উল্লেখ করেছেন। 'বঙ্গ' থেকে উদ্ভূত 'বাঙ্গালা' ও 'বাঙ্গালীয়ান' শব্দ দুটি সমুদয় বাংলা অঞ্চল ও অঞ্চলের সকল মানুষের পরিচয় নির্ধারণে খুব সম্ভবত সেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নাম-পরিচয় নির্ধারণের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ অঞ্চলের সাধারণ প্রজাদের কোনো সম্পর্ক ছিল বলে কোনো উৎস হতে জানা যায় না।

সুলতান ইলিয়াস শাহের বংশধরেরা অনেক দিন বাংলা শাসন করেন। ইলিয়াস শাহী বংশের দুইজন উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন সিকান্দর শাহ এবং গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সময় বাংলার আঞ্চলিক ভূখণ্ডের প্রধান একটি অংশে আবারও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় এই সময় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের পরিবেশ তৈরি হয়। সুলতান আজম শাহের রাজত্বকালেই শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'ইউসুফ জুলেখা' রচনা করেন। সুলতান আজম শাহ নিজেও ফার্সি ভাষায় কাব্য রচনা করতেন এবং পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ ছিল বলে জানা যায়।

ইলিয়াস শাহী বংশের পর বাংলার ইতিহাসে আরেকটি রাজবংশের শাসন দেখা যায়। এটি হলো হুসেন শাহী বংশ। আবিসিনীয় হাবসি ক্রীতদাসদের একটি দল বাংলার শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন। চারজন হাবসি ক্রীতদাস প্রায় ছয় বছর বাংলার রাজক্ষমতায় ছিল। একেকজন শাসককে হত্যা করে অন্য একজন শাসক ক্ষমতায় এসেছিলেন। হাবসি ক্রীতদাসদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে ১৪৯৩ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ। বহু দূরের ভূখণ্ড থেকে তিনি ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্ত অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন মধ্য এশিয়ার অধিবাসী। যাহোক, ক্ষমতা অধিকার করে হুসেন শাহ গোলযোগ সৃষ্টিকারী হাবসি ক্রীতদাস ও আমীরদের অনেককেই হত্যা করেন এবং বাকিদের বিতাড়িত করেন। রাজ কাজে সহায়তার জন্য তিনি তথাকথিত উচ্চ বংশ, অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমান এবং হিন্দুদের নিয়োগ দান করেন। হুসেন শাহ একজন সাম্রাজ্য সম্প্রসারণবাদী শাসক ছিলেন। নিজের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি এবং ধন-সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে তিনি কামরূপ, কামতা, বিহার ও উড়িষ্যার দিকে বারংবার যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেছেন।

হুসেন শাহী শাসনামলে বাংলায় শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যকলার বিশেষ উন্নয়ন লক্ষ করা যায়। এই সময় বাংলার সাহিত্য অঙ্গনে মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ প্রমুখ সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য নামে একটি সাহিত্যধারা চালু হয় মূলত এই সময় থেকেই। আলাউদ্দীন হুসেন শাহী শাসনামলে গৌড়ের 'ছোটো সোনা মসজিদ', 'বড়ো সোনামসজিদ', 'বারোদুয়ারি মসজিদ'সহ অনেকগুলো মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ ও তোরণ নির্মিত হয়।

আফগান ও মোগল শক্তির রাজনীতি ও ক্ষমতাবলয়ে বাংলা অঞ্চল

খেয়াল করে দেখবে, বাংলা অঞ্চলের বৃহৎ একটি অংশে যেসব শাসনকর্তা শাসন করেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন আরব ও পারস্যের ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী অভিজাত মুসলমান। এরা একদিকে নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, অন্যদিকে দিল্লির মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধেও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই নিজেদের শাসন ক্ষমতা ধরে রেখেছিলেন। ক্ষমতার এই টানাপোড়েনে বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের যে কোনো ভূমিকা ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

দিল্লিতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর দিল্লির সিংহাসন নিয়ে আফগান শাসক শেরশাহ শূর এবং মোগল শাসক হুমায়ুনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই দ্বন্দ্বের ঢেউ এসে বাংলার সিংহাসনেও লাগে। শের শাহ এবং হুমায়ুন উভয়েই কিছুকালের জন্য আঞ্চলিক বাংলার প্রধান অংশে প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন রাজধানী গৌড় নিয়ন্ত্রণে রাখেন। হুমায়ুনকে দিল্লির সাম্রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে শের শাহ বাংলাকেও দিল্লির অধীন নিয়ে যান। শেরশাহ ছিলেন আফগান বংশোদ্ভূত শাসক। শের শাহের সূত্র ধরেই বাংলার শাসনক্ষমতা কিছুদিনের জন্য আফগানদের হাতে চলে যায়। দিল্লিতে মোগল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেও বাংলায় আফগান শাসক সোলায়মান কররানী এবং দাউদ কররানীর শাসন চলতে থাকে।

১৫৭৬ সালে সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রেরিত মোগল সৈন্যদের সঙ্গে আফগানদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দাউদ কররানী পরাজিত ও নিহত হন। বাংলায় মোগল শক্তির রাজনীতি ও শাসন সম্প্রসারণের সূত্রপাত ঘটে। আফগান শাসক দাউদ কররানীকে পরাজিত করার পর মোগল শাসকরা বাংলা শাসন করার জন্য সুবাদার প্রেরণ করেন। কিন্তু সুবাদারদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশের কয়েকজন শক্তিশালী জমিদার। এই জমিদাররা সংঘবদ্ধ হয়ে মোগল সুবাদারদের বাধা প্রদান করেন এবং স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জমিদারি এলাকা শাসন করতে থাকেন। ইতিহাসে এই জমিদারগণ বারোভূঁইয়া নামে পরিচিত। বারোভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁর জমিদার ঈসা খান এবং তাঁর পুত্র মুসা খান। ঈসা খানের মিত্র হিসেবে মোগল বিরোধী যুদ্ধে আরও যেসব জমিদার যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে ভূষণার চাঁদরায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ার জমিদার বাহাদুর গাজী, শ্রীপুরের লক্ষণ মাণিক্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোগল শাসক জাহাঙ্গীরের সময় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন ইসলাম খান। ইসলাম খান প্রথমেই মুসা খানকে পরাজিত করেন। এরপর অন্য জমিদারদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। এভাবে তিনি বাংলা অঞ্চলের বিরাট একটি অংশকে মোগল শক্তির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যান। মোগল সুবাদার ইসলাম খানই প্রথম ১৬১০ সালে সুবা বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকায় এবং এর নাম রাখেন 'জাহাঙ্গীর নগর'।

বাংলা অঞ্চলে সুবাদারি ও নবাবি শাসন প্রতিষ্ঠা

তোমরা সকলেই জানো যে, মোগল শাসকগণ তাঁদের অধীনস্থ প্রদেশগুলোর নাম দিয়েছিলেন সুবা। প্রতিটা সুবায় শাসনকাজ পরিচালনার জন্য একজন করে সুবাদার নিয়োগ করতেন তাঁরা। শাহ সুজা, মীর জুমলা এবং শায়েস্তা খান ছিলেন বাংলার উল্লেখযোগ্য সুবাদার। কথিত আছে যে, শায়েস্তা খানের সময়ে বাংলায় এক টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। এই ধরনের সাধারণীকরণ তথ্য সম্পর্কে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নানান উৎসকে সমালোচনামূলক অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

বাংলার মানুষের প্রধান পেশা ছিল কৃষি, প্রধান শস্য ছিল ধান। বাংলার কৃষকেরা দিনরাত খেটে যে ফসল ফলাতেন তার ন্যায্য মূল পেতেন কি না, তা নিয়ে এখন তাই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। তবে বাংলার সুবাদাররা যে এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে রাজস্ব ও উপঢৌকন দিল্লিতে পাঠাতেন তা বিভিন্ন উৎস থেকেই জানা যায়। মোগল শাসকদের যে অগাধ জৌলুশ আর বিলাসী জীবনের গল্প শোনা যায়, সেই বিলাসিতার পেছনে বাংলার খেটে খাওয়া মানুষদের উৎপাদিত ফসল, শ্রম ও ঘামের দাগ থাকলেও তার মূল্যায়ন কি কেউ করেছেন?

১৭০০ সালে বাংলার ক্ষমতায় আসেন মুর্শিদ কুলি খান। তিনি কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রায় স্বাধীনভাবেই বাংলার শাসনকাজ পরিচালনা শুরু করেন। নবাব মুর্শিদ কুলি খানের সময় থেকে শুরু হয় বাংলার নবাবি শাসনকাল। সুবাদারি শাসনের আগে থেকেই বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন এবং বাণিজ্য তৎপরতা শুরু হয়। কলকাতা, চুঁচুড়া, চন্দননগর, হুগলী, চট্টগ্রাম, সাতগাঁও প্রভৃতি এলাকা ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, পর্তুগিজ, ফরাসি বণিকদের ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। বাণিজ্যকেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি তাদের অনেকেই বাংলায় লুণ্ঠনকাজও পরিচালনা করতেন। এসব অপতৎপরতার কারণে সুবাদার এবং নবাবদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়েই পর্তুগিজ, ফরাসি এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বাইরের বণিকদের পাশাপাশি বাংলার অভ্যন্তরেও নবাবি শাসনের আসন দখল নিয়ে অভিজাতদের মধ্যে বিবাদ চলছিল। এরূপ বহুমুখী বিবাদের ফল হিসেবেই ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার ক্ষমতায় আসীন হয়।

অনুশীলনী

সকল শিক্ষার্থীকে ৪টি দলে বিভক্ত করে দেওয়া হলো। এই ৪টি দল বাংলা অঞ্চলের হাজার বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন মানুষের আগমন ও বসতি স্থাপন বিষয়ে পৃথক পৃথক দেয়ালিকা প্রস্তুত করবে। দলের সকল শিক্ষার্থী দেয়ালিকা তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যেকে লেখা দিয়ে কিংবা ছবি এঁকে দেয়ালিকা তৈরিতে সাহায্য করবে। লেখা এবং ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে ইংরেজ ও পাকিস্তানি শাসনের পূর্বে বাংলা অঞ্চলে রাজনীতি আর রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ইতিহাস। শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাদের লেখা এবং ছবি প্রস্তুত করবে।

শোষিত মানুষেরা ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়েছে এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। এই সময়ই ব্যাপকভাবে রাজশক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে কখনো অস্ত্র হাতে আবার কখনো অস্ত্র ছাড়াই লড়াই করতে দেখা যায়। ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষার বিস্তার ঘটে, কতিপয় দেশীয় এবং ইউরোপীয় সমাজ সংস্কারক কুসংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত নতুন সমাজ নির্মাণে ব্রত হন। এর ফলে মানুষের মধ্যে সার্বিক শিক্ষা ও অধিকার সচেতনতার বোধ আরও প্রবল হয়। নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ বিপ্লবী আন্দোলন– এই দুই ধারাতেই এখানে মানুষের রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে। ধারাবাহিক আন্দোলন, বিপ্লব, মিছিল ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলা অঞ্চলের মানুষ একসময় সত্যিকার অর্থেই শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণে রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনের পথে এগিয়ে যায়।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

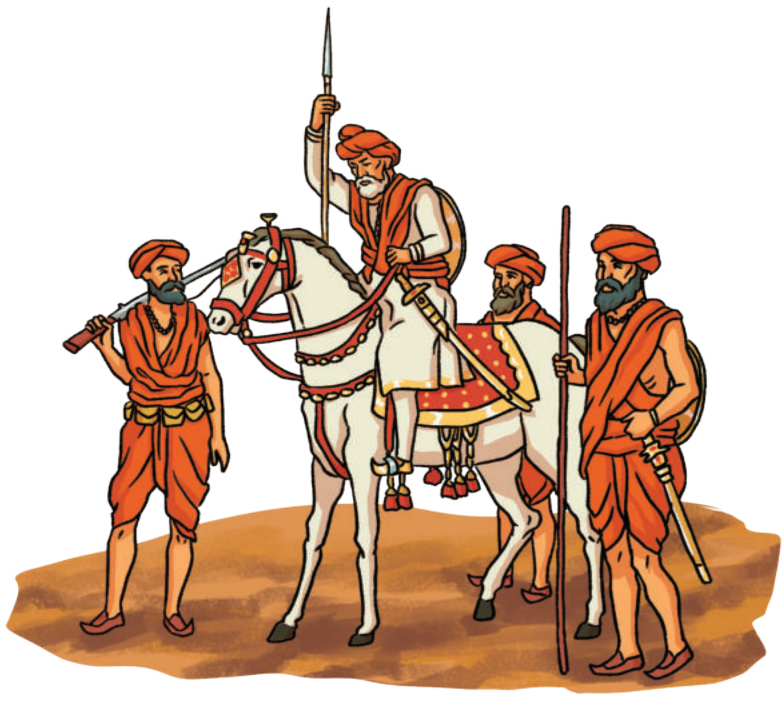

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন এদেশের ফকির-সন্ন্যাসীরা

ফকির-সন্ন্যাসীরা সাধারণত খানকাহ এবং আখড়ায় বসবাস করতেন। কোম্পানির শাসকগণ এমন কিছু আইন করে যার ফলে ফকির-সন্ন্যাসীদের স্বাভাবিক জীবনধারা ব্যাহত হয়। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে ১৭৬০ হতে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলার ফকির-সন্ন্যাসীরা কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন পরিচালনা করেন। সন্ন্যাসীদের পক্ষ থেকে ভবানী পাঠক নামে একজন ব্রাহ্মণ মজনু শাহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন বলে জানা যায়। মজনু শাহের সঙ্গে এই আন্দোলনের বাংলার সাধারণ প্রজাগণও যুক্ত ছিলেন।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় ১৭৬৩ সালে। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজ সরকারের বাণিজ্যকুঠিগুলো। বর্শা, তরবারি, বল্লম, বন্দুক, অগ্নিনিক্ষেপক যন্ত্র, কামান প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিদ্রোহীরা রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, ঢাকা, পাটনা, কোচবিহার, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এলাকায় বিভিন্ন ইংরেজ কুঠিতে আক্রমণ পরিচালনা করে লুণ্ঠন করতেন। যুদ্ধে সৈন্যদের খাদ্য, গোলাবারুদ ও রসদ বহনের জন্য মজনু শাহ উট এবং ঘোড়া ব্যবহার করতেন। সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত একেকটি যুদ্ধে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার ফকির-সন্ন্যাসী যোদ্ধা যোগ দিতেন বলে জানা যায়। এর মধ্যে সাধারণ কৃষক আর প্রজাগণও ছিলেন। ফকির-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে ইংরেজ কুঠিয়ালসহ অনেক সৈনিকের মৃত্যু হয়। মজনু শাহের মৃত্যুর পর মুসা শাহ, পরাগল শাহ, কৃপানাথ, শ্রীনিবাস প্রমুখ ফকির ও সন্ন্যাসী নেতা আরও বহুদিন এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থ ও সম্পদ লুটপাটের শিকার হয় বাংলার সাধারণ মানুষ। ইতিপূর্বে যেকোনো ধরনের দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি বা প্লাবনের সময় বাংলার স্থানীয় জমিদার ও শাসকগণ প্রজাদের খাজনা মওকুফসহ নানা সুবিধা দিয়ে থাকতেন। মহাস্থান ব্রাহ্মীলিপিতে আমরা দেখেছি, প্রাচীনকালে দুর্যোগের সময় প্রজাদের সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় রাজ্য থেকে খাদ্যশস্য ও অর্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ পরিচালিত কোম্পানির সরকার অনাবৃষ্টির কারণে কৃষকেরা ফসল ফলাতে পারেননি জেনেও পূর্ব বছর পূর্ণমাত্রায় রাজস্ব আদায় করে। পরের বছর আবারও অনাবৃষ্টির কারণে ফলন খুবই কম হয়। যেটুকু শস্য উৎপন্ন হয়েছিল, তা-ও রাজস্ব বাবদ কোম্পানির লোকেরা নিয়ে যায়। মানুষের জন্য ত্রাণ বা রাজস্ব মওকুফের কোন ব্যবস্থা রাখে না। এর ফলে দেশ জুড়ে বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইংরেজি ১৭৭০ সাল এবং বাংলায় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যায়। বাংলায় ১১৭৬ বঙ্গাব্দে সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

নীলকর বিদ্রোহ

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনক্ষমতা লাভের পর বাংলার প্রান্তিক কৃষক ও রায়তদের জীবনে যে চরম দুর্দশা নিয়ে এসেছিল তার আরেকটি অন্যতম নজির হচ্ছে নীল চাষ। ইউরোপে শিল্পকারখানাগুলোতে কাপড়ে

রং করার জন্য নীলের দরকার হতো। ইউরোপে নীলের দাম ও চাহিদা ছিল প্রচুর। বাংলার কৃষকদের দিয়ে নীল চাষ করিয়ে ইউরোপে রপ্তানি করে অর্থ উপার্জনের নীল নকশা করে কোম্পানির সরকার। বাংলার কৃষকদের উৎকৃষ্ট জমিগুলো তারা নীল চাষ করার জন্য দাগিয়ে দিতে থাকে। জোর করে কৃষকদের হাতে চাষের খরচ বাবদ কিছু অর্থও তুলে দেয়। একে বলা হতো দাদন। এই দাদনের টাকা সুদ সমেত আদায় করে নিতো নীল সংগ্রহের মাধ্যমে। কৃষকেরা বছরের পর বছর নীল চাষ করেও জোর করে ধরিয়ে দেওয়া দাদনের ঋণ থেকে মুক্তি পেতেন না। কোনো কৃষক নীল চাষ করতে না চাইলে ইংরেজ কুঠিয়ালরা তাঁকে কাছারিবাড়িতে ধরে নিয়ে ভয়ংকর রকমের নিপীড়ন করত। বাংলার কৃষকদের সবচেয়ে উর্বর জমিগুলোতে খাদ্য শস্যের পরিবর্তে নীল চাষ হতে থাকে। সাধারণ কৃষকেরা অপরিমেয় দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হন। এক সময় বাধ্য হয়েই তাঁরা বিদ্রোহ শুরু করেন।

নীল চাষের বিরুদ্ধে সংঘটিত বাংলার সাধারণ কৃষদের এই বিদ্রোহ ইতিহাসে 'নীল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ১৮৫০ সলের পর থেকেই তৎকালীন ফরিদপুর, যশোর, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া এলাকার কৃষকরা সংগঠিত হয়ে স্থানীয় নীলকরদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন। পত্র-পত্রিকায় নীলকর ইংরেজদের অত্যাচারের কাহিনি ছাপা হতে থাকে। যশোরে নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ননী মাধব ও বেনী মাধব, হুগলীতে বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার, নদীয়ায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত কৃষকদের জয় হয়। ব্রিটিশ সরকার এই তীব্র আন্দোলনের মুখে নতুন একটি আইন করে। জোর করে কৃষকদের দিয়ে নীল চাষ করানোর প্রক্রিয়াকে সেই আইনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা ও ফরায়েজি আন্দোলন

সাধারণ কৃষক, তাঁতি, জেলে, তেলি প্রমুখ বাংলার নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বার্থ রক্ষা এবং ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনায় নীল-বিদ্রোহের সমসাময়িক আরও দুজন মানুষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের একজন হলেন তিতুমির, অন্যজন ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ। উনিশ শতকে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে দুটি ধারায় ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়েই হাজী শরীয়তুল্লাহ এবং তিতুমির বাংলার নিপীড়িত রায়ত, কৃষক, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি প্রান্তিক মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ইংরেজ, জমিদার ও নীলকর কুঠিয়ালদের অত্যাচারে পীড়িত মানুষদের সংগঠিত করে তাঁরা সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে অন্যায়ের প্রতিবাদ শুরু করেন। ১৮৩১ সালে ইংরেজ সরকার তিতুমিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। তিতুমির একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে সেখানে কৃষক-শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত লাঠিয়াল বাহিনীর সৈন্য সমাবেশ করেন। ইংরেজরা কামান-বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করলে তিতুমির দেশীয় লাঠি, বর্শা, বল্লম, তরবারি নিয়েই পাল্টা আক্রমণ করেন। অসম এই যুদ্ধে তিতুমির নিহত হলেও তাঁর এই সাহস মানুষকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করার সাহস জুগিয়েছে।

হাজি শরীয়তুল্লাহ

মীর নেসার আলী তিতুমির

অন্যদিকে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহও তিতুমিরের মতো লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করে অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত প্রতিবাদ লড়াই অব্যাহত রাখেন। হাজী শরীয়তুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুদু মিয়া এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলার কৃষক, রায়ত ও নিপীড়িত প্রজাগণ শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনায় অংশ নিচ্ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গণমানসিকতা তৈরিতে এই আন্দোলন বিদ্রোহ যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে– এ কথা বলাই বাহুল্য।

সিপাহি বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালে আরেকটি বড়ো আকারের বিদ্রোহ হয় ইতিহাসে যা 'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ইংরেজ শাসকরা শাসনকাজ পরিচালনা করার জন্য একসময় বাংলা ও ভারতবর্ষ থেকে সৈনিক নিয়োগ দিতে শুরু করেন। সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে দেশীয় এই সৈন্যরাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে মাতৃভূমি থেকে হটিয়ে দেশীয় শাসকবর্গের হাতে রাজক্ষমতা তুলে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশীয় সিপাহি এবং ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে অনেকগুলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই সময়। উভয় পক্ষেরই রক্তক্ষয় হয়। সিপাহিরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। বিদ্রোহের দায়ে অসংখ্য সিপাহিকে ইংরেজ সরকার ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করে। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষের মধ্য থেকে স্বাধীনতার চেতনা কিছুতেই তারা দমাতে পারেনি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

সিপাহি বিদ্রোহের কাল্পনিক ছবি

বাংলার রেনেসাঁ এবং 'ইয়ং বেঙ্গাল' আন্দোলন

উনিশ শতকে বাংলায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এ পরিবর্তনকে বঙ্গীয় রেনেসাঁ হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। প্রথমত, কতিপয় ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও মিশনারি এবং স্থানীয় বিদ্বজ্জনদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে এ পরিবর্তন দেখা দেয়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, ১৮৩০ সালের আগে এখানে পাঠ্যপুস্তক রচনাসহ ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি ও ছোটো-বড়ো কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠা তার একটি বড় নিদর্শন। এটি ছিল তখন সমগ্র এশিয়ায় ইউরোপীয় আদলে উচ্চশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান। এ সময়ে বাংলা ও ইংরেজিতে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা এবং বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। ক্রমশ বিদ্বজ্জনেরা আধুনিক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে নিজেদের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার এবং ইউরোপীয় ঘটনাবলি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকেও মনোযোগ দেন। এভাবে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনেও সচেতনতা বেড়ে চলে।

'ইয়ং বেঙ্গাল' হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সমসাময়িক সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত একটি অভিধা বিশেষ। তাঁরা সবাই হিন্দু কলেজের মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর অনুসারী ছিলেন। ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের জীবন ও সমাজ-প্রক্রিয়ার প্রতি যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শিখিয়েছিলেন কী করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়। ছাত্রদেরকে জ্ঞানানুরাগী হতে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এবং যে কোনো অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করতে দীক্ষা দিয়েছিলেন ডিরোজিও। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ছিল ইতিহাস আর দর্শন। তাঁর উপদেশ ছিল 'সত্যের জন্য বাঁচা, সত্যের জন্য মরা'।

ডিরোজিওর প্রিয় ছিলেন হিন্দু কলেজের একদল বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র। তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সবাই ছিলেন মুক্তচিন্তা দ্বারা উজ্জীবিত। হিন্দু সমাজের বিদ্যমান সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো তাঁদেরকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাংলার প্রচলিত ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা লক্ষ করা যায়। ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের প্রভাবে বাংলার শিক্ষিত সমাজে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আব্দুল লতিফ, বেগম রোকেয়া প্রমুখ ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন এক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। এর ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে নতুন এক জাগরণ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে আলাপ করে মানুষের অধিকার আদায়ের উদ্যোগ গৃহীত হয়। সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মতো অন্ধকার প্রথাগুলো সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা হয়। শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারমূলক এসব কাজে ইংরেজ গর্ভনরদের সম্মতি এবং সহায়তাও এই সময় পরিলক্ষিত হয়। নারীদের অন্তপুরে আবদ্ধ না রেখে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য বেগম রোকেয়া এগিয়ে আসেন। তিনি নিজ উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখে সমাজের সবাইকে নারীশিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেন। চিন্তায় ও মননে বাংলার তরুণদের সংস্কারমুক্ত করতে দেশীয় মনীষীদের পাশাপাশি ডিরোজিও নামে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

ইংরেজ শাসনের অবসান পর্ব

শিক্ষা-সংস্কৃতির পাশাপাশি রাজনৈতিক দাবি আদায়েরও ভাষা তৈরি হচ্ছিল মানুষের মধ্যে। ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নামে দুটি রাজনৈতিক দল কাজ করছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারকে উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন। বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনের সংগঠকদের মধ্যে ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ ঘোষ, প্রফুল্ল চাকি, মাস্টার দা সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ ইংরেজ অফিসার হত্যা, পরিকল্পিত আক্রমণ ছিল বিপ্লবী যোদ্ধাদের আন্দোলন পরিচালনার বিশেষ নীতি। সশস্ত্র এই আন্দোলনে অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন, কারারুদ্ধও হন। কিন্তু আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হননি। এসব আন্দোলন-সংগ্রামের ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামের নতুন দুটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথে

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলার পূর্ব অংশকে জুড়ে দেওয়া যে একটি ঐতিহাসিক ভুল ছিল তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৭ সালেই যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুভাষী শাসকেরা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পূর্ব বাংলার শিক্ষার্থী ও বিদ্বজ্জনেরা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পত্র-পত্রিকায় লেখা ছাপা হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। এমাসেরই শেষ দিকে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ।' পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদ সদস্যদের উর্দু কিংবা ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তার প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও পরিষদের ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব জানান। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় দিন। গণপরিষদের ভাষা তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া এবং মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলার বদলে উর্দু ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ ঢাকা শহরে ধর্মঘট, মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষও তখন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী-জনতার সঙ্গে একাত্ম ঘোষণা করে রাস্তায় নেমে আসে। আন্দোলন দুর্বার রূপ লাভ করলে পাকিস্তানী সরকার বিপ্লবী নেতাদের উপর পুলিশি হামলা এবং গ্রেপ্তার তৎপরতা চালায়। এদিন 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান নিয়ে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-মিছিল করতে গিয়ে যারা গ্রেপ্তার হন তাঁদের মধ্যে শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং তার সমাপ্তি হয় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে। বাংলার মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের এই লড়াইয়ে যে অনিবার্য নামটি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ববঙ্গের মানুষ তাদের প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং ব্যাপকভাবে শোষিত ও নিগৃহীত হচ্ছিল। শেখ মুজিব বাংলার মানুষকে নতুন এই শোষণকাঠামো থেকে বের করে নিয়ে এসে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করেন। শেখ মুজিবের এই আন্দোলন পূর্ববাংলার তরুণ প্রজন্ম, শিক্ষার্থী-জনতা এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নতুন এক জাগরণের সৃষ্টি করে। বাংলার মানুষ দীর্ঘকাল ধরে যে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার আদায়ের স্বপ্ন দেখে আসছিল শেখ মুজিব সেই আশাকেই বাস্তবায়িত করার জন্য পাকিস্তানী শাসকদের সঙ্গে নিজের জীবন বাজি রেখে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব পূর্ব বাংলার মানুষের 'মুক্তির সনদ' হিসেবে খ্যাত ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয়দফা দাবির মাধ্যমে শেখ মুজিব কার্যত পূর্ব বাংলার মানুষের স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরেন। এই কর্মসূচি পূর্ব বাংলার গণমানুষের মধ্যে ব্যাপক আশার সঞ্চার করে এবং ছয় দফার দাবি যেন পাকিস্তান সরকার মেনে নেয় সেই লক্ষ্যে দেশজুড়ে গণ-আন্দোলন শুরু করে। বাংলার মানুষকে স্বাধীনতার

দাবি থেকে বিচ্যুত করার জন্য গণ-নেতা মুজিবকে বারবার কারারুদ্ধ করা হলেও আন্দোলন সংগ্রাম থেকে পিছু হটাতে পারেনি। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। আসাদ শহিদ হন। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পথে এগিয়ে যায়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের একমাত্র মুখপাত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয় লাভ করে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে বিশাল এক জনসমাবেশে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। পূর্ব বাংলার মানুষকে তিনি গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলেন। তিনি প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে... মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...

৭ই মার্চে ভাষণরত বঙ্গবন্ধু

বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে কিছুতেই দমন করতে না পেরে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামে একটি নৃশংস হত্যাযজ্ঞে নামে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সাঁজোয়া যান প্রস্তুত থাকে; যাদের গন্তব্য ছিল রাজারবাগ, ধানমন্ডি , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পিলখানা। রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ফার্মগেটের সামনে সজ্জিত সেনাবাহিনীর কনভয়, ব্যারিকেডের বা বাধার মুখে পড়ে, আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ছাত্র-জনতার একটি অংশ এই প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং জয় বাংলা স্লোগানে ফার্মগেট এলাকা মুখরিত করে তোলেন। পাকিস্তানি ঘাতকেরা ফার্মগেটের প্রতিরোধের মুখে পড়ে আরও সতর্ক হয় এবং ব্যারিকেড ভেঙে বাংলামোটর হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে ঘুমন্ত মানুষের উপর গুলিবর্ষণ করে ও গণহত্যা শুরু করে। সেই রাতেই শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহের অভিযোগ এনে বিচারের জন্য শেখ মুজিবকে সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে গ্রেপ্তার হবার আগেই ২৬শে মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তা প্রচারের জন্য ইপিআর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে চট্টগ্রামে এক ওয়্যারলেস বার্তা পাঠান। ঘোষণায় তিনি বলেন–

> ‘এইটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ হতে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আমার আহ্বান, আপনারা যে যেখানেই থাকুন এবং যার যা কিছু আছে তা দিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করুন। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটি বিতাড়িত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের এ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই নির্দেশনা অনুসরণ করেই বাংলার আপামর মানুষ স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ ৯মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে।

ইংরেজরা ১৯৪৭ সালে যখন ভারত ভাগ করে ফেরত চলে যায়, তখন এখানকার রাজনীতিবিদগণ বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে অনুসরণ না করে কেবল ধর্মের ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণের উদ্যোগ নেন। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিবিহীনভাবে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের নাম করা হয় পূর্ব পাকিস্তান। বাংলা ভূখণ্ডের আদি নাম ‘বঙ্গ’ হারিয়ে যায় কতিপয় সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদের অপরাজনীতির অন্ধকারে। অথচ ‘বঙ্গ’ নামটির হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ নাম পরিচয় গড়ে উঠেছে। অবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম ‘বাংলাদেশ’-এর অভ্যুদয় ঘটেছে।

দলগত কাজ ১

আমরা ৫ থেকে ৬ জনের দল গঠন করি। আমরা দলগতভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি অনুসন্ধানী কাজ করব। প্রতি দল বাংলা অঞ্চলের যেকোনো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বেছে নিই। পাঠ্যপুস্তক ও বিভিন্ন উৎসের সহায়তায় ঐ ঘটনা-সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে দলে আলোচনা করি। যেমন: আমরা যদি নীলকর বিদ্রোহ নিয়ে দলে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই। তাহলে নীলকর বিদ্রোহ হওয়ার কারণ, প্রেক্ষাপট, এ সম্পর্কে বিভিন্ন ইতিহাসবিদের মতামত ইত্যাদি তথ্য নিয়ে আমরা একটি পোস্টার/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করব।

দলগত কাজ ২

এখন আমরা দলগতভাবে আমাদের এলাকার ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা খুঁজব। এজন্য আমরা একই এলাকার ৫ থেকে ৬ জন মিলে একটি দল গঠন করি। এবারও আমরা দলগতভাবে আমাদের এলাকার ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা খুঁজব। এজন্য আমরা একই এলাকার ৫ থেকে ৬ জন মিলে একটি দল গঠন করি। এবারও আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুসন্ধানী কাজ করব। আমরা দলে বসে লোকমুখে শোনা আমাদের এলাকার কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা বই/পত্রিকা/টিভির কোনো ডকুমেন্টারিতে দেখা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বাছাই করি। এরপর এই ঘটনা-সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করি। তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্যদাতা হিসেবে আমরা এলাকার বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার নেব। সেই সঙ্গে বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ, পুরোনো পত্রিকা বা ম্যাগাজিন, কোনো ব্যক্তির লেখা জীবনী, বই, প্রবন্ধ ইত্যাদি উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করব। এরপর তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নিয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। আমরা 'ইতিহাসের দলিল' নামক একটি সাময়িকী তৈরি করে সেখানে আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করব। আমরা ছোটো প্রতিবেদন/গল্প/কবিতা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে এই সাময়িকীতে আমাদের অনুসন্ধান পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করব।

ব্যক্তিজীবনে সামাজিক কাঠামো

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা প্রথমে ২টি কেস স্টাডি পাঠ করব। আমরা কেস স্টাডিতে প্রদত্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির কাজ বা সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করব। এরকম পরিস্থিতিতে নিজেকে কল্পনা করব এবং সেই পরিস্থিতিতে আমাদের সিদ্ধান্ত কেমন হতো তা নির্ণয় করব। আমরা বিভিন্ন উৎসের সহায়তায় স্থানীয় প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সামজিক বিষয় বিশ্লেষণ করব। সামাজিক বিষয়গুলো সামাজিক কাঠামোকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা নির্ণয় করব। আমরা যেকোনো প্রেক্ষাপটকে ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করার কৌশলগুলো নির্ধারণ করব। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নির্ধারণ করে সেগুলো সামাজিক কাঠামোর উপর কীভাবে প্রভাব ফেলছে তা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে 'দেয়ালিকা' তৈরি করব।

কেস স্টাডি ১

লাবন্য চৌধুরী একজন ফটোগ্রাফার। তাঁর ছবিতে ফুটে ওঠে বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখের জীবনের গল্প। একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে তার ছবি নির্বাচিত হয়েছে। তিনি ভীষণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সেই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করলেন। প্রথম দিন প্রদর্শনীতে বিভিন্ন দেশের ছবি দেখে তিনি বুঝলেন সবাই তার নিজের দেশের ভালো দিকগুলো তুলে ধরেছে। শুধু তিনি বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্র্য, দুঃখ, হতাশাকে তুলে ধরেছেন।

তাঁর উপলব্ধি হলো– বহির্বিশ্বের মানুষের কাছে নিজ দেশের খারাপ চিত্র দেখানো ঠিক হচ্ছে না। তাই সে প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের কাছ একটি চিঠি লিখে আবেদন করলেন ছবিগুলো তুলে নেওয়ার জন্য। কর্তৃপক্ষ চিঠি পেয়ে তাঁকে জানল তাঁর একটি ছবি ইতোমধ্যে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি বেশ ভালো অঙ্কের সম্মানী পাবেন। কিন্তু তিনি যদি ছবিগুলো প্রদর্শনী থেকে তুলে নেন, এই পুরস্কার ও সম্মানী পাবেন না।

কেস স্টাডি ২

ফজলুর রহমান পেশায় একজন চিকিৎসক। বাসায় বৃদ্ধ মায়ের অবস্থা খুব ভালো নয়। মা আজকে ভীষণ অনুরোধ করেছেন তাঁর পাশে কিছুক্ষণ থাকতে। মায়ের কাছে বেশ কিছুক্ষণ বসে ছিলেন। এরপর হাসপাতালের জন্য যখন রওনা দেবেন, তখন খেয়াল করলেন মায়ের সারা শরীর কাঁপছে। হঠাৎ জ্বর বেড়ে গেছে এবং প্রেশার কমে গেছে। এমন অবস্থায় মাকে দেখার মতো কেউ নেই।

হাসপাতাল থেকে বারবার ফোন আসছে তাই তিনি বাধ্য হয়ে ফোন ধরলেন। ফোনের ওপাশ থেকে জানানো হলো– একজন ইমার্জেন্সি রোগী আসছে। তার জরুরিভিত্তিতে অপারেশন লাগবে। ফজলুর রহমান একটু রেগে গিয়েই বললেন, আমি না থাকলে কি হাসপাতাল চলবে না। তখন তাঁকে জানানো হল, হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে শুধু তিনিই আছেন যিনি এই অপারেশন করতে পারবেন।

লাবন্য চিন্তা করে দেখলেন, এই টাকাটাও ভীষণ প্রয়োজন। তাঁর একটি সংগঠন আছে যারা দরিদ্র মেধাবীদের পড়াশোনার খরচের ব্যবস্থা করে। গত কয়েক মাসে তাদের সংগঠন প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি। - লাবন্য চৌধুরী সিদ্ধান্ত নিলেন পুরস্কার ও সম্মানীটা নিয়ে নেবেন।	তিনি মায়ের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন। আজকে যা হবার হোক, মাকে একা ফেলে তিনি কোথাও যাবেন না।

দলগত কাজ ১

আমরা আগের মতো দলে বসে যাই। এরপর দলে বসে আলোচনা করি– লাবন্য চৌধুরী ও ফজলুর রহমা-নের এই সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে? তাঁরা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যথাযথ যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন?

এরপর আমরা একটু নিজেদের তাঁদের অবস্থানে চিন্তা করে ভাবি। আমরা ওনাদের অবস্থানে থাকলে কি ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহ হয়ে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম?

আমরা অনেক সময় এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যখন নির্মোহ ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি এটা চর্চা করি, তাহলে যেকোনো পরিস্থিতিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারব। কারণ, নির্মোহ ও ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নিলে সেটি ভুল সিদ্ধান্ত হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। মানুষ সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার অধিকারী হয়।

চলো, এখন তাহলে সমাজের কিছু বিষয় যেমন সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক গতিশীলতা নিয়ে জানি।

অসমতার বিভিন্ন ধরন

সব সমাজই কমবেশি স্তরায়িত। মানবসমাজ বিকাশের প্রাথমিক বা আদিস্তরগুলোতে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নিচ ভেদাভেদ তেমনটি দেখা না গেলেও সমাজ বিকাশের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে এই ভেদাভেদ ক্রমে প্রকট হতে থাকে। সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত মানবসমাজে চার ধরনের স্তরবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো হলো– দাসপ্রথা (Slavery), এস্টেট (Estate), জাতি-বর্ণ (Caste) ও শ্রেণি (Class)। এর মধ্যে প্রথম দুটি ধরন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, জাতি-বর্ণ প্রথার প্রভাব কমছে আর শ্রেণিভিত্তিক স্তরবিন্যাস সমাসাময়িক সমাজে বলবৎ রয়েছে। চলো এখন স্তরবিন্যাসের ধরনগুলো সম্পর্কে জেনে নিই। এর মাধ্যমে আমরা পূর্বের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল জানতে পারব, সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাব এবং সেই সঙ্গে বর্তমান সমাজকাঠামো বুঝতে পারব।

দাসপ্রথা

দাসপ্রথা কৃষি ও সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য সমাজে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এ প্রথা সমাজকে প্রধানত দাস মালিক এবং দাস এ দুটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। দাস হচ্ছে এমন একজন মানুষ যাকে আইন এবং প্রথা অনুসারে অন্যের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। দাসের কোনো অধিকার ছিল না, সে সম্পূর্ণভাবে অন্যের অধীন। দাসপ্রথা সামাজিক অসমতার একটি চরম রূপ। এক্ষেত্রে সমাজের একটা অংশ সম্পূর্ণরূপে কিংবা অনেকাংশে অধিকার বঞ্চিত থাকে। দাসপ্রথার অস্তিত্ব বিক্ষিপ্তভাবে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নানারূপে প্রচলিত ছিল। তবে দাসপ্রথার দুটি চরম দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রাচীন গ্রিক-রোমান সভ্যতায় এবং অন্যটি ১৮ ও ১৯ শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলোতে। দাসপ্রথার চরম অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অনেক সমাজ বিশ্লেষক দাসপ্রথাকে একটি ‘শ্রমশিল্প ব্যবস্থা’ হিসেবে বিবেচনা করেন, যেখানে ক্রীতদাসরা যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়।

এস্টেট

মধ্যযুগে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রথমে ‘এস্টেট’ বলতে জমিদারি বোঝাত, অর্থাৎ একজন জমিদার বা মালিকের অধীনস্থ জমি। পরে রাশিয়াসহ পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্তব্যবস্থার অধীনে এস্টেট শব্দটি একধরনের সামাজিক স্তর বোঝাতে ব্যবহৃত হতো।

মধ্যযুগে ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে বলা হতো প্রথম এস্টেট, দ্বিতীয় এস্টেট ও তৃতীয় এস্টেট। প্রথম এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল চার্চের নেতা বা যাজকরা। দ্বিতীয় এস্টেট বলা হতো রাজা-রানিসহ অন্যান্য অভিজাতদের। তারা মূলত প্রচুর জমির মালিক ছিলেন যেখানে সাধারণ কৃষকেরা কাজ করতেন এবং সে আয় দিয়ে ‘চাকরবাকর’ পরিবেষ্টিত হয়ে বিলাসী জীবন-যাপন করতেন।

আর তৃতীয় এস্টেট বলে গণ্য করা হতো অধিকাংশ সাধারণ জনগণকে, যারা মূলত চার্চ বা অভিজাতদের ভূমি চাষাবাদ করত। তাদেরকে সার্ফও (Serf) বলা হতো। প্রতিটি এস্টেটের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট ছিল এবং এ স্তর বিভক্তি আইনের দ্বারা স্বীকৃত ছিল। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার মতো জন্মগতভাবে এস্টেটগুলোর সদস্যপদ নির্ধারিত হতো। প্রথম দুটি এস্টেট সমাজের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত আর তৃতীয় এস্টেটভুক্তরা শোষিত ও সুযোগ-সুবিধা থেকে ছিল বঞ্চিত।

জাতি-বর্ণ

সামাজিক স্তরবিন্যাসের আরেকটি ধরন হলো জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা। ভারতীয় হিন্দু সমাজ মর্যাদার ভিত্তিতে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। জন্মসূত্রেই ব্যক্তি জাতি-বর্ণের সদস্যপদ লাভ করে। এক সময় বিভিন্ন বর্ণের মানুষকে সামাজিক মেলামেশায় বেশ কিছু বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হতো। প্রতিটি জাতি-বর্ণের সদস্যকে জন্মসূত্রে নির্ধারিত পেশায় নিয়োজিত থাকতে হতো। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল যাগযজ্ঞ, পূজার্চনা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করা; ক্ষত্রিয়দের কাজ ছিল দেশ শাসন ও দেশ রক্ষা করা; বৈশ্যদের কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য,

কৃষি ও পশুপালন করা এবং শূদ্রদের কাজ ছিল উপরোক্ত তিন দলের সেবা করা। ভৃত্য, কায়িক শ্রমজীবী ও কৃষকরা ছিলেন শূদ্র বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। তার চেয়ে কম মর্যাদার অধিকারী ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়দের চেয়ে নিচু মর্যাদার অধিকারী বৈশ্য এবং বৈশ্যদের নিচে অবস্থান শূদ্র বর্ণের মানুষ। সমাজের সবচেয়ে নিচু প্রায় মর্যাদাহীন অবস্থান ছিল অস্পৃশ্য গোষ্ঠীগুলোর।

তবে নগরায়ণ, শিল্লায়ন, উদারনৈতিক আধুনিক শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি জাতি-বর্ণের ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং যেকোনো জাতি-বর্ণের লোক ক্রমে যেকোনো পেশা গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। মুদ্রাবাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় তথাকথিত নিচু জাতি জমি কিনতে ও জমির মালিক হিসেবে পদমর্যাদা ও ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রসার এবং উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যোগ্যতার ভিত্তিতে সব বর্ণের মানুষই সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে আসীন হচ্ছেন। তবে কোনো কোনো পশ্চাৎপদ সমাজে জাতি-বর্ণের প্রভাব এখনো রয়েছে।

সামাজিক শ্রেণি

সামাজিক শ্রেণি হলো সামাজিক স্তরবিন্যাসের আধুনিক প্রকরণ। আঠারোশতকে শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ক্রমে ভেঙে যেতে থাকে, নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে এবং শহরকেন্দ্রিক মানুষও বাড়তে থাকে। সেইসঙ্গে শহরকে কেন্দ্র করে শ্রেণিব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ফলে আমরা সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি নতুন রূপ দেখতে পাই। একটি শ্রেণিভিত্তিক সমাজে স্তরবিন্যাস কেবল ব্যক্তির জন্ম নয়, তার নিজস্ব অর্জন দিয়েও নির্ধারিত হয়।

শ্রেণিব্যবস্থায় মানুষ মুক্ত, অন্যদিকে পূর্বের তিনটি সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল বদ্ধ। শ্রেণিব্যবস্থায় মানুষ শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের মাধমে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে যেতে পারে। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় সব মানুষের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকে এবং ব্যক্তি তার চেষ্টার মাধ্যমে সমাজের উচ্চ অবস্থান অর্জন করতে পারে। তবে এ-ও মনে রাখতে হবে যে শ্রেণি শুধু ব্যক্তির অর্জন দ্বারা নির্ধারিত নয়, একজন ব্যক্তি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করছে সে পরিবারের সামাজিক অবস্থান অনুসারেও তার শ্রেণি নির্ধারিত হয়।

সামাজিক অসমতা

সমাজে সব মানুষ যে সমান সুবিধা বা মর্যাদা পায় না তা তোমরা জেনেছ। মানুষের নানা স্তরের কথাও জেনেছ। দেখা যাচ্ছে, সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে সামাজিক অসমতা ঘটে। যেখানেই সামাজিক স্তরবিন্যাস রয়েছে সেখানেই সামাজিক অসমতা আছে। যদিও মানুষ এমন একটি সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে, যেখানে তাদের ভেতর অসাম্য থাকবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো যে, বিদ্যমান মানব সমাজে কোনো না কোনো ধরনের স্তরবিন্যাস ও অসমতা লক্ষ করা যায়। মানুষে মানুষে সম্পদ ও আয়ের অসাম্যকে আমরা সামাজিক অসমতা বলি। সম্পদ ও আয়ের অসাম্যের কারণে একদল মানুষ উচ্চ মর্যাদা লাভ করে, আরেকদল নিম্ন মর্যাদার অধিকারী হয়।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার সমাজে অসমতার তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। যথা: সম্পদের অসমতা, মর্যাদার অসমতা এবং ক্ষমতার অসমতা। প্রথম কারণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সম্পত্তি অথবা উপার্জন। দ্বিতীয়টির

সঙ্গে জীবনযাত্রার মান জড়িত, যার ভিত্তিতে মর্যাদাবান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। আর তৃতীয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে রাজনীতি; যার ফলে গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক দল। এভাবেই তাঁর ধারণায় শ্রেণি, মর্যাদা এবং রাজনৈতিক দল সামাজিক স্তরবিন্যাস ও অসমতার তিনটি প্রধান উপাদান হিসেবে বর্তমান সমাজে বিদ্যমান।

তবে আধুনিক কালের এই স্তরগুলো স্থায়ী বা অনড় নয়। এতে পরিবর্তন ঘটে। ব্যক্তি নিজের যোগ্যতায়, পরিশ্রমে এবং বুদ্ধির প্রয়োগে নিজের অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন। আবার এসবের অভাবে একজনের অবস্থার অবনমনও হতে পারে। একেই বলে সামাজিক গতিশীলতা।

এখন আমরা সামাজিক গতিশীলতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানব

সমাজ প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। সামাজিক গতিশীলতার জন্যই মানুষ এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যেতে পারে। তার ফলে ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থান ও মর্যাদাও পাল্টে যায়। সামাজিক গতিশীলতার ধারণা অনুসারে কখনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় আবার কখনো কমে যায়। সামাজিক গতিশীলতা সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সামাজিক গতিশীলতা: বিদ্যমান সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে একজন ব্যক্তির এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থানে যেতে পারার সক্ষমতাকে সামাজিক গতিশীলতা বলে। অর্থাৎ ব্যক্তির সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক গতিশীলতা।

সামাজিক গতিশীলতার প্রভাবকসমূহ

সামাজিক গতিশীলতা নির্ভর করে সামাজিক ব্যবস্থা কতটুকু বদ্ধ বা মুক্ত তার ওপর। আমরা জেনেছি যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে সামাজিক ব্যবস্থা ছিল কঠোর নিয়মে বাঁধা। বিশেষ করে যাদের অবস্থান ছিল সমাজের নিচু স্তরে, তারা ছিল পরাধীন। সমাজ যতই অগ্রসর হয়েছে মানুষের স্বাধীনতা ততই বেড়েছে। পূর্বের যেকোনো সমাজব্যবস্থার তুলনায় বর্তমান বিশ্বে মানুষ অধিক স্বাধীনতা ভোগ করছে। তবে সব দেশে বা সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সচলতা একই রকম নয়।

কোনো দেশে আমরা দেখতে পাই সমাজ ব্যক্তির অবস্থান পরিবর্তনের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। অনেক দেশে আমরা দেখতে পাই, ব্যক্তি তার মর্যাদা ও অবস্থানের উন্নতির জন্য অনেক ধরনের স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। সেখানকার সরকার সকল ধরনের কাঠামোগত বাধা যথাসম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা করে। এতে করে মানুষ আশা করতে পারে যে সমাজে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

সামাজিক গতিশীলতা অর্জন করার পেছনে কতকগুলো প্রভাবক রয়েছে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে অন্যতম। সামাজিক গতিশীলতা অর্জনের জন্য সবার আগে দরকার নিজের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য একজন ব্যক্তির প্রবল ইচ্ছা। এই ইচ্ছাশক্তিই তাকে সমাজের উচ্চ অবস্থানে যাওয়ার জন্য প্রেরণা দেবে এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে। শিক্ষা হলো সামাজিক গতিশীলতার আরেকটি প্রভাবক। আমাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আর শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে না, সমাজে সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমও।

দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা হলো ইতিবাচক প্রভাবক। অন্যদিকে কাঠামোগত কিছু উপাদান সামাজিক গতিশীলতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। যদি সমাজের মধ্যে বৈষম্য বজায় থাকে তবে তা ব্যক্তির সামাজিক গতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। এজন্য ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষনির্বিশেষে সবার জন্য সমান সুযোগ ও সম্ভাবনা নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হয়। এবং তা করার জন্য রাষ্ট্র আইন তৈরিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। আবার রাষ্ট্র যাতে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার জন্য চাপ তৈরি করতে হয়। এটি করে থাকে রাজনৈতিক দল ও নাগরিক গোষ্ঠীগুলো।

সামাজিক গতিশীলতায় আন্তর্জাতিক সনদসমূহের অবদান

গোড়াতে মনে রাখা ভালো যে আধুনিককালে এই অধিকারের দাবি প্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে। বিপ্লবীরা যেমন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তেমনি তারা নাগরিক অধিকারের তালিকাও ঘোষণা করেছিলেন। এ থেকে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস পেইন (Thomas Paine) মানবাধিকার শব্দ ও ধারণাটি প্রচার করেছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতার পরে ১৭৯১ সালে তাদের সংবিধানে ‘বিল অব রাইটস’ বা অধিকারের বিল গৃহীত হয়। এটা ব্যক্তির নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। যেমন কথা বলার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত হয়েছে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (Universal Delecaration of Human Rights)। এটি মাবজাতির এক মর্যাদাপূর্ণ সম্পদ। এতে মানুষের স্বাধীনতার ব্যাপ্তি ও অধিকারের গভীরতা সুচিন্তিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রতিটি মানুষ যেন তার স্বধীনতা, বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারে এবং তার সকল নাগরিক ও মানবিক অধিকার অবাধে ভোগ করতে পারে, এতে সে কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ঘোষণার প্রথম ধারায় বলা হয়েছে, সব মানব শিশু জন্মায় স্বাধীনভাবে এবং সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। সকল মানুষেরই রয়েছে যুক্তিবোধ ও বিবেচনাশক্তি এবং তাদের উচিত পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে জীবনযাপন। এই ঘোষণায় রয়েছে ৩০টি অনুচ্ছেদ এবং এ থেকে ৬৩টি অধিকারের ধারণা পাওয়া যায়।

শিশু অধিকার সনদ

আমরা অধিকার নিয়ে যত কথাই বলি না কেন, নানা বাস্তব কারণে অহরহ মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে, সংস্কৃতিতে-সংস্কৃতিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে বৈষম্য-বঞ্চনা-শোষণ-নির্যাতন রয়েছে, তার মধ্যে শিশুদের অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। কারণ, শিশুরা না শারীরিক না মানসিক কোনোভাবেই পরিণত নয়। নানাভাবে অপরের ওপর তাদের নির্ভরশীলতা থাকে বলে তাদের অধিকারের বিষয়ে অন্যের বাড়তি সচেতনতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। যেকোনো ধরনের সংঘাত-দ্বন্দ্বে বা বৈষম্য-বঞ্চনা ও শোষণ-নির্যাতনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা, তাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়। তবে আশার কথা, মানুষ এ বিষয়ে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠেছে। কালক্রমে শিশু অধিকারে বিষয়টি পৃথিবীজুড়ে একটি অভিন্ন ইস্যু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিশু অধিকারের ইস্যুটি জাতিসংঘের মাধ্যমে একটি সনদে রূপান্তরিত হয়।

শিশু অধিকার সনদটি কবে গৃহীত হয়

শিশু অধিকার সনদ বেশি দিনের পুরোনো বিষয় নয়। এই সেদিন ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এটি গৃহীত হয়। এক বছর পরে ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বরে এটি আন্তর্জাতিক আইনের অংশে পরিণত হয়। ইতিহাসে এটি হচ্ছে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে গৃহীত মানবাধিকার চুক্তি। জাতিসংঘের প্রায় সকল সদস্য দেশ এটি অনুমোদন করেছে। প্রথম যেসব দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুমোদন করে বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি।

শিশু অধিকার সনদের বিষয়বস্তু

এই সনদের ৫৪টি ধারার মাধ্যমে এক কথায় শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সকল প্রকার শোষণ-বৈষম্য, অবহেলা এবং নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষার নির্দেশনা রয়েছে। সনদে স্বীকৃত অধিকারের আওতায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশু ও মা-বাবার সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নাগরিক অধিকার, শোষণ এবং আইনের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়া শিশুর অধিকারসহ অনেক বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ সনদ বাস্তবায়নের দায়িত্ব

শিশুর অধিকার রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত রাষ্ট্র ও সরকারের। পাশাপাশি শিশুদের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত প্রত্যেকের ওপর এ দায়িত্ব বর্তায়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মা-বাবা, দাদা-দাদি, বড়ো ভাই ও বোন, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিশুদের কাজে নিয়োজিত সকল ব্যক্তিবর্গ। বলা যায়, সকল বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকেরই এ ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে।

সিডো (CEDAW)

সিডো শব্দটা আজকাল বেশ শোনা যায়। এটি হলো নারীর অধিকার রক্ষার একটি সনদ। ইংরেজিতে পুরো নামটা Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)। বাংলায় এর মানে দাঁড়ায়– নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ।

দেশে-দেশ, সমাজে-সমাজে, পরিবারে-পরিবারে নারী ও পুরুষের মাঝে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই সিডোর মূল লক্ষ্য। তা ছাড়াও এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা পালন করে আসছে তার যথাযথ স্বীকৃতি দান। এ ছাড়া আরও লক্ষ্য হলো সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন এবং মানুষ হিসেবে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

জাতিসংঘের স্বীকৃতি

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW) ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ১ মার্চ থেকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর তরফ থেকে এই সনদে স্বাক্ষর শুরু হয়। ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর থেকে সিডো কার্যকর হয়। ১৯৯৯ সালর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ১৬৫টি রাষ্ট্র এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে।

অধিকার নিয়ে কিছু কথা

অধিকার বলতে সেইগুলোকে বোঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায়। যেগুলো না থাকলে সে আর মানুষ থাকে না। এগুলোই মানুষকে মানুষ করে তোলে। মানুষ চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং মতামত প্রকাশের যোগ্যতা নিয়েই জন্মায়। কোনো রাষ্ট্র, সরকার বা অন্য কোনো শক্তি তাকে এগুলো দেয় না। তারা বরং সময়-সময় এগুলো হরণ করে নেয়। মানবাধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে।

তাহলে কথা হলো, মানবাধিকার হচ্ছে সেইসব অধিকার, যা নিয়ে মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে এবং যা অর্জিত হলেই সে মানুষ হিসেবে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। একই সঙ্গে বলা যায়, মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পক্ষে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া সম্ভব নয়।

এ অধিকারগুলো তার ন্যায্য পাওনা, কোনো শর্ত সেখানে চলবে না, কমানো-বাড়ানোর অবকাশ নেই। একজন মানুষ যেকোন সমাজে-রাষ্ট্রে-পরিবারে-শ্রেণীতে-লিঙ্গে-সম্প্রদায়ে-ধর্মে-জাতিগোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তিনি কতকগুলো অধিকার নিয়েই জন্মান। তাই মানুষের এই অধিকারগুলোকে সর্বজনীন বলা হয়। এ ব্যাপারে আমরা কয়েকটা বিষয় মনে রাখব–

অধিকার জন্মগত অর্জন

বলতে পারি, একজন মানুষ কিছু অধিকার নিয়েই জন্মায়। তার চিন্তা করার ও তা প্রকাশের অধিকার, যাকে আমরা বাক্ স্বাধীনতাও বলে থাকি, তা মানুষের জন্মগত অধিকার। আবার রাষ্ট্রের কাছ থেকে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ও কাপড় পাওয়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

অধিকার শর্তহীন

শর্ত দিলেই আর সম্পূর্ণ অধিকার পাওয়া যাবে না। অনেক সময় রাষ্ট্র বা সরকার বলে থাকে, 'তুমি কথা বলতে পারো, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বলা যাবে না।' অর্থাৎ সব কথা বলা যাবে না। তাতে নাগরিকের স্বাধীনতা খর্ব হলো, অধিকার ক্ষুণ্ন হল।

অধিকার ও দায়িত্ব

তবে অধিকারের সঙ্গে দায়িত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অর্থাৎ নাগরিক যেমন অধিকার ভোগ করবে তেমনি তাঁকে কিছু দায়িত্বও পালন করতে হবে। কেননা, সমাজ বহুপথ ও পথের মানুষকে নিয়েই গঠিত হয়। বলা যায় সমাজে আমরা অনেকে মিলে বসবাস করি। ফলে এমন কথা এমনভাবে বলা যাবে না যাতে অন্যের মনে আঘাত লাগে বা তার স্বাভাবিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটে।

অধিকার ভাগ করা যায় না

'বিদ্রোহী' কবিতা লেখার সময় কেউ যদি এসে বলত– কবি নজরুল আপনি এটা অর্ধেক লিখতে পারবেন, পুরো লেখার অধিকার আপনাকে দেওয়া যাবে না। ব্যাপারটা হাস্যকর হতো না!

একটা কলা তুমি বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে খেতে পারো, কিন্তু কলাটা ভাগ করেই খেতে হবে, এভাবে কেউ তোমাকে বাধ্য করতে পারে না। সেটা তোমার বিবেচনা আর বন্ধুত্বের সঙ্গেই সম্পর্কিত বিষয়।

অধিকার আসলে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা

কথা বলার, চলাচলের, মতপ্রকাশের যে অধিকার, সেগুলো তোমাকে স্বাধীনতা দেয়। ভাবনাচিন্তা আর বিচার-বিবেচনা করে তুমি যে কথাটা বলতে চাও, সেটা বলার স্বাধীনতা তুমি ভোগ করো। এই স্বাধীনতা তোমার ক্ষমতাও বাড়ায়।

অধিকার নিরাপত্তার অবলম্বন

সেই ব্যক্তিই স্বাধীন মানুষ, যার মনে ভয় থাকে না, যার জীবন ভয়ে-ডরে কাটে না। যার জীবনটা সব দিক মিলিয়ে নিশ্চিত ও নিরাপদ হয়ে ওঠে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ স্বাধীন। একালে দেশে দেশে মৌলিক চাহিদা হিসেবে নাগরিকেরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাঁচটি অধিকার ভোগ করে, যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা। এগুলো– একজন মানুষের মৌলিক চাহিদা। এ-ও এক ধরনের অধিকার, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নাগরিকদের জন্য এগুলো নিশ্চিত করা।

দেশের সব নাগরিকের জন্য এই অধিকারগুলো নিশ্চিত করা খুব সহজ কাজও নয়। সুস্থ সবল মানুষকে তো বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো যাবে না। তার তো খাবার কেনার সামর্থ্য থাকতে হবে। সে খাবারেও কেবল পেট ভরলে হবে না, মোটামুটি ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাবার হতে হবে। আবার তা কেনার সামর্থ্য মানে আয় দরকার। মানে বেকার থাকলে চলবে না। তাই মানুষের জন্য কর্মসংস্থান করাও রাষ্ট্রের একটা কাজ। দারিদ্র্য অশিক্ষা, বেকারত্ব মানুষের স্বাধীনতা আর অধিকার ভোগের পথে বড়ো বাধা।

অধিকারের সীমা

অনেক সময় দেখা যায়, অত্যন্ত জোরে মাইক বাজিয়ে দাঁতের মাজন বিক্রি করছেন কেউ। কথা হলো দাঁতের মাজনও বিক্রি করতে হবে আবার মানুষের পড়াশোনা, ঘুমেরও ব্যাঘাত করা যাবে না। গাড়ির হর্নও কোনোমাত্রায় বাজানো যাবে তার নিয়ম থাকে। অনেক দেশেই শব্দের মাত্রার সর্বোচ্চ পরিমাপ করে দেওয়া আছে। ঐ মাপের বেশি হলে তা শব্দদূষণ এবং বে-আইনি। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে দাঁতের মাজন বিক্রেতার মাইক বাজানোর অধিকারের একটা সীমা আছে। গাড়ির হর্নের ক্ষেত্রেও তা সত্য।

অধিকার ততদূরই ভোগ করা যায়, যতদূর তা অন্যের অধিকার লঙ্ঘন না করছে। রাষ্ট্র, সমাজ, সম্প্রদায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছার চেয়েও এখানে বড়ো বিষয় হলো সম-অধিকারের বোধ। অর্থাৎ আমার এবং অন্যের অধিকারের মধ্যে একটা রফা করে চলাই সঠিক কাজ। এ বিবেচনা বোধটা এক অর্থে দায়িত্ববোধ।

দলগত কাজ ২

আমরা আগের দলে বসে যাই। এখন আমরা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কয়েকটি সামাজিক বিষয় (ইস্যু): যেমন: সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস, নারী নির্যাতন, শিশুশ্রম ইত্যাদি নির্ধারণ করি। এই সামাজিক বিষয়গুলো আমাদের সামাজিক কাঠামোকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা নির্ণয় করি। বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা, ম্যাগাজিন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল উপস্থাপন করি।

বিভিন্ন সামাজিক বিষয় সামাজিক কাঠামোকে কীভাবে প্রভাবিত করে

আমরা দলগতভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছি। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব, এই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহ থাকা অনেক প্রয়োজন। তাই এখন আমরা দলে আলোচনা করব অনুসন্ধানের পুরো প্রক্রিয়ায় আমরা কীভাবে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহ ছিলাম।

এরপর যেকোনো প্রেক্ষাপটকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ কীভাবে করা যায় তার কৌশলগুলো দলে আলোচনা করে নির্ণয় করি।

ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও নির্মোহ থাকার কৌশল

দলগত কাজ ৩

এখন আমরা একটি বৈশ্বিক সামাজিক বিষয় (ইস্যু) যেমন: গৃহহীন মানুষ, যুদ্ধ ইত্যাদি নির্ধারণ করি। এই সামাজিক বিষয় সামাজিক কাঠামোয় কীভাবে প্রভাব ফেলছে তা দলে আলোচনা করে লিখি। এজন্য আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নেব। এরপর আমরা সব দল মিলে একটি দেয়ালিকা তৈরি করে আমাদের দলগত কাজকে উপস্থাপন করব। দেয়ালিকায় আমরা বিভিন্ন গল্প, ঘটনা, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে উপস্থাপন করতে পারি।

মিলেমিশে নিরাপদে বসবাস

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ: সম্ভাবনা, ঝুঁকি ও আমাদের করণীয়

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী নানা সম্পদে ভরপুর। আমরা অবিরাম সেসব সম্পদ ব্যবহার করে চলছি। আবার প্রয়োজনে পরিবর্তন ঘটাচ্ছি অনেক কিছুর। পরিবর্তন কখনো আমাদের জন্য ভালো হচ্ছে আবার কখনো বা দেখাচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। আমাদের এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা এবার দেখে নেব প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে। খুঁজে বের করব এসব পরিবর্তনের ফলে যে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে তা কীভাবে টেকসই ব্যবস্থাপনা করা যায়। সেই সঙ্গে যেসব ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে, তা মোকাবিলা করতে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা কেমন হবে তা-ও বুঝে নেব।

- প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্বরূপ চিহ্নিত করার জন্য প্রথমে আমরা নিচের দুটি মানচিত্র খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করব। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নিচের ছকের মাধ্যমে কোন ধরনের ভূমি পরিবর্তিত হয়ে কোন ধরনের ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা চিহ্নিত করব। পাশাপাশি এই ধরনের পরিবর্তন আমাদের জন্য কোন কোন সম্ভাবনা বা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে, সেগুলোও লিখব।

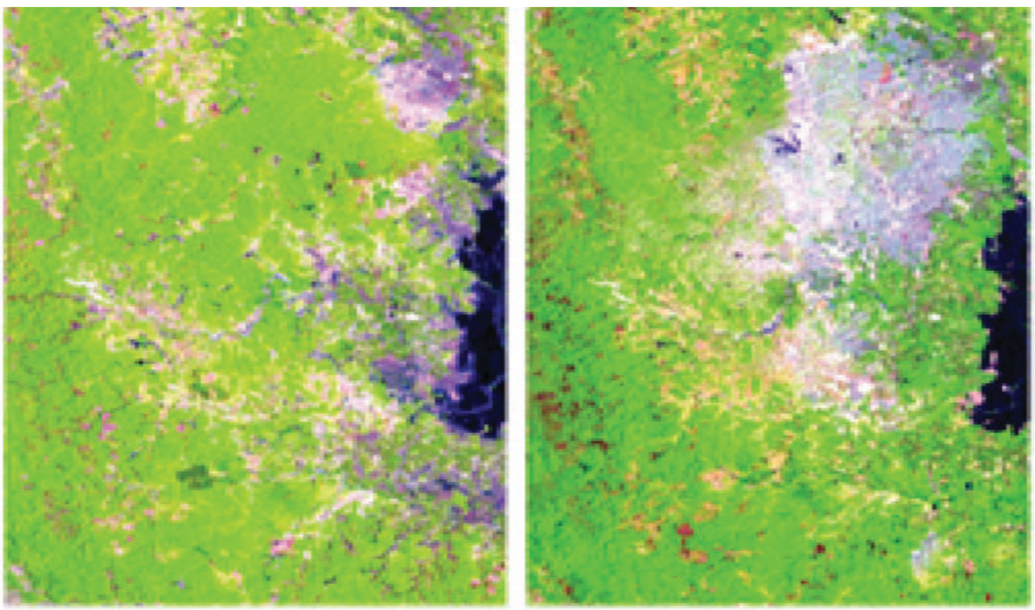

A B

কক্সবাজারের কুতুপালং ও বালুখালীর রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় ২০১৭ (a, বামে) থেকে ২০১৯ (b, ডানে) সালের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের চিত্র যা রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। সবুজ আচ্ছাদন বা বনভূমি ধূসর রঙের মানববসতির মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

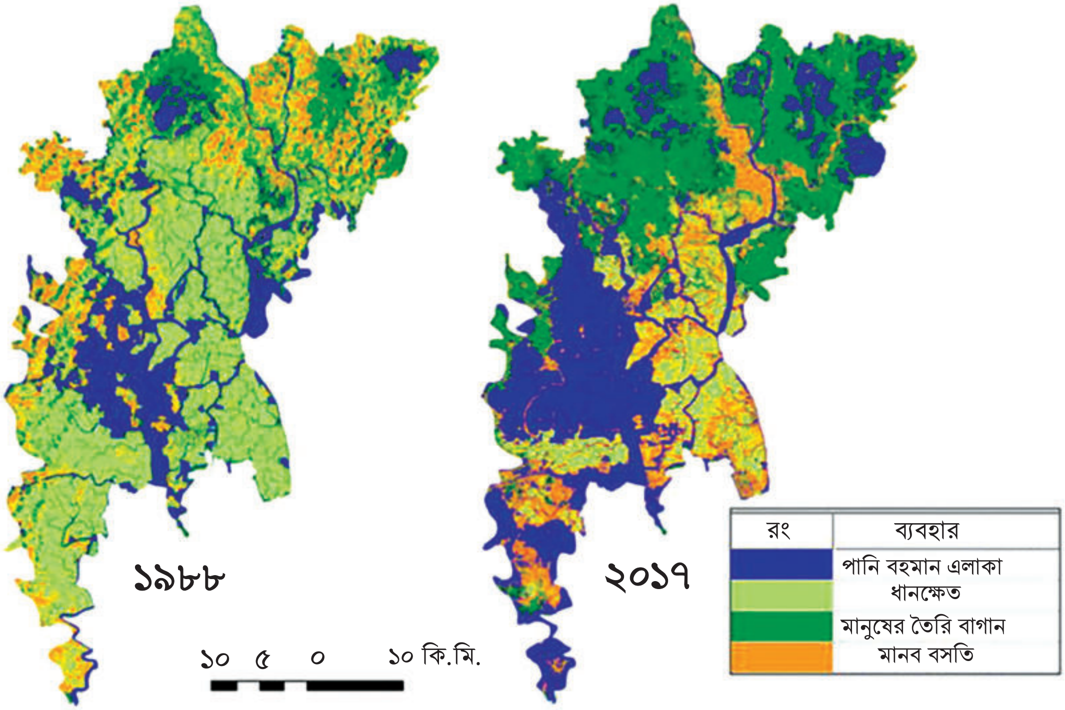

১৯৮৮ (বাঁয়ে) এবং ২০১৭ (ডানে) সালে খুলনা জেলার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের মানচিত্র

ভূমির ধরন (পূর্বের অবস্থা)	পরিবর্তিত রূপ	সৃষ্ট সম্ভাবনা	সৃষ্ট ঝুঁকি

আমার এলাকায় ভূমি ব্যবহারের ধরন অনুসন্ধান

- আমরা মানচিত্রের মাধ্যমে ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন দেখলাম। এখন চলো, আমাদের এলাকায় ভূমির ব্যবহারে কোন কোন পরিবর্তন এসেছে তা অনুসন্ধান করে বের করি। নিচে দেওয়া প্রশ্নমালা ব্যবহার করে আমাদের এলাকার/ বাড়ির প্রবীণ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এই অনুসন্ধান কাজটি করব।

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা

১. এই এলাকায় ২০ বছর আগে যে পরিমাণ কৃষিজমি ছিল এখন কি তার থেকে কমেছে না বেড়েছে?

২. কৃষিজমির এই পরিবর্তনের কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

৩. বিগত ২০ বছরে রাস্তাঘাটের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? হলে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

৪. ২০ বছর আগে আর এখন ঘরবাড়ির পরিমাণ এবং ধরনে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? হলে কী ধরনের?

৫. ২০ বছর আগে যে পরিমাণ বনভূমি ছিল এখন কি তার থেকে বেড়েছে না কমেছে? এই পরিবর্তনের কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

৬. এই এলাকায় আগে যেমন পুকুর, খাল, বিল, নদী ছিল এখনো কি তেমন আছে? যদি না থাকে তবে এর জন্য আপনি কোন কর্মকাণ্ড দায়ী বলে মনে করছেন?

- **অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করব।**

ভূমি ব্যবহারের ধরন	পরিবর্তিত রূপ	কারণ	ফলাফল
কৃষিজমি	বসতবাড়ি	জনসংখ্যা বৃদ্ধি	কৃষিজমির পরিমাণ কমে যাবে, খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে।
রাস্তাঘাট			
বসতি			
বনভূমি			
জলাভূমি			

- এরপর প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপনের জন্য আমরা এলাকার দুটি মানচিত্র তৈরি করব। এরপর একটি মানচিত্রে ২০ বছর আগের ভূমির ব্যবহারের ধরন এবং অন্য মানচিত্রে বর্তমান সময়ের ভূমির ব্যবহারের ধরন বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা রং ব্যবহার করে চিহ্নিত করব (খুলনা জেলার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের মানচিত্রের অনুরূপ হতে পারে যা এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা দেখেছি)। এরপর দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলো এই মানচিত্র দুটি ব্যবহার করে উপস্থাপন করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের রীতি

আমরা নিজ নিজ এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের ধরন অনুসন্ধান করেছি। সেখানে দেখেছি, অনেকগুলো কারণে ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তন হয়েছে এবং তার ফলে এলাকায় যা যা প্রভাব পড়েছে, তা যেমন আমাদের জন্য সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে, তেমনই ঝুঁকিও কম তৈরি করেনি!

ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ইতিহাস মিলিয়ন বছরের যা মানব সভ্যতার শুরুর সময়কালের মতোই প্রাচীন। ভূমির এসব পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনে কীভাবে কাজ করছে, ভূমি পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরন কেমন, পরিবর্তনের কারণ, এসব পরিবর্তন কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে তা জানার পাশাপাশি এ ধরনের পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে এ অংশে আমরা জানার চেষ্টা করব।

- আমাদের এলাকায় ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের ধরন অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমরা দেখেছি কৃষিজমির ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাই বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট খুঁজে বের করার কাজটি করার জন্য আমরা প্রথমে পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে ১৭০০ সাল থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ভূমির ব্যবহারে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কৃষিজমির ব্যবহার কেমন প্রভাব ফেলতে পারে তা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করব। তারপর একটি ছকের সাহায্যে পরিবর্তনের ধরনগুলো চিহ্নিত করব।

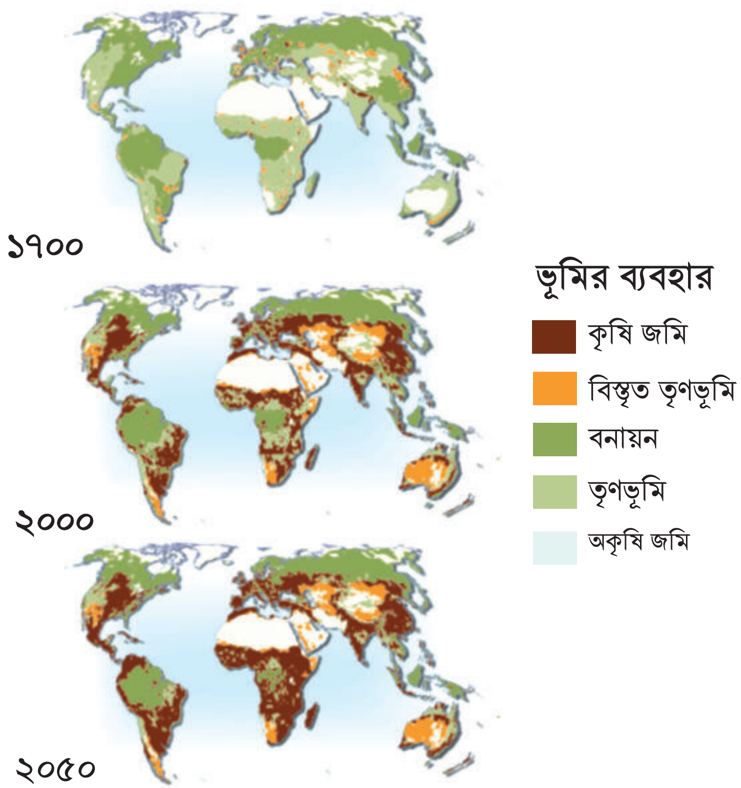

১৭০০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরন	২০০০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরন	২০৫০ সালের মানচিত্রে ভূমি ব্যবহারের ধরন

- উপরের কাজের মাধ্যমে আমরা দেখলাম, কৃষিজমির ব্যবহারে পরিবর্তন বৈশ্বিকভাবে ভূমি আচ্ছাদনের পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু কেবলমাত্র কৃষিজমির ব্যবহারের পরিবর্তনই কি ভূমির আচ্ছাদনের বৈশ্বিকভাবে পরিবর্তনের একমাত্র কারণ? নিশ্চয় না। চলো এখন আমরা অনুসন্ধান করে বের করি ভূমির আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরন; এসব পরিবর্তন হওয়ার কারণ; এর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি ও সম্ভাবনা এবং এসব ক্ষেত্রে আমাদের কী কী করণীয় থাকতে পারে যার ফলে এই পরিবর্তন আমাদের জন্য ঝুঁকির কারণ না হয়ে ওঠে।
- এই অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা এই অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুসন্ধানী অংশ থেকে নেব।
- অনুসন্ধান শেষে প্রাপ্ত ফলাফল আমরা প্রত্যেকে একটি প্রতিবেদন আকারে জমা দেব।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন

বৈশ্বিকভাবে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি জনসংখ্যা সেখানে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কেমন ছিল, সে সময়ে মানুষ কোথায় বাস করত, তাদের জীবিকার উৎস কী ছিল কিংবা তারা কোন প্রক্রিয়ায় নানা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে আজকের পর্যায়ে এসেছে। আমরা এ অংশে সেসবের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন দেশ বা এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে।

- প্রথমে আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন মহাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা দেখব। পরে এই মানচিত্রটি এবং অনুসন্ধানী অংশের সাহায্যে নিচের ছকটি খাতায় তুলে পূরণ করব।

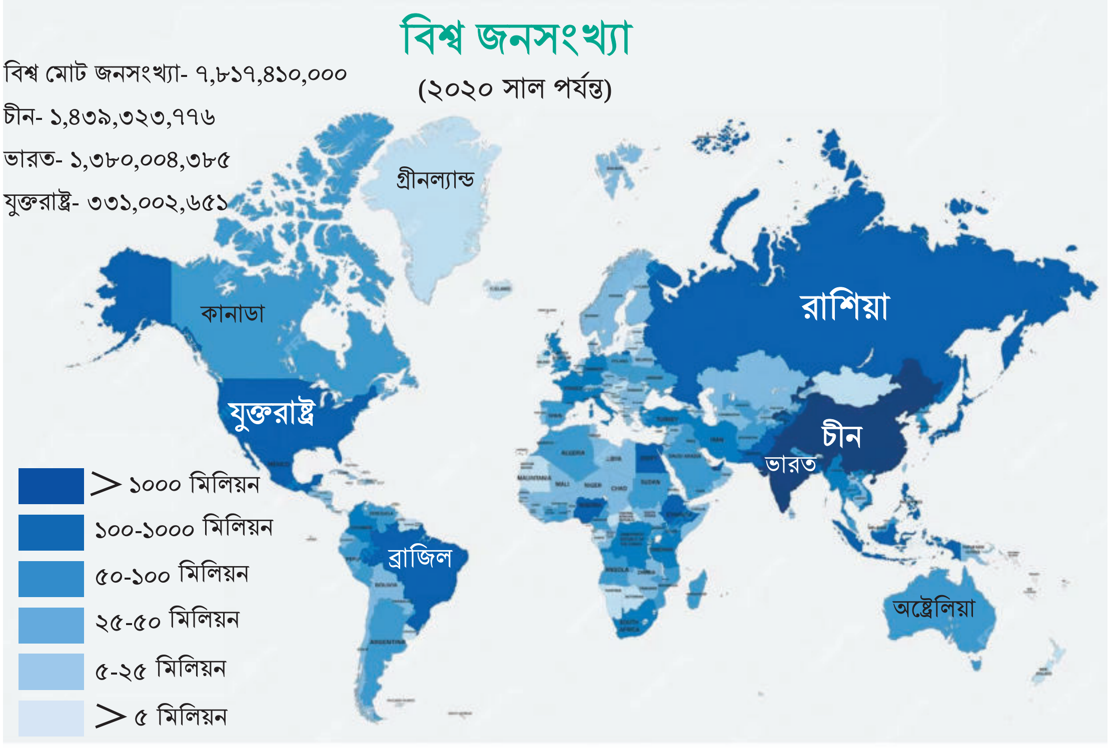

জনসংখ্যার পরিমাণ	দেশের নাম	মহাদেশের নাম	ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের স্বরূপ	ফলাফল	ঐ দেশের প্রেক্ষাপটে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে
>১০০০ মিলিয়ন					
১০০-১০০০ মিলিয়ন					
৫০-১০০ মিলিয়ন					

২৫-৫০ মিলিয়ন					
৫-২৫ মিলিয়ন					
<৫ মিলিয়ন					

- আমরা তো পৃথিবীর জনসংখ্যার অবস্থা দেখলাম, এবার চলো নিজ নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটা মজার কাজ করি। কাজটি করার জন্য আমরা ৬-৮ জনের দলে ভাগ হব। এরপর প্রতিটি দলের সদস্যদের নারী ও পুরুষ ভেদে বয়স অনুযায়ী গ্রাফ কাগজে একটি লেখচিত্র অঙ্কন করে উপস্থাপন করব। আমরা যে লেখচিত্রটি অঙ্কন করব সেটি যখন কোনো দেশ বা অঞ্চলের জন্য করা হয়, তখন তাকে বলে জনসংখ্যা পিরামিড।

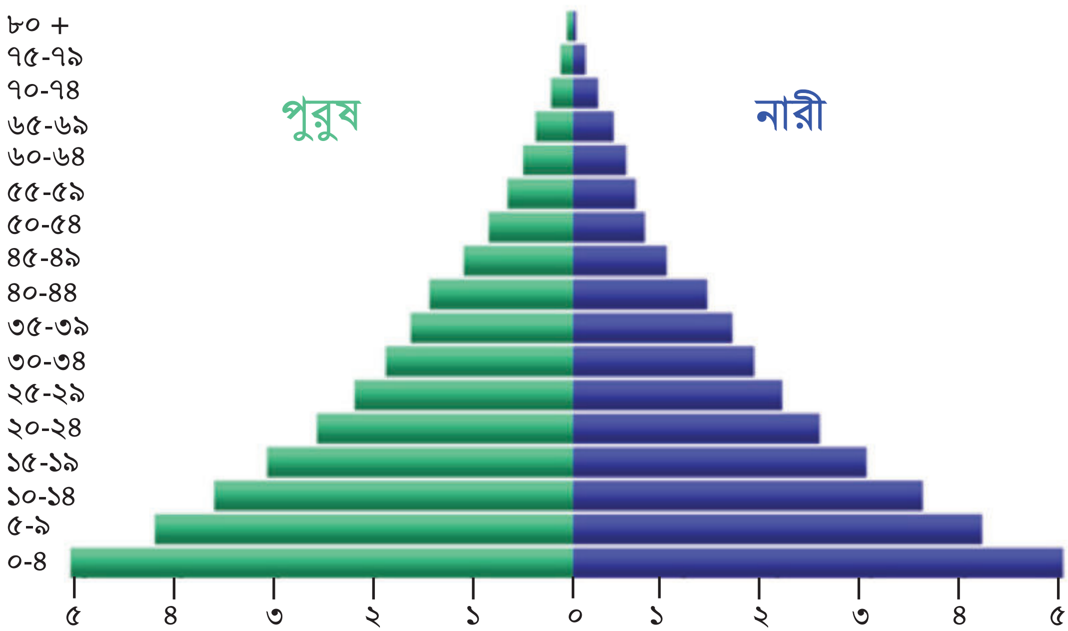

জেনে রাখো

জনসংখ্যা পিরামিড হলো একটি গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনা যার মাধ্যমে একটি দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যার বয়সের বণ্টন প্রদর্শন করা হয়। গ্রাফের কেন্দ্র থেকে বাম দিকে পুরুষ এবং ডান দিকে নারী চিহ্নিত করা হয়। জনসংখ্যার আকার x-অক্ষে দেখানো হয় এবং y-অক্ষে বয়স দেখানো হয়।

- তোমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণ করতে কখনো তথ্য সংবলিত ছবি আবার কখনো স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তোলা ছবি ব্যবহার করি। এই যে কোনো জায়গায় সরাসরি না গিয়ে এ ধরনের তথ্য সংবলিত ছবি বা মানচিত্র ব্যবহার করে সেই জায়গার সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়, এমন দুটি প্রযুক্তি নিয়ে এবার আমরা জেনে নেব।

জিআইএস ও রিমোটসেন্সিং প্রযুক্তি

বিভিন্ন ধরনের বৈশ্বিক পরিবর্তনের একটি দৃশ্যমান রূপ হলো ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ক্ষুদ্র এলাকার ভূমি ব্যবহারে ও আচ্ছাদনে পরিবর্তন খালি চোখে দেখে বোঝা গেলেও বৃহৎ এলাকার পরিবর্তনের সামগ্রিক রূপ একসঙ্গে বোঝা প্রায় অসম্ভব। বর্তমান যুগে এ ধরনের বৃহৎ এলাকার এবং দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তন বুঝতে আমরা আধুনিক রিমোট সেন্সিং এবং জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি।

Remote Sensing এর অর্থ দূর অনুধাবন। রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তিতে আমরা মূলত কোন স্যাটেলাইট বা উড়োজাহাজ বা ড্রোন ব্যবহার করে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের তথ্য সংবলিত ছবি সংগ্রহ করি। যা পরবর্তী সময়ে কম্পিউটারে নানা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে ব্যবহার করি। আবার বর্তমান বিশ্বে নানাবিধ তথ্য সমৃদ্ধ মানচিত্রের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। যেকোনো স্থানের ভৌগোলিক, আর্থসামাজিক, বিদ্যমান সম্পদ, ঝুঁকি, দুযোর্গসহ নানা তথ্য স্থানিক পরিসরে কিভাবে বিন্যস্ত আছে তা মানচিত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে তথ্যবহুল উপায়ে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা যায়। আর এক্ষেত্রে জিআইএস (Geographical Information System)-এর মতো কম্পিউটারভিত্তিক প্রযুক্তি আমাদের জন্য অনেক বেশি সহায়ক হয়েছে। এ অংশে আমরা রিমোট সেন্সিং ও জিআইএস প্রযুক্তির কাজ করার পদ্ধতি, অগ্রগতি, প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার সম্পর্কে জানব।

Remote Sensing বা দূর অনুধাবন

কোনো বস্তুর কাছে না গিয়ে বরং দূর থেকে সেই বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কৌশলকে বলা হয় রিমোট সেন্সিং। ১৯৬০ সালে রিমোট সেন্সিং শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা Evelyn L. Pruitt। তার আগে আকাশ থেকে ছবি তোলার মাধ্যমে এ ধরনের কাজ করা হতো, যার নাম ছিল ‘আকাশধৃত মানচিত্র’ বা Aerial Photograph। রিমোট সেন্সিং মূলত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ, সমুদ্র বা বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ, অনুধাবন ও সেসব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাকে বোঝায়। যেসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলোকে সেন্সর বা অনুধাবক বলা হয়। অনুধাবকগুলো দুই ধরনের হয়, যথা: সক্রিয় (Active) (নিজস্ব শক্তি ব্যবহার করে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি করে, ফলে রাত-দিন সব সময় কাজ করতে পারে) এবং অক্রিয় (Passive) অনুধাবক (সূর্যালোক ব্যবহার করে বলে রাতের বেলায় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনা)। আর এসব অনুধাবককে যেখানে স্থাপন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাকে প্ল্যাটফর্ম বা মাচা বলা হয়। প্ল্যাটফর্ম হয় তিন ধরনের, যথা: ভূমিস্থ প্ল্যাটফর্ম (Ground-based Platform), আকাশস্থ প্লাটফর্ম (Airborne Platform) এবং মহাকাশস্থ প্ল্যাটফর্ম (Space-borne Platform)।

রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির উন্নয়ন:

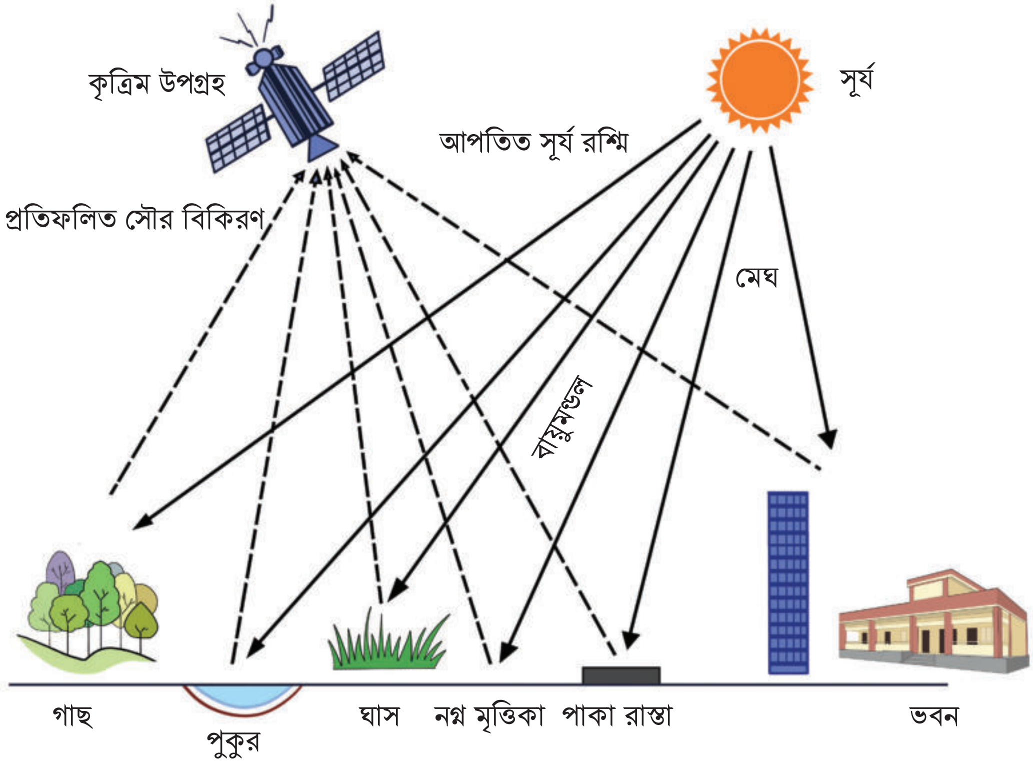

“সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি নানাধাপ অতিক্রম করে আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বায়ুবাহিত নানা যন্ত্র ব্যবহার করে রিমোট সেন্সিংয়ের কাজ করা হতো। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বায়ুবাহিত রিমোট সেন্সিংয়ের বিকাশ ঘটে। সে সময় রিমোট সেন্সিং মূলত জরিপ কাজ, মানচিত্র তৈরি, গোয়েন্দা ও সামরিক কাজে ব্যবহার হতো। ১৯৫০ সালের দিকে আংশিক মহাকাশজাত কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে রিমোট সেন্সিং শুরু হয় । এ সময় রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে স্পুটনিক-১ ও এক্সপ্লোরার-১ নামের কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শীতল যুদ্ধ বা Cold War এর সময়ে (১৯৪৭ থেকে ১৯৯১) সামরিক গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য Spy Satellites বা গোয়েন্দা কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়। Corona তৎকালীন সময়ের একটি গোয়েন্দা কৃত্রিম উপগ্রহের নাম। পরবর্তীতে রিমোট সেন্সিং এর বাস্তবিক প্রয়োগ শুরু হয় আবহাওয়া বার্তা সংগ্রহের কাজে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করার মাধ্যমে। ১৯৭২ সালে ল্যান্ডস্যাট-১ নামের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি নতুন যুগে প্রবেশ করে। মাল্টি স্পেক্ট্রাল স্ক্যানার সেন্সর এবং থিমেটিক ম্যাপার প্রযুক্তি সংযুক্ত থাকায় ল্যান্ডসেট পৃথিবীর সম্পদ অনুসন্ধান ও পরিবেশগত গবেষণায় বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৯৯ সালে Terra নামক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে পৃথিবী পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। তবে চলমান শতাব্দীর শুরু থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের প্রযুক্তিতে অনেক বেশি অগ্রগতি হয় এবং এর মাধ্যমে উপগ্রহের পাঠানো ছবির গুণগত মান উন্নয়ন করা হয়। যার ফলে কম অর্থ ব্যয় করে ভালো মানের ছবি পাওয়ার পথ সুগম হয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কৃত্রিম উপগ্রহের মালিকানা, যা আগে বিভিন্ন রাষ্ট্রে অধীনে ছিল, তা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে আসতে শুরু করে। এসময়ে কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো ইমেজের রেজুলেশনে অনেক উন্নতি ঘটে। Google Earth-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষও এখন কৃত্রিম উপগ্রহের সংগৃহীত তথ্য দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে পারছে। ২০১৮ সালের ১১ মে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নামক ভূস্থিত যোগাযোগ ও সম্প্রচার উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে বিশ্বের ৫৭তম নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় নাম লেখায়। এটি তৈরি করেছিল ফ্রান্সের থ্যালিস অ্যালেনিয়া স্পেস নামক প্রতিষ্ঠান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিমালিকানাধীন মহাকাশযান সংস্থা স্পেস এক্স থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়। টিভি সম্প্রচার, দুর্গম এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মোবাইল যোগাযোগ সমুন্নত রাখতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বিশ্বজুড়ে রিমোট সেন্সিং বা দূর অনুধাবন প্রযুক্তি নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। পূর্বে এর ব্যবহার তাত্ত্বিক গবেষণায় সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন প্রাত্যহিক জীবনের নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। নিচে রিমোট সেন্সিং বা স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

১। আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও পূর্বাভাস প্রদান;

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;

৩। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার পূর্বাভাসের জন্য তথ্য সংগ্রহ;

৪। ভূমি ব্যবহারের ধরন উদঘাটন ও এর পরিকল্পনা;

৫। বন্যাপ্রবণ এলাকার মানচিত্র তৈরি ও ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ নিরুপণ;

৬। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম;

৭। কৃষি ক্ষেত্রে ফসল তোলা, সেচ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ পরিকল্পনা;

৮। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সংবলিত মানচিত্র প্রণয়ন;

৯। বনভূমি আচ্ছাদনের পরিমাণ, ধরন ও ঘনত্ব পরিমাপ;

১০। নগর পরিকল্পনা;

১১। উপকূলীয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;

১২। সমুদ্রের সম্পদ পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা।

এসবের বাইরেও ভূমির ক্ষয়, খরা পর্যবেক্ষণের মতো আরো অসংখ্য কাজ রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে করা যায় এবং দিন দিন এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলছে। এর পেছনে মূল কারণ হলো, যেখানে মানুষের যাওয়া কষ্টকর, সেখানকার তথ্য সংগ্রহ, একসঙ্গে বিশাল এলাকার তথ্য সংগ্রহ এবং কম অর্থ ব্যয়ে গুণগত তথ্য সংগ্রহ । তাই এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন আমাদের জন্য জরুরি।

জিআইএস বা Geographical Information System

আমরা আগেই জেনেছি যে জিআইএস হলো এমন এক প্রযুক্তি বা কম্পিউটার পদ্ধতি যা ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সংস্করণ, ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করে। জিআইএস-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত তথ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো স্থানিক তথ্য এবং অস্থানিক তথ্য। জিআইএস-এর বিখ্যাত সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ESRI (Environmental System Research Institute) জিআইএসকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে যে, 'An organized collection of computer hardware, software, geographic data and personnel designed to efficiently capture, store, update, manipulate, analyze and display all forms of geographically referenced information'. অর্থাৎ কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার, ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি দক্ষতা একসঙ্গে কাজ করে, যখন তা কোনো ভৌগোলিক স্থানের উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদ, সংস্করণ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করতে পারে তখন সে প্রক্রিয়াকে জিআইএস বলে। ডেটাবেজের ধারণা, কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়ন, রিমোট সেন্সিং পদ্ধতির অগ্রগতি, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতিক জ্ঞান জিআইএস এর উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। ১৮৩২ সালে ফ্রান্সের ভূগোলবিদ Charles Picquet প্রথম কলেরা মহামারির স্থানিক বিশ্লেষণ করে জিআিইএস এর ব্যবহার দেখান। ১৮৫৪ সালে Dr. John Snow লন্ডন শহরের কলেরার স্থানিক বিস্তৃতির সঙ্গে পানির উৎসের সম্পর্ক দেখান এবং সেখান থেকেই আজকের জিআিইএস-এর যাত্রা শুরু হয়। তবে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এর বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। ১৯৬৪ সালে Canadian Geographic Information System প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক জিআইএস-এর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। সত্তরের দশকে মাঝামাঝি Arc/Info নামে সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে ESRI জিআইএস-এর বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করে। বর্তমানে দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটারের মূল্য হ্রাস, বিভিন্ন সফটওয়্যার ও তথ্যের সহজলভ্যতা এবং রিমোটসেন্সিং ডাটা পাওয়া সহজ হওয়ায় জিআইএস-এর ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে।

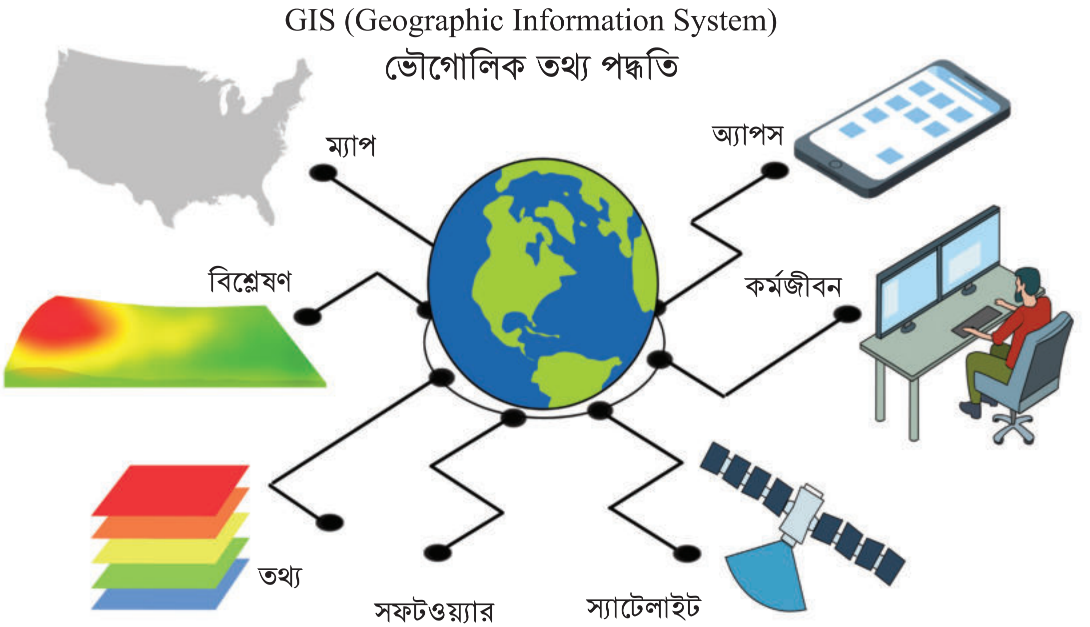

জিআইএস পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য যেসব জিনিস প্রয়োজন হয় সেগুলোকে জিআইএস-এর উপাদান বলে। জিআইএস-এর উপাদান পাঁচটি। যথা:

১। কম্পিউটারে জিআইএস সম্পর্কিত কাজ করতে পারে এমন দক্ষ মানুষ;

২। উপাত্ত:স্থানিক ও অস্থানিক তথ্য;

৩। হার্ডওয়্যার: সিপিইউ, মনিটর, কি-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, জিআইএস ডাটা লগার ইত্যাদি

৪। সফটওয়্যার: কম্পিউটারে বিদ্যমান সাধারণ সফট্ওয়ারের সঙ্গে জিআইএস-এর কাজ করার জন্য বিশেষায়িত সফটওয়্যার, যেমন: ArcView, ArcGIS, GRASS, ERDAS Imagine ইত্যাদি

৫। কার্যপ্রণালি: উপাত্ত সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, পরিবর্তন, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনের জন্য অনুসরণ করা পদ্ধতি।

সভ্যতার অগ্রগতি ও পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য রক্ষা, সমুদ্রসম্পদ আহরণ এবং সর্বোপরি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আমাদের যে পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন, সেখানে জিআইএস-এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় করে ১৯৮৮ সালে Cowen জিআইএস-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে (Approach) চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। যথা:

১। টুলবক্স দৃষ্টিভঙ্গি: এ দৃষ্টিভঙ্গিতে জিআইএসকে কম্পিউটার নির্ভর একটি স্বয়ংক্রিয় হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয় যা ব্যবহার করে ভৌগোলিক উপাত্ত সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী উপস্থাপন করা যায়।

২। ডেটাবেজ দৃষ্টিভঙ্গি: ডেটাবেজ দৃষ্টিভঙ্গিতে এটিকে একটি তথ্যভান্ডার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেখানে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর স্থানিক বিস্তরণের ধরনও উল্লেখ থাকে। জিআইএস প্রযুক্তির প্রথম দিকে এ দৃষ্টিভঙ্গি বেশি প্রচলিত ছিল।

৩। প্রক্রিয়া ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি: এ দৃষ্টিভঙ্গিতে জিআইএসকে কম্পিউটার নির্ভর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়তাকারী হিসেবে বিবেচনা করে ভৌগোলিক তথ্যকে ব্যবহার্য তথ্যে রূপান্তরের উপর জোর দেওয়া হয়। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একটি সহায়ক উপকরণ হলো জিআইএস।

৪। প্রয়োগভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি: প্রয়োগভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জিআইএসকে মূলত বাস্তবভিত্তিক সমস্যা সমাধানে এটির ব্যবহারের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে এটিকে মানচিত্র তৈরি, পরিবহণ বা পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মতো কাজে এর প্রায়োগিক গুরুত্ব তুলে ধরে।

বর্তমান সময়ে জিআইএস-এর ব্যবহার অনেক বেশি বিস্তৃত। নগর-পরিকল্পনাবিদ, ভূগোলবিদ, প্রকৌশলী, পরিবেশবিজ্ঞানী, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা গবেষক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত লোকজন সবাই জিআইএস-এর বাস্তবভিত্তিক ব্যবহার করছেন। নিচে জিআইএস-এর বহুল প্রয়োগ থেকে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১। কৃষিতে;

২। বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বন সংরক্ষণে;

৩। খনিজ সম্পদ উদঘাটন, উত্তোলন ও ব্যবস্থাপনায়;

৪। স্বাস্থ্য সেবার পরিকল্পনায়;

৫। গ্রাম, নগর পরিকল্পনায়;

৬। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়;

৭। পরিবহণ ব্যবস্থাপনা ও নৌচালনায়;

৮। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে;

৯। জরিপ কাজে;

১০। উপকূল ও সমুদ্র ব্যবস্থাপনায়।

এসবের বাইরেও সেচ, মানচিত্র তৈরি, শহরের পয়োনিষ্কাশনসহ আরো অসংখ্য ক্ষেত্রে জিআইএস-এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ভূমিকা নির্ধারণ

এই শিখন অভিজ্ঞতায় অনেকগুলো কাজের মাধ্যমে আমরা জানলাম প্রকৃতি ও সমাজের যেকোনো ধরনের পরিবর্তন কখনো আমাদের জন্য সম্ভাবনা তৈরি করছে, আবার কখনো আমাদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। পরিবর্তন ঠেকানো সব সময় আমাদের জন্য সম্ভব নয়। তাই আমাদের সেই সব পদক্ষেপই নেওয়া উচিত যেগুলোর মাধ্যমে আমরা পরিবর্তনের ঝুঁকি কমিয়ে সেগুলোকে সম্ভাবনায় রূপ দিতে পারি। আর তার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন, গাছপালা, নদী-নালা পাহাড়-পর্বত, নানা রকম প্রাণি, পোকামাকড় ইত্যাদির মতোই আমরা প্রকৃতির একটি উপাদান মাত্র। অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষ প্রকৃতিতে টিকে থাকতে পারলেই সন্তুষ্ট নয়। বাঁচার প্রয়োজন ছাড়াও ভালোভাবে বাঁচতে গিয়ে বাঁচার জন্য অনিবার্য নয়, এমন বাড়তি অনেক কিছু করে। মানুষের চাহিদার এই চাপ ক্রমবর্ধমান। এর চাপ সামগ্রিকভাবে পড়েছে প্রকৃতিরই ওপর। আমরা বাঁচব প্রকৃতিকে জয় করে নয়, প্রকৃতির উপাদান হিসেবে, প্রকৃতির অংশ হয়ে।

অধুনা বিজ্ঞানীরা জনসংখ্যার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনার কথা বলছেন। এই গত বছর সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা আট বিলিয়ন অতিক্রম করেছে। এই বৃদ্ধি চলতে থাকবে এই শতাব্দী জুড়ে, সম্ভবত শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই জনসংখ্যা ৯ বিলিয়ন ছাড়িয়ে একটা স্থিতি অবস্থায় এসে দাঁড়াবে। তারপর জনসংখ্যা কমতে থাকবে এবং পরবর্তী ১০০ বছরে জনসংখ্যা বর্তমান পর্যায়ে আসবে বা আরো কম হবে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। এরই মধ্যে চীন, জাপান ও কোরিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে কোনো কোনো দেশ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকৃতি রক্ষা করার নানা রকম কার্যক্রম ইতিমধ্যে নেওয়া হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশিরা যেন পিছিয়ে না থাকি।

চলো তাহলে আমরা এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করি যা আমাদের এলাকার জন্য সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। এই কাজগুলো আমরা আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাব ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করব এবং এসব কাজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা এলাকার বয়স্ক মানুষদের সাহায্য নেব।

নমুনা কাজের তালিকা

১. এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনে সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় একটি প্রকল্পভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

২. এডিস মশা নিধনে সচেতনতা মূলক কাজের পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন।

৩. প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর জন্য পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

৪....................................

৫....................................

সবশেষে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরাই এ পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বাসিন্দা। তাই আমরা পৃথিবীর এমন কোনো পরিবর্তন ঘটাব না যা আমাদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করবে। আমাদের উচিত নিজস্ব পরিসরে পরিকল্পিত ও ইতিবাচক পরিবর্তনে শামিল হওয়া। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে এ পৃথিবীকে বাঁচাতে। আমরা জানি আমরা তা পারব।

ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের রীতি অনুসন্ধান, কারণ ও ফলাফল চিহ্নিতকরণ

তোমরা কি কখনো তোমাদের আশপাশের পরিবেশে কোনো ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ? এই যেমন বন উজাড় করে কৃষিজমিতে রূপান্তর বা জলাশয় ভরাট করে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ অথবা পাহাড় কেটে রাস্তাঘাট তৈরি? এ ধরনের পরিবর্তন আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটছে বলে নিশ্চয়ই তোমরাও দেখতে পাচ্ছো। আসলে আমাদের চারপাশের পরিবেশে দৃশ্যমান (যেমন: অবকাঠামো নির্মাণ) ও অদৃশ্য (যেমন: বায়ু দূষণ) দুই ধরনের পরিবর্তনই ঘটে থাকে। এর মধ্যে ভূমির পরিবর্তন একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন। বনভূমি বা পাহাড় কেটে তাকে কৃষিজমি বা বসতভিটায় রূপান্তর অথবা আগে কৃষিজমি থাকলে ব্যবহার পরিবর্তন করে তাতে মানব বসতি গড়ে তোলা ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনেরই উদাহরণ। এ ধরনের পরিবর্তনের কিছু বাস্তব নমুনা আমরা অনুশীলনী অংশেও দেখতে পেয়েছি। ভূমির এসব পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনে কীভাবে কাজ করছে, ভূমি পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরন কেমন, পরিবর্তনের কারণ, এসব পরিবর্তন কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে ইত্যাদি এবং এ ধরনের পরিবর্তনের ফলাফল সম্পর্কে এ অংশে আমরা জানার চেষ্টা করব।

ভূমির পরিবর্তন বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর বৈশ্বিক পরিবেশের পরিবর্তন মানুষ ও তার অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমির পরিবর্তনকে দুটি উপায়ে

বর্ণনা করা যায়, যথা: ভূমি আচ্ছাদন (Land Cover) ও ভূমি ব্যবহারে (Land Use) পরিবর্তন। আপাত দৃষ্টিতে ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন বলতে সময়ের আবর্তে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন বোঝালেও এগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ভূমি আচ্ছাদন বলতে পৃথিবীপৃষ্ঠ ও এর সংলগ্ন অংশে জুড়ে থাকা বিভিন্ন উপাদান যেমন: বিভিন্ন জীব, মৃত্তিকা, ভূমিরূপ, ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের পানি এবং মানুষের তৈরি বিভিন্ন অবকাঠামোকে বোঝায়। অন্যদিকে মানুষ যেসব উদ্দেশ্যে এসব উপাদানের নানাবিধ ব্যবহার করে, তাকে ভূমির ব্যবহার বলে। ভূ-পৃষ্ঠের বায়োফিজিক্যাল উপাদানগুলোর পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এবং এর মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের উপর যা যা করা হয়, তার সবই ভূমি ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত।

বায়োফিজিক্যাল উপাদান বলতে পরিবেশের জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী) এবং জড় (মাটি,পানি) উপাদানসমূহকে বোঝায়। বায়োফিজিক্যাল উপাদানের চারটি অংশ। যথা: বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং জীবমণ্ডল।

পৃথিবীতে ভূমির রূপান্তরের ক্ষেত্রে কৃষিকাজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদন এবং পশুচারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কৃষিজমির বড়ো অংশ মূলত বন, তৃণভূমি এবং জলাভূমি ধ্বংস করেই আমরা পেয়েছি। এগুলো পূর্বে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাস্থল এবং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদানের যোগান দিয়ে আসছিল। মোটাদাগে বলতে গেলে পৃথিবীর মোট বনভূমির প্রায় অর্ধেক ইতিমধ্যে মানুষ ধ্বংস করে ফেলেছে। তবে কৃষিজমিতে রূপান্তরের যে প্রক্রিয়া তা বিগত ৩০০ বছরে আরো বেশি ত্বরান্বিত হয়েছে। ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহারের পরিবর্তন পরিমাপের মাধ্যমে আমরা মূলত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষ কত বেশি নির্ভরশীল তা বুঝতে পারি। বেশ কিছু পরিবেশবিজ্ঞানী তাদের গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীজুড়ে উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে যে খাদ্য উৎপাদন করে, তার শতকরা ২০-৪০ ভাগ মানুষ ভোগ করে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কত বেশি নির্ভরশীল। তবে সারা বিশ্বে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ বা ধরন একরকম নয়। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিমাণ বা ধরন বিভিন্ন দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, জীবনযাপনের ধরন ও সংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগের তারতম্য বা ব্যবহারের পরিবেশগত প্রভাব বোঝাতে Ecological Footprint বা পরিবেশগত-ছাপ ধারণাটি বেশ প্রচলিত। ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট বলতে মানুষের প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান দিতে এবং তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্জ্য শোষণ করতে যে পরিমাণ ভূমি প্রয়োজন তাকে বোঝানো হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন বাংলাদেশির ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট হলো ০.৫ হেক্টর ভূমি; যেখানে একজন ইতালিয়ান বা আমেরিকানের ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট হলো যথাক্রমে ৩.৩ হেক্টর ও ৯.৬ হেক্টর ভূমি। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, একজন বাংলাদেশি নাগরিকের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান ও সৃষ্ট বর্জ্য শোষণের জন্য যে পরিমাণ ভূমি ব্যবহৃত হয়, একজন ইউরোপিয়ান বা আমেরিকান নাগরিকের জন্য এর চেয়ে যথাক্রমে ৭ গুণ ও ১৯ গুণ বেশি ভূমি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভূমির তুলনায় জন-ঘনত্ব বেশি হওয়ায় প্রয়োজনীয় সম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে ভূমির উপর চাপ অনেক বেশি, যার প্রভাব ভূ-আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনেও দেখা যায়।

ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের বৈশ্বিক ধরন

ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরিবর্তনের ইতিহাস মিলিয়ন বছরের অর্থাৎ এটি মানব সভ্যতা শুরুর সময়কালের মতোই প্রাচীন। সভ্যতার সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত নিকট-প্রাচ্যের (তুরস্ক, জর্ডান, সাইপ্রাস, মিশর, ইরাক, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্য) দেশগুলোর ভূ-ভাগে মানুষের সৃষ্ট পরিবর্তনের ইতিহাস জানা যায়। প্রাকৃতিক বনভূমি কমে যাওয়ায় দক্ষিণ জর্ডানের আইন গাজাল ও এর আশপাশের অঞ্চলগুলোকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০০ সালের দিকে বসবাসের জন্য পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় যা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের এক প্রাচীন উদাহরণ। মেক্সিকোর ইউকেটান উপদ্বীপে মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেখানে প্রাচীনকালে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের নমুনা রয়েছে। প্রাচীনকালের ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরির্বতনের ইতিহাস জানার জন্য আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রাচীন ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়। আর বর্তমান সময়ে কম্পিউটার প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে আমরা আকাশধৃত মানচিত্র বা ভূ-উপগ্রহের পাঠানো ছবি বিশ্লেষণ করে বিস্তীর্ণ এলাকার ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার পরির্বতনের ধরন জানতে পারি।

সারা বিশ্বের পরিবেশগত যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি, তার অন্যতম চালিকা শক্তি হলো ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহারে পরিবর্তন। ক্রান্তীয় বনভূমি ধ্বংসসহ সারা পৃথিবী জুড়েই যে ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন হচ্ছে তা সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য বিজ্ঞানীরা গত দুই দশকে অনেক কাজ করেছেন। আমরা এ অংশে সারা বিশ্বের ভূমি আচ্ছাদন ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের প্রধান ধরন যেমন বনভূমি বিনষ্ট ও উজাড়, শস্য আবাদ ও চারণ ভূমির পরিবর্তন, নগরায়ণ এবং শুষ্কভূমির পরিবর্তনগুলোর স্থানিক বিন্যাস ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

বনভূমি ও বন আচ্ছাদনে পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরন

বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে বন উজাড় পৃথিবীর ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদন পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে প্রতিবছর ১২.৫ মিলিয়ন হেক্টর হারে বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে। আর প্রতিবছর বনায়ন হয়েছে মাত্র ৩.১ মিলিয়ন হেক্টর হারে। যার অর্থ, বিশ্বে প্রতিবছর ৯.৪ মিলিয়ন হেক্টর হারে বনভূমি বিলীন হয়েছে। বন উজাড়ের বড়ো অংশ সংঘটিত হয়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চলে। আর প্রাকৃতিক বনের যেটুকু বিকাশ হয়েছে, তা মূলত পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা অঞ্চলে। ১৯৯০-১৯৯৭ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে (প্রতিবছর শতকরা ০.৭১ হেক্টর হারে) বেশি বনভূমি কৃষি বা অন্যান্য ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়েছে। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বনভূমি ধ্বংস হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার মধ্য সুমাত্রায়। কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মিয়ানমারে উল্লেখযোগ্য হারে বনভূমি বিনাশ করা হয়েছে। আফ্রিকায় বনভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তন হয়েছে এবং মাদাগাস্কার, আইভরিকোস্ট ও কঙ্গো অববাহিকায় ব্যাপক পরিমাণে বন উজাড় করা হয়েছে। সাইবেরিয়া এবং রাশিয়াতেও দাবানলের মাধ্যমে ব্যাপক বনভূমি ধ্বংস হয়েছে। আমাজন বনের ব্রাজিল অংশে রাস্তা নির্মাণ ও সরকারের নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি বনভূমি ধ্বংস হয়েছে।

আবাদি জমির পরিবর্তনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরন

মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই প্রয়োজনীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিজমির আয়তন বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছে। এর ফলে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন এসেছে বিশ্বজুড়েই, যেমন: পূর্ব ইউরোপের মোট ভূমির অর্ধেকের বেশি কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ ভূমি কৃষিজমির শ্রেণিভুক্ত যার মধ্যে

শস্যক্ষেত্র, তৃণভূমি ও চারণভূমি অন্তর্ভুক্ত। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর একদিকে যেমন খাদ্য চাহিদা বেড়ে চলেছে অন্যদিকে তেমনি সেখানে কৃষিজমির অপ্রতুলতা রয়েছে। বিগত কয়েক দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে অকৃষি জমি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে কৃষিজমিতে রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশে কৃষিজমির সম্প্রসারণ এ অঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, পূর্ব আফ্রিকার গ্রেট লেক অঞ্চল, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নিম্নভূমি, পূর্ব চীন, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের বিভিন্ন অংশ পূর্বে বনভূমি বা অনাবাদি থাকলেও সম্প্রতি এগুলোকে শস্য আবাদের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ (১.৯৬ গুণ) বৃদ্ধি পেয়েছে যার পেছনে কৃষিজমি সম্প্রসারণের সঙ্গে কাজ করেছে সেচব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার এবং নিবিড় কৃষিকাজের চর্চা। তবে সারা পৃথিবীতে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ১৯০০ সালের দিকে যা ছিল (০.৭৫ হেক্টর) তা ১৯৯০ সালের দিকে প্রায় অর্ধেক (০.৩৫ হেক্টর) হয়েছে। সারাবিশ্বে এ সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, শিশুমৃত্যু হ্রাস ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার হওয়াসহ অন্যান্য কারণে জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়লেও তার সঙ্গে সংগতি রেখে আবাদি জমির পরিমাণ না বাড়ায় ওগুলোই উপরে বর্ণিত কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

গবাদিপশুর চারণভূমির পরিবর্তনের ধরন

প্রাকৃতিকভাবে বা চাষ করার মাধ্যমে গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য স্থায়ীভাবে কোনো ভূমি ব্যবহার হলে তাকে চারণ ভূমি (Pastoral Areas) বলা হয়। এ কারণে সাভানা বা তৃণভূমির সঙ্গে চারণভূমির পার্থক্য করা কঠিন। পৃথিবীতে বিদ্যমান সাভানা বা তৃণভূমিগুলোর বহুমুখী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সারা পৃথিবীর মোট চারণভূমির বড়ো অংশ আফ্রিকা (২৬ শতাংশ) এবং এশিয়াতে (২৫ শতাংশ) অবস্থিত। লাতিন আমেরিকায় ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলেও (১৮ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চারণভূমি দেখা যায়। এর বাইরে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশ (১০ শতাংশ), ওশেনিয়া (১২ শতাংশ), উত্তর আমেরিকা (৮ শতাংশ) এবং ইউরোপে (২ শতাংশ) কিছু চারণভূমি রয়েছে। বিগত কয়েক দশকে বিশ্বজুড়েই চারণভূমির ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন এসেছে। এ সময়ে এশিয়া ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর চারণভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও ইউরোপ ও ওশেনিয়ায় তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব আফ্রিকাতেও চারণ ভূমি কমতে দেখা গেছে, যার পেছনে কারণ হিসেবে কাজ করেছে সেখানে ব্যাপক পরিমাণে পশু উৎপাদন।

নগরায়ণে পরিবর্তন ও ভূমি ব্যবহারে তার প্রভাবের ধরন

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, আমাদের দেশের গ্রামগুলো থেকে প্রতিবছর কর্মসংস্থান, শিক্ষা বা উন্নত জীবনের আশায় কত মানুষ শহরমুখী হচ্ছে। এটা শুধু বাংলাদেশের নয়; বরং বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর এটি একটি সাধারণ চিত্র। ২০০০ সালের দিকে বিশ্বের শহরাঞ্চলে বসবাস করা জনসংখ্যা ছিল ২.৯ বিলিয়ন যা সে সময়ের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। ২০২১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪.৪৫ বিলিয়নে যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্বে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা গ্রামের তুলনায় বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মেগা সিটির সংখ্যা বাড়ছে। শহর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে তার আয়তন বৃদ্ধিও বোঝায়। আবার নতুন নতুন এলাকা শহরে রূপান্তরিত হয়। তার মানে শহরের পরিসরের বিস্তার এবং নতুন শহর তৈরি এই উভয় কাজ ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। আমাদের দেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর কৃষিজমি, বনভূমি, উন্মুক্ত স্থান, জলাভূমি ও নিঁচু জমি ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শহর বা নগরে রূপান্তর করা হচ্ছে। যার ফলে সেসব স্থানে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে।

শুষ্ক অঞ্চলগুলোতে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরন

মরুকরণ (Desertification) শব্দটির সঙ্গে হয়তো আমরা ইতিমধ্যেই অনেকে পরিচিত। মরুকরণ হলো কোনো এলাকায় স্থায়ীভাবে ভূমির উর্বরতাশক্তি ও গাছপালা হারিয়ে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মরুভূমির মতো পরিবেশ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া। আর জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানব সৃষ্ট কারণে মাটির জৈব উৎপাদন ক্ষমতা (উদ্ভিদ, অণুজীব) হ্রাস, পানি ও বায়ুপ্রবাহের দ্বারা মাটির উপরিস্তরের ক্ষয়, ভৌত ও রাসায়নিক গুণ নষ্ট হওয়ার মতো এক বা একাধিক ঘটনার প্রভাবকে ভূমির অবক্ষয় বা উর্বরতাশক্তি হারানো বলে। UNEP (United Nations Environment Program) প্রদত্ত তথ্য অনুসারে বিশ্বে শুষ্ক ভূমির মোট পরিমাণ প্রায় ৫১৬০ মিলিয়ন হেক্টর এবং এই শুষ্কভূমির প্রায় ৭০ শতাংশ বিভিন্ন মাত্রার ভূমি অবক্ষয়ের শিকার। United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) এর তথ্যমতে বিশ্বের ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভূমি মরুকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে মরুকরণের প্রভাবযুক্ত এলাকা সঠিকভাবে শনাক্ত করা এখনো সম্ভব না হলেও এটা বলা যায় যে, মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান ধারাবহিকতায় চলতে থাকলে বিশ্বের কম বৃষ্টিসম্পন্ন এলাকাগুলো মরুকরণের শিকার হবে। আর তাতে ভূমি ব্যবহারের বিদ্যমান ধরনে পরিবর্তন আনতে মানুষ অনেকটা বাধ্য হবে।

তবে আমরা যদি মোটাদাগে ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তন প্রক্রিয়ার কিছু প্রত্যক্ষ উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই, তাহলে নগরায়ণ, বনভূমি ও তৃণভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তর, ফসলের পরিবর্তন, নিবিড় কৃষিকাজ, চারণভূমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরের কথা বলতে পারি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন

কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় যত জন মানুষ বাস করে, তাকে সেই এলাকার জনসংখ্যা বলে। এই জনসংখ্যা কোথাও কম আবার কোথাও অনেক বেশি হতে পারে। যেমন: আমাদের দেশে পাহাড়ি অঞ্চলে আয়তন অনুপাতে কম মানুষ বাস করে, যেখানে ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো বড়ো শহরগুলোতে অল্প জায়গায় অনেক বেশি মানুষের বাস। আবার বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ ফলে আমাদের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা ঘনত্ব খুবই কম। কোনো এলাকার জনসংখ্যা-সম্পর্কিত তথ্য সেখানকার বর্তমান আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি যেমন ফুটিয়ে তোলে, তেমনি সেখানকার ভবিষ্যতের চিত্র বা উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। একারণেই জনসংখ্যা-সম্পর্কিত তথ্য সব দেশের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো দেশের জনমিতি (Demography) অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা সে দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যগুলো জানতে পারি। আবার যেহেতু কোনো এলাকার বা দেশের জনসংখ্যা সেখানকার স্থানিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যে নানা পরিবর্তন হয়, তাই এটি ভূগোল (মানবিক ভূগোল) শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে। ভূগোল শাস্ত্রে এটিকে জনসংখ্যা ভূগোল (Population Geography) নামে পড়ানো হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ জনসংখ্যাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করে। উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যগুলোর মান অপেক্ষাকৃত ভালো ও বহু বছরের তথ্য তারা সংরক্ষণ করে থাকে। বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই জনসংখ্যা-সম্পর্কিত তথ্যগুলো মূলত দুটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। যথা: আদমশুমারি (census) এবং জনসংখ্যা-সম্পর্কিত নথিপত্র থেকে। আদমশুমারি থেকে আমরা জনগণের জন্ম-মৃত্যু হার ও তাদের আর্থসামাজিক তথ্য পাই। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে প্রথম আদমশুমারি হয়, যেমন: সুইডেনে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৭৪৮ সালে। বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি হয় ১৯৭৪ সালে। এরপর ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১,

২০১১ এবং সর্বশেষ ২০২২ সালে (করোনা মহামারির কারণে এক বছর পিছিয়ে যায়) বাংলাদেশে আদমশুমারি হয়। তাছাড়া জাতিসংঘ (UN) এবং এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন যেমন: খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ইউনেসকো (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা। এছাড়া জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে থাকে UNFPA।

নিশ্চয়ই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে অতীতে পৃথিবীর জনসংখ্যা কেমন ছিল, সে সময়ে মানুষ কোথায় বাস করত, তাদের জীবিকার উৎস কি ছিল কিংবা তারা কোন প্রক্রিয়ায় নানা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে আজকের পর্যায়ে এসেছে। আমরা এ অংশে সেসবের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এবং বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন দেশ বা এলাকার ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে।

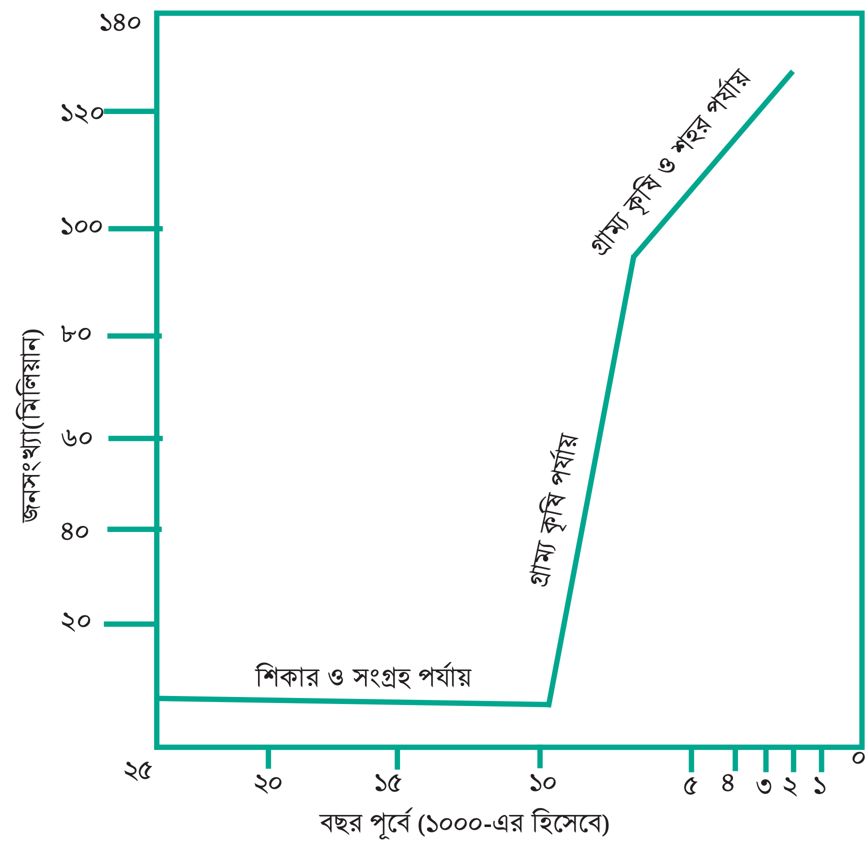

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো এক সময়ে আফ্রিকা থেকে সামান্য সংখ্যায় হলেও প্রস্তর যুগের মানুষ শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ২৫ হাজার বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন বা ৩৩ লক্ষ। আর ১৫ হাজার বছর আগে তা বেড়ে দাড়িয়েছিল ৫৩ লক্ষ জনে এবং জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ০.৪৪ জন। প্রস্তর যুগে মানুষের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬-১২ জনের মতো। ৬ হাজার বছর আগে গ্রামীণ কৃষি ও নতুন নগরায়ণের যুগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৬.৫ মিলিয়ন বা ৮ কোটি ৬৫ লক্ষ। চাষবাসের শুরুর সময় থেকে কিছু কিছু

এলাকায় ও পরবর্তীকালে বিস্তীর্ণ এলাকায় শস্য চাষ ও পশুপালন শুরু হয়েছিল। শস্য চাষ ও পশুপালন করে মানুষ কাছাকাছি বাস করার ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান দূরত্ব আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল। বিনিময়ের জন্য উদ্বৃত্ত পণ্যসামগ্রীর যোগান পাওয়া গেল। প্রয়োজন দেখা দিল যোগাযোগ ব্যবস্থার। ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক দ্রুত বদলাতে শুরু করল। প্রাচুর্য আর খাদ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একই স্থানে বহু মানুষের বসবাসের সুযোগ তৈরি হলো। প্রায় ৩৩০ বছর আগে কৃষি, শিল্প ও নগরায়ণ শুরু হলে পৃথিবীর জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৫০ সালের দিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪৫ মিলিয়নে। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার কৃষিবিপ্লবের পাশাপাশি চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদান রেখে মানুষের মৃত্যু হার কমিয়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার আরো বাড়িয়ে দেয়। ১৬৫০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী ৩০০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ৫ গুণ। আর ১৯৫০ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২.৫ বিলিয়ন থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৮ বিলিয়নে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৭.৮৮ বিলিয়ন যা ২০৫০ সালে বেড়ে ৯.৭ বিলিয়নে রূপ নিতে পারে। জনসংখ্যার মহাদেশীয় বিস্তরণের দিকে তাকালে দেখা যায় এশিয়ায় পৃথিবীর বর্তমান মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশ বসবাস করে। অথচ এ মহাদেশের আয়তন পৃথিবীর মোট স্থলভাগের মাত্র ৩০ শতাংশ। নিচের সারণি থেকে আমরা মহাদেশ অনুযায়ী পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার বিস্তরণের চিত্র দেখতে পাব।

মহাদেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা অংশ	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)
এশিয়া	৪৬৭	৫৯.২৭	১৪৮
আফ্রিকা	১৪৩	১৮.১৫	৪৮
ইউরোপ	৭২	৯.১৪	৩২
উত্তর আমেরিকা	৫৯	৭.৪৮	২৫
দক্ষিণ আমেরিকা	৪৩	৫.৪৫	২৫
ওশেনিয়া	৪	০.৫১	৫
এন্টার্কটিকা	০.০০৪৪৯	নগণ্য	নগণ্য

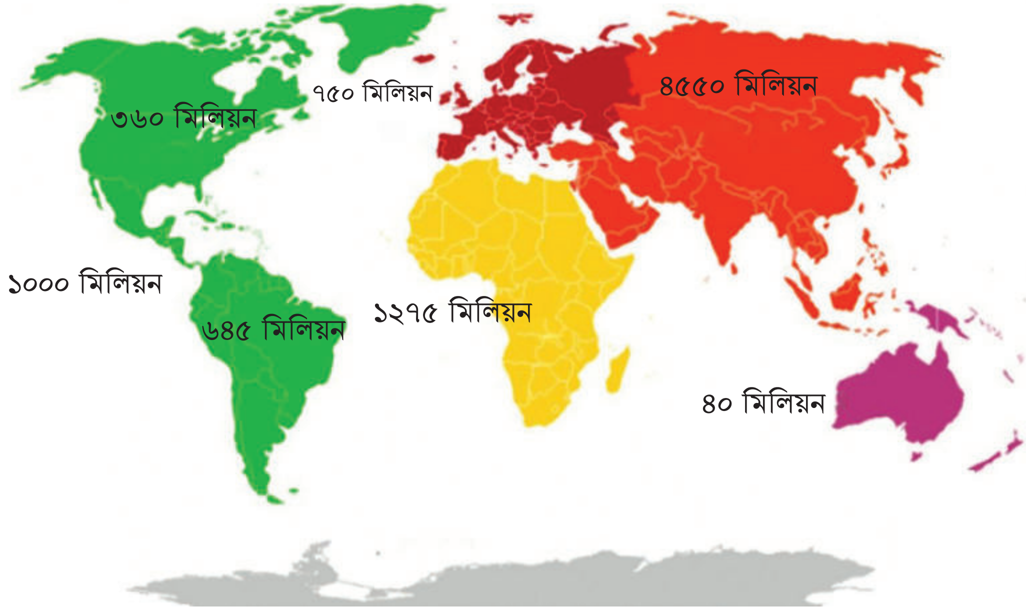

এটি একটি জনঘনত্ব নির্দেশক মানচিত্র। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, এশিয়াতে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে জনঘনত্বপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর যেখানে জনঘনত্ব যত বেশি, সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপও বেশি থাকে। প্রয়োজন মেটাতে প্রকৃতি থেকে বেশি সম্পদ সংগ্রহের জন্য মানুষ তখন সেখানকার বিদ্যমান ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনে।

উপরোক্ত সারণি ও মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে এশিয়া মহাদেশের আয়তনের তুলনায় এখানে সবচেয়ে বেশি মানুষের বাস। আর এখানেই রয়েছে বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং ভারত ও চীনের মতো বিশাল জনগোষ্ঠীর বসবাস। এর পরেই রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থান। যার ফলে এদুটি মহাদেশেই প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বনভূমি উজাড় হয়ে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, কৃষিজমি বা বনভূমি আবার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণে ব্যবহার করতে হচ্ছে। প্রাকৃতিক জলাভূমি ভরাট করে গড়ে উঠছে নানা স্থাপনা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য হলেও বন কেটে কৃষিভূমিতে রূপান্তর বা অন্য কাজে ব্যবহারের ফলে বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে অত্যধিক জনসংখ্যার কারণে শিল্পায়ন, নগরায়ণ বৃদ্ধির পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর যানবাহনের সংখ্যা। পৃথিবীর বিদ্যমান বনভূমি এ বিশাল পরিমাণ নির্গত কার্বন শোষণ করতে না পারায় দ্রুত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। এর প্রভাব আমরা বুঝতে পারছি প্রকৃতির চরম বৈরী আচরণ প্রকাশের মাধ্যমে। এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে এনে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা তৈরি জরুরি। এজন্য রাষ্ট্রগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আর এভাবে গৃহীত পদক্ষেপ যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়, সেজন্য ব্যক্তি পর্যায়ে সচেতন হয়ে যার যার কমিউনিটিকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

মানব বসতি (Human Settlement) ও ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন

আমরা জানি যে, সভ্য মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার তিনটি মৌলিক প্রয়োজন দেখা দেয় (খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান) যার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তো বটেই, এছাড়া দৈনন্দিন কাজের পর বিশ্রাম, পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা, সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য মানুষের আশ্রয় প্রয়োজন। তাই মানুষ তার আর্থিক সামর্থ্য ও চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিবেচনায় নিয়ে বাসস্থান নির্মাণ করে। আদিমকালে মানুষ পাহাড়ের গুহা বা উঁচু বৃক্ষকে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তাতে পরিবর্তন আসে। এর সঙ্গে মানুষের ভূমি ব্যবহারে দক্ষতা ও প্রয়োজন বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। বৃক্ষ থেকে মাটির কুঁড়েঘর, কুঁড়েঘর থেকে ইটের বাড়ি ও আধুনিক বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ- সবই পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকেই তুলে ধরে। মানব বসতি সম্পর্কে জানার মাধ্যমে আমরা ভূমি ব্যবহারের অন্যতম একটি ধরন এবং এর মাধ্যমে কীভাবে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন হয়, তা জানতে পারব। আগের দিনের যাযাবর মানুষের মধ্যে অস্থায়ী বসতি, গড়ার প্রচলন থাকলেও আধুনিক কালে প্রায় সব মানুষ স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে। তবে এখনো কেউ কেউ কালেভদ্রে অস্থায়ী বাসস্থান ব্যবহার করে। এশিয়ার মৌসুমি অঞ্চলে ধান চাষ মানুষের স্থায়ী বসতি গড়তে সাহায্য করেছে বলে জানা যায়। এ ধরনের ঘটনা সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলোরও দেখা যায়। আবার উত্তর আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো এলাকায় খনিজ সম্পদ, যেমন: তেলকে কেন্দ্র করে স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছে।

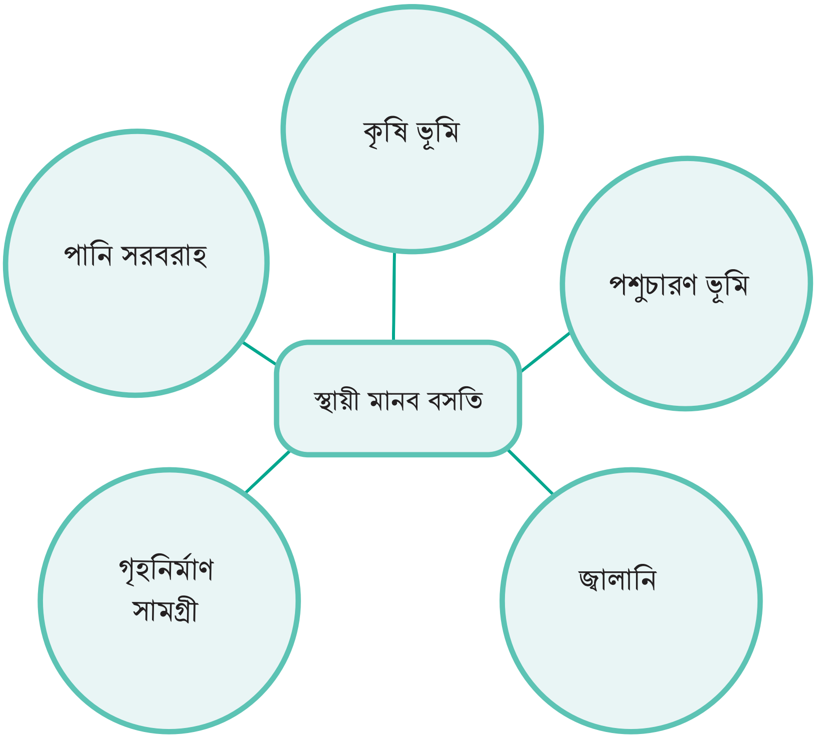

জ্যোতির্ময় সেনের 'জনবসতি ভূগোল' বইতে দেখানো কৃষি অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্থায়ী বসতির অবস্থান

মানব বসতিকে তার স্থায়িত্ব, কর্মধারা (functions) বা আয়তনের ভিত্তিতে নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে মানব বসতির একটি সরল শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো। তবে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা মানব বসতির দুটি প্রধান ভাগ, যথা- গ্রামীণ বসতি ও নগর বসতি নিয়ে আলোচনা করব:

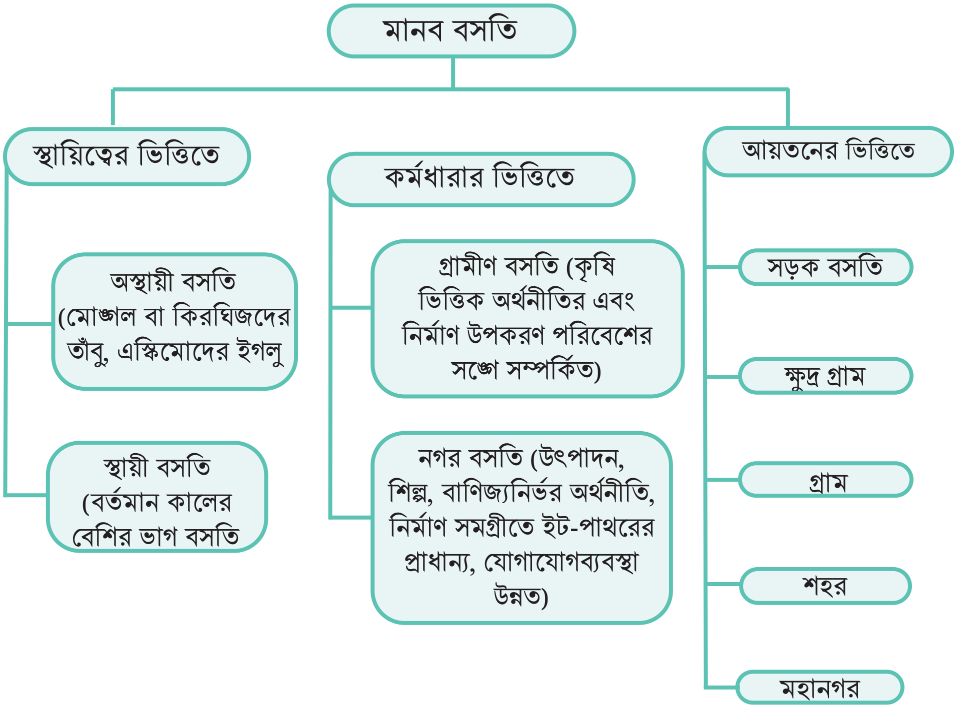

গ্রামীণ বসতি:

মানুষ ঠিক কোন সময়ে স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস শুরু করল এবং কখন সেই স্থায়ী বসতি গ্রামে রূপান্তরিত হলো তা এখনো আমাদের অজানা। তবে যত দিন পর্যন্ত মানুষকে ফলমূল আহরণ ও পশু শিকার নির্ভর জীবনযাপন করতে হয়েছে বা তারও পরে যত দিন পশুচারণকে জীবিকা হিসেবে নিতে হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত যে মানুষ স্থায়ী বসতি গড়তে পারেনি তা বলা যায়। পরে কৃষি ও ঘরের পত্তন, পরিবার ও সমাজের সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষ একসঙ্গে বসবাস শুরু করলে গ্রামের পত্তন হয়। গ্রামীণ বসতি বলতে সেই মানব বসতিকে বোঝায়, যেখানে বসবাসকারী লোকজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক (কৃষি উৎপাদন) কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, জনসংখ্যার ঘনত্ব শহর এলাকা থেকে কম, বসবাসকারীদের মধ্যে আঞ্চলিক ও পেশাভিত্তিক বৈচিত্র্য কম, গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর যোগান পরিবেশের উপর নির্ভরশীল এবং যোগাযোগব্যবস্থা ততটা উন্নত নয়। গ্রামীণ বসতি গড়ে ওঠার পেছনে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে রয়েছে ভূপ্রকৃতি, মাটির বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু, সূর্যালোক প্রাপ্তি, জলাশয়ের অবস্থান ইত্যাদি। এর মধ্যে ভূপ্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি কারণ এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বসতি স্থাপনকে প্রভাবিত করে। তাই জমির ঢাল, উচ্চতা বা বন্ধুরতা মানব বসতি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। বসতি গড়ে ওঠার অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে বনজ সম্পদের সহজলভ্যতা, মাছ ধরা ও পশুপালনের সুবিধা বা খনিজ সম্পদের আবিষ্কার উল্লেখ করা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে খনিজ তেল, দক্ষিণ আমেরিকার

চিলিতে নাইট্রেট, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় সেখানে বসতি গড়ে উঠেছে। আবার বনজ সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ বিশ্বের বিভিন্ন বনভূমিসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন এলাকাতে বসতি স্থাপনে ভূমিকা রেখেছে। আমাদের দেশে জেলে সম্প্রদায় নদী বা সাগরের তীরবর্তী এলাকায় তাদের মতো করে বসতি গড়ে তোলে। আবার সাংস্কৃতিক নানা বৈশিষ্ট্য, যেমন: ধর্ম, ভাষা, খাদ্যাভ্যাসে সাদৃশ্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এক সঙ্গে বাস করার প্রবণতা দেখা যায় যা গ্রামীণ বসতি স্থাপনে ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও গ্রামীণ বসতি স্থাপনে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন: আমাদের দেশে গুচ্ছ গ্রাম প্রবর্তন বা পাবর্ত্য অঞ্চলে বাঙালি অধ্যুষিত বসতি স্থাপন মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত।

গ্রামীণ বসতির আয়তন দুইভাবে নির্ধারিত হয়, যথা: গ্রামের পরিধিগত বিচার বা মোট এলাকা এবং গ্রামের মোট জনসংখ্যা দিয়ে। বাংলাদেশের গ্রামগুলোর পরিধিগত বিস্তৃতি নানা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন: জলাশয় (খাল, বিল, নদী), বনভূমি, প্রাকৃতিক বাধা (পাহাড় বা টিলার অবস্থান) কিংবা যোগাযোগের সুবিধা-অসুবিধার নিরিখে নির্ধারিত হয়। গ্রামীণ বসতির আকার বলতে অনুকূল ও সুবিধাজনক বসতির স্থানে বাসগৃহ ও তার আনুষাঙ্গিক উপাদানগুলোর নির্দিষ্ট দিকে বিস্তারের প্রবণতাকে বোঝায়। এর ফলে বসতির একটি বাহ্যিক রূপ সৃষ্টি হয় যা ভূগোলবিদদের চোখে ধরা পড়ে। গ্রামীণ বসতির আকৃতি প্রাকৃতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক বিষয় দিয়ে প্রভাবিত হয়। আমাদের দেশের গ্রামীণ বসতিতে সরল রৈখিক (Linear), গুচ্ছাকৃতি বা পিন্ডাকৃতি (Compact or Nucleated or Agglomerated) এবং বিক্ষিপ্ত (Scattered or Dispersed) বসতি দেখা যায়। সড়ক বা রেলপথ কিংবা নদী-তীরবর্তী বাঁধ ধরে গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠলে তা অনেকটা সরল রৈখিক আকৃতি লাভ করে। কারণ যোগাযোগ সুবিধার জন্য এসব অবকাঠামোর দুদিকে ভূমি ব্যবহারে দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং বসতি গড়ে ওঠে। কোনো রাস্তার সংযোগস্থল, নদীবন্দরের আশপাশে বা কোনো বাজারের চারপাশে গুচ্ছাকৃতি গ্রামীণ বসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। আবার পাহাড়ি এলাকা বা সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়। বিক্ষিপ্ত গ্রামীণ বসতিতে মানুষের মধ্যে সামাজিক বন্ধন অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়।

নগর বসতি:

ইংরেজি শব্দ Urban-এর বাংলা প্রতিশব্দ নগর; আর Town অর্থ শহর। নগর বা শহর সমার্থক হিসেবে ব্যবহার হলেও শহর অপেক্ষা নগরের আয়তন বড়ো, নগরে মানুষের পেশা এবং কর্মের ধরন অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। বহু প্রকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, পেশাভিত্তিক সুযোগ, স্থাপত্যশৈলী নগরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা শহরের সীমিত পরিসরে গড়ে ওঠে না। আর ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাটের সমারোহ, বিনিময় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্প ও সেবাভিত্তিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের জীবিকা নির্বাহ, অল্প স্থানে অধিক মানুষের বসবাস বা মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সামাজিক বন্ধন ইত্যাদি দ্বারা নগরকে গ্রাম (Rural) থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়। নগরে আকাশচুম্বী অট্টালিকা, হাসপাতাল, বিনোদনের জন্য বিভিন্ন আয়োজন, পার্ক, জাদুঘর ইত্যাদি দেখা যায়। নগরে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের নগরগুলোতে, একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যার নাম বস্তি (Slum)। এসব বস্তিতে পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা না থাকলেও নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এখানে গাদাগাদি করে বসবাস করে। পৃথিবীর একেক দেশে নগরকে একেক নামে অভিহিত করা হয়। যেমন: জার্মানিতে নগরকে Stadt, ফ্রান্সে Cite, সুইডেনে Staden, ইংল্যান্ডে Town বা City বলা হয়। অনেক দেশ জনসংখ্যা দিয়ে নগরকে সংজ্ঞায়িত করে, যেমন: যুক্তরাষ্ট্রে ২,৫০০ মানুষ কোন বসতি গড়ে তুললে তাকে নগর বলা হয়, নেদারল্যান্ডে এ সংখ্যা ২৫ হাজার। এ থেকে বলা যায় নগরকে সংজ্ঞায়িত করার কোন একক পদ্ধতি প্রচলিত নাই।

বিশ্বের সর্বত্র নগরায়ণের হার সমান নয়। নগরায়ণের একটি বৃহৎ অংশ সেখানে গড়ে উঠতে দেখা যায় যেখানে প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সব উপকরণ সহজলভ্য ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ক্রান্তীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ গোলার্ধে অপেক্ষাকৃত কম নগরায়ণ দেখা যায়। নগরায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে। Arthur E Smailes তার বিখ্যাত 'Geography of Towns' নামক বইতে যেসব প্রাচীন নগরের কথা বলেছেন সেগুলোর উৎপত্তি কোনো না কোনো নদী উপত্যকায় হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের মতে নগরায়ণের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জর্ডন নদী উপত্যকায় অবস্থিত জেরিকো নামক স্থানে। এছাড়া টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা, নীল নদ অববাহিকা, সিন্ধু অববাহিকা, হোয়াংহো অববাহিকা, মায়া (দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো নদী অববাহিকায়) সভ্যতাসমূহ পৃথিবীর প্রাচীন নগরায়ণের চিহ্ন বহন করছে।

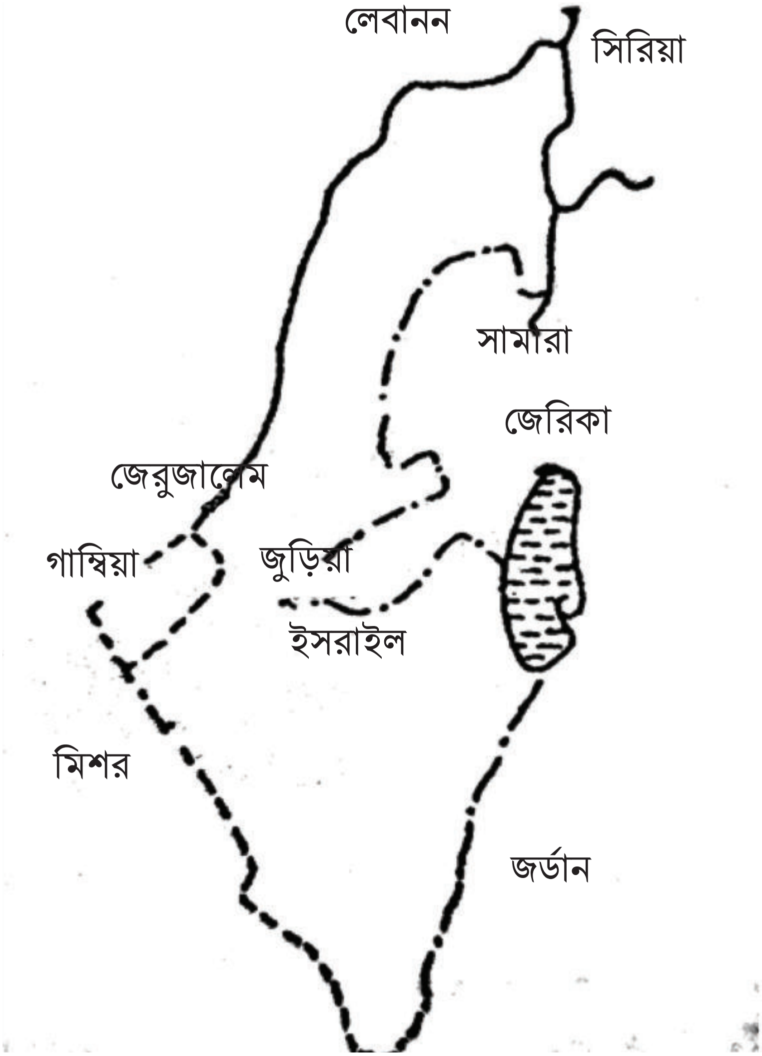

প্রাচীন জেরিকো (Jericho) নগরের অবস্থান

১৭৬০ সালের দিকে শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যে কারিগরি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল তা আধুনিক নগরায়ণের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক উন্নতির ফলে কৃষিতে শ্রমশক্তির চাহিদা কমে কর্মী উদ্বৃত্ত হয়। ফলে ওইসব কর্মী নতুন শিল্প শহরে স্থানান্তরে উৎসাহী হয় এবং উন্নত পরিবহণব্যবস্থা তাদের অধিকতর গতিশীল করে নগরের দিকে ধাবিত করে। আবার নগরের শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্য উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ সহজ হয়ে যায়। এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সমান তালে বিকশিত হয়। ১৯৬০ সাল নাগাদ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ নগরের বাসিন্দা ছিলেন যা ঊনবিংশ শতাব্দী শেষে বেড়ে দাঁড়ায় ৭৭ শতাংশে। আধুনিক নগরায়ণের পেছনে যেসব বিষয় ভূমিকা রাখে সেগুলো হলো-কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিল্প উৎপাদন পরিবহণ সহজতর হওয়া, গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠী বেশি আয় ও উন্নত জীবনের আশায় শহরে চলে আসা এবং বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন বাণিজ্যপথ আবিষ্কার।

আধুনিক নগরগুলোর দিকে তাকালে প্রাচীন নগরগুলোর থেকে তার কিছু পার্থক্য আমাদের চোখে ধরা পড়ে। যেমন: আধুনিক নগরগুলোতে প্রাচীন নগরের মতো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান নেই, নগরের পরিধির বিস্তৃতি ঘটেছে ও নগর অভ্যন্তরে চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে । আবার আধুনিকনগর কেন্দ্রে ব্যবসায়িক প্রাধান্য ও প্রতিযোগিতা প্রাচীন নগর গুলো থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া আধুনিক নগরগুলোতে পরিধির বিস্তৃতির পাশাপাশি উল্লম্বভাবে বিকাশও অনেক বেশি লক্ষণীয়। তবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নগরায়ণের ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শহরমুখী অভিবাসন বেশি দেখা যায়। এসব দেশে মেট্রোপলিটন ও মেগাসিটির সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে বস্তি ও বস্তিবাসীর সংখ্যা। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিকল্পিত নগরায়ণ অনুপস্থিত থাকায় যানজট, পয়োনিষ্কাশন সমস্যা, জলাবদ্ধতা প্রতিনিয়ত দেখা যায়।

নগর বসতির সম্ভাবনা ও ঝুঁকি

নগর বসতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাতে জনসংখ্যার ঘনবসতি, উন্নত অবকাঠামো এবং শিল্প ও সেবা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকবে। বিশ্বজুড়ে নগরে বসবাস করা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি যেমন উন্মুক্ত হচ্ছে নতুন সম্ভাবনা; আবার একই সঙ্গে তৈরি হচ্ছে নানা ঝুঁকি। টেকসই উন্নয়নের জন্য নগর বসতির নানা সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট ঝুঁকিকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

নগর বসতির সম্ভাবনা

১। অর্থনৈতিক সম্ভাবনা: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হলো নগর। যার ফলে নগর বসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বাজার, শিল্প, সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। এতে সেখানে বসবাস করা লোকের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি হয়। গ্রাম থেকে লোকজন উন্নত কর্মসংস্থানের আশায় শহরমুখী হয়।

২। উন্নত নাগরিক সেবা প্রাপ্তি: নগর বসতি মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা, শিক্ষাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তি গ্রামের তুলনায় অধিক নিশ্চিত করতে পারে।

৩। অবকাঠামোর উন্নয়ন: নগর বসতি বা শহরে গ্রামের তুলনায় উন্নত অবকাঠামো, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, পানি বা পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকায় নগরবাসী বেশি সুবিধা ভোগ করে থাকে।

৪। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য: বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন নগর বসতিতে এসে একত্রিত হয়। যার ফলে তাতে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা বা গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হয় এবং সবার ভিত্তিতে এক উন্নত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এভাবে যে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তা মানুষের সামাজিক সহনশীলতা ও অন্যকে বুঝতে পারার ক্ষমতা তৈরিতে কাজ করে।

৫। উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির বিকাশ: মানুষের নানা প্রয়োজন মেটানোর জন্য নগর বসতিগুলো উদ্ভাবন, গবেষণা এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

নগর বসতির ঝুঁকি

নগর বসতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নানা রকম ঝুঁকি তৈরি করে। অধিক জনঘনত্বের কারণে নগর বসতিতে অবকাঠামো ও যাতায়াত ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টি হয় যা মানুষের জীবনমান কমিয়ে দেয় এবং তার কর্মক্ষমতা হ্রাস করে। অধিক জনসংখ্যার কারণে মানুষের আবাসন সুযোগ কমে যায় এবং আবাসন বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। যার দরুন গৃহহীন এবং বস্তিতে বসবাস করা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করে। নগর বসতি তৈরি করতে একদিকে যেমন কৃষিজমি, বনভূমি বা অন্য যেকোনো প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করতে হয়, আবার মানুষ বেশি থাকায় এটি পরিবেশকে নানাভাবে দূষিত করে। যানবাহন বা কলকারখানার মাধ্যমে বায়ু, শব্দ, মাটি, পানি ব্যাপকভাবে দূষিত হয় যা পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এছাড়া নগরবসতিতে ভারসাম্যহীনভাবে সম্পদ ও ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের ফলে সম্পদের অবক্ষয় হয়। অধিক লোকজন অল্প জায়গায় বসবাস করার ফলে অনেক সময় অপরাধপ্রবণ লোকজন নগর বসতিতে জায়গা করে নেয় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়।

নগর বসতির এসব ঝুঁকি কমিয়ে সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন কার্যকর নগর-পরিকল্পনা, টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ, বৈষম্য কমানোর জন্য সামাজিক উদ্যোগ এবং নগর বসতি উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ। তবে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে নগর বসতির জন্য এসব নিশ্চিত করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠেনা।

গ্রামীণ বা নগর বসতি যা-ই হোক না কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব গড়ে উঠেছে। আর যেকোনো বসতি গড়া মানেই তা প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের হস্তক্ষেপে তৈরি। এ কারণেই মানব বসতি নির্মাণকে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদন পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হিসেবে ধরা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সারা বিশ্বে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ধরন সম্পর্কে জানতে পারলাম। তবে ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তন একটি বহুমাত্রিক জটিল প্রক্রিয়া। নানাবিধ বিষয় এর সঙ্গে জড়িত এবং এর স্বরূপ বৈচিত্র্যময়। পরবর্তী অংশে আমরা ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জানব।

ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের কারণ

ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের কারণগুলো বেশ জটিল ও একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত বা অনেক সময় একটি আরেকটি দ্বারা প্রভাবিত। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের দৃশ্যমান কারণ হিসেবে আমরা অবকাঠামো নির্মাণ (রাস্তাঘাট, বাজার, ঘরবাড়ি), কৃষি সম্প্রসারণ এবং বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহের কথা বলতে পারি। তবে মূল কারণগুলোকে আমরা নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি।

(ক) বায়োফিজিক্যাল কারণ: এর মাধ্যমে মূলত ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের প্রাকৃতিক সক্ষমতা বা পরিবেশের এমন একটি অবস্থা বোঝানো হয়, যা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য সহায়ক। পরিবেশের জৈব ও অজৈব উভয় ধরনের উপাদান এখানে ভূমিকা রাখে। জলবায়ু, মাটি, শিলার গঠন বৈশিষ্ট্য, ভূসংস্থান, ভূমির বন্ধুরতা, পানিপ্রবাহ, গাছপালা ইত্যাদি বায়োফিজিক্যাল উপাদান ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

(খ) অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত কারণ: ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে অর্থনৈতিক কারণ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। ১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় সাড়ে সাত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যসহ অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়ন করতে হয়েছে। বাজার অর্থনীতির বিকাশ ও প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষকে বিভিন্ন ভূমি ব্যবহারের সম্ভাবনা ও ঝুঁকি শনাক্ত করতে সাহায্য করছে এবং এভাবে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে মানুষ নানান লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল করেছে ফলে ভূমি ব্যবহারের ধরনে নানা পরিবর্তন এসেছে।

(গ) জনমিতিক কারণ: জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনমিতিক বৈশিষ্ট্য কোনো এলাকার ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কারণ, অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, আবাসনসহ নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য মানুষকে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে হয়। যেমন: অতিরিক্ত মানুষের প্রয়োজন মেটাতে কৃষিজমি ও পতিত জমিকে ঘরবাড়ি তৈরির কাজে ব্যবহার করতে হচ্ছে। আবার বনভূমি কেটে কৃষিসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহারে প্রবণতাও বেড়েছে । আবার কোনো দেশের মানুষের শিক্ষা, দক্ষতা, শহর বা গ্রামে বাস করাসহ অন্যান্য আর্থসামাজিক বৈশিষ্ট্য তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরন নির্ধারণ করে বলে আমরা বলতে পারি জনমিতিক নানা বৈশিষ্ট্য ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় কৃষিভিত্তিক সমাজে ভূমির উপর মানুষের নির্ভরতা শিল্পোন্নত দেশের মানুষের চেয়ে কম হবে। তাই বাংলাদেশের মতো জনবহুল কৃষিনির্ভর দেশে পাহাড় বা বনভূমি উজাড় করে তাতে কৃষিকাজ বা ঘরবাড়ি নির্মাণ করতে দেখা যায়। ইংল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ, জনমিতিবিদ এবং ধর্মযাজক টমাস রবার্ট ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে যে 'জনসংখ্যা তত্ত্ব' প্রদান করেন তাতে বলা হয়েছে 'খাদ্যশস্যের উৎপাদন যখন গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায়, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে'। এ তত্ত্ব সৃষ্টিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর ফলে ভূমি ব্যবহারের উপর যে চাপ সৃষ্টি হয় তা গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা হিসেবে কাজ করেছে।

(ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক কারণ: ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের জন্য জনমিতিক, অর্থনৈতিক কিংবা প্রযুক্তিগত বিষয়ের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে রাজনৈতিক, আইনগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলো সরকার। ব্যক্তি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অনেক বেশি। সরকারি নীতিমালা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে সর্বব্যাপী ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, সরকার বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি প্রদান, আর্থিক প্রণোদনা, শিল্পায়ন, রপ্তানি এবং অবকাঠামোর উন্নয়নের নীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখে। আবার ভূমি, শ্রম, মূলধন ও প্রযুক্তি যোগান দিতে সরকার প্রণীত স্থানীয় ও জাতীয় নীতিমালা কার্যকরভাবে ভূমিকা রাখে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনে সরকারের কৃষি, বন ও বন্য প্রাণী রক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আর্থিক নীতিমালা অনেক বেশি প্রভাব ফেলে।

(ঙ) সাংস্কৃতিক কারণ: অসংখ্য সাংস্কৃতিক বিষয় ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যেমন: মানুষের আচরণ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং অভিব্যক্তি। এই বিষয়গুলো আবার মানুষের রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারীর অবস্থান, নৃ-গোষ্ঠী, দরিদ্র পরিবার এগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করা নৃ-গোষ্ঠীগুলোর জীবনযাপন প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানকে তুলে ধরে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে প্রকৃতি যেভাবে আছে, তাকে সেভাবে রক্ষার একটি অভ্যাস গড়ে ওঠে। অনেক সময় বৃক্ষপ্রেমী মানুষ নানা জাতের গাছ লাগিয়ে পুনঃবনায়ন বা সামাজিক বনায়ন গড়ে তোলেন। বিপরীতভাবে নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির কারণে কিছু মানুষ বনের বিনাশ করে এবং ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের ফলাফল

ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য মূল কারণ মানুষের নানা প্রয়োজন বেড়ে যাওয়া ও প্রয়োজনের ধরনে পরিবর্তন। মানুষ যে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন আনবে, সেটাই আজ বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ পরিবর্তন মানুষের জন্য আপাত প্রয়োজন মেটালেও অনেক ক্ষেত্রে তার নানা নেতিবাচক প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। নিম্নে ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনের প্রভাবগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. বনজ উৎপাদন যেমন খাদ্য, পশু খাদ্য, তন্তু এবং কাঠের উৎপাদন হ্রাস পাওয়া। এর সঙ্গে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি যোগ রয়েছে।

২. রোগবালাইয়ের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি;

৩. বায়ু দূষণ, গ্রিণ হাউজ গ্যাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব বৃদ্ধি;

৪. কৃষি বৈচিত্র্য এবং জীববৈচিত্র্য হারানো;

৫. মাটির গুণ বিনষ্ট হওয়া;

৬. মানুষের মাধ্যমে পরিবেশ অবক্ষয়ের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি;

৭. মিঠাপানির সংস্থান, সেচ ও উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষায় ঝুঁকি বৃদ্ধি।

এসবের বাইরেও আচ্ছাদনের পরিবর্তনে অপরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার ও নানা পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। যেমন: ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, পাহাড়ধস, মাটির ক্ষয়, নদীভাঙন, নদী ভরাট হয়ে বন্যা বৃদ্ধি পাওয়াসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

তবে উল্লিখিত নানা ধরন ও মাত্রার ঝুঁকি ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও এর সঙ্গেই আবার মানুষের উদ্ভাবন, প্রাকৃতিক সম্পদকে মানবকল্যাণে ব্যবহার ও বিশাল জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবন প্রাপ্তির বিষয়টি জড়িত। কারণ, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃতি নির্ভর কষ্টকর জীবন-যাপন থেকে আজকের অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও আরামদায়ক জীবন সৃষ্টি করতে পেরেছে। এজন্য ভূমিকা রেখেছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত আবাসন, নগরায়ণ, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিল্পায়ন ইত্যাদি। আর এসবই এসেছে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তনের মাধ্যমে। তাই ভূমি ব্যবহার ও আচ্ছাদনে পরিবর্তনের সম্ভাবনার তালিকাও বেশ দীর্ঘ। মোটা দাগে বলতে গেলে এ পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ যেসব সুযোগ তৈরি করতে এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে যেতে পারছে সেগুলো হলো–

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে পারছে;

২. নগরায়ণ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প স্থানে অধিক মানুষের বসবাস ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;

৩. মানুষের প্রয়োজনে একমুখী ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তে তার নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার করা যাচ্ছে;

৪. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় ভারসাম্য সৃষ্টি, শিক্ষা ও জ্ঞান সৃজন, বিতরণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নয়ন হয়েছে;

৫. ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈরী পরিবেশে মানুষের টিকে থাকার সামর্থ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তবে ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভাবনার যেসব দিক উন্মোচিত হয়েছে তার প্রায় সবই মানবজাতির কল্যাণের কথা বিবেচনা করে মানুষের দ্বারা তৈরি। আর সৃষ্ট ঝুঁকিসমূহ আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতির কারণ হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যা আজ প্রাকৃতিক পরিবেশ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য ঝুঁকির সৃষ্টি করছে, তা অদূর ভবিষ্যতে মানুষের জন্য সরাসরি ঝুঁকি তৈরি করবে। এর অর্থ হলো, যা প্রকৃতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তা যে কোনো সময় মানুষের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ, মানুষ প্রকৃতিরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাটি, পানি, ক্রান্তীয় ও মৌসুমি আবহাওয়া আর পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে এদেশকে করেছে অপার সম্ভাবনাময়। আমাদের উর্বর কৃষিজমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষের সুযোগ, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষ, অবারিত সমুদ্রের সম্পদ আহরণ আর নৌপরিবহণ ও

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

বাণিজ্যের সুবিধা আমাদের দেখাচ্ছে সোনালি ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। তবে এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে গিয়ে আমাদের সীমিত ভূমি, অধিক জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণের মতো চ্যালেঞ্জ গুলোকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যার জন্য আমাদের প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি, সমন্বিত আর সামষ্টিক পরিকল্পনা যা এসব চ্যালেঞ্জগুলোকে বিবেচনা করে টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ, যার জন্যও আমাদের প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা। তাই এসব বিষয়কে বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan-2100)' নামে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে ও তার বাস্তবায়নে কাজ করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ পরিকল্পনার বিষয়ে বলেছেন- 'আগামী ১০০ বছরে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাই বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০। ২১০০ সালে বাংলাদেশকে যেভাবে গড়তে চাই, সেভাবেই আমরা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি'।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ একটি দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এর বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত, বিস্তৃত ও দীর্ঘমেয়াদি ব-দ্বীপ রূপকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। রূপকল্পটি হলো- 'নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা। আর ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর অভিলক্ষ্য হলো– 'দৃঢ়, সমন্বিত ও সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল কার্যকর কৌশল অবলম্বন এবং পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সংগত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করে দীর্ঘমেয়াদে পানি ও খাদ্যনিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ'।

অভীষ্ট বা লক্ষ্য: ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-তে উচ্চতর পর্যায়ের তিনটি জাতীয় অভীষ্ট এবং ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট ছয়টি নির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ সংশ্লিষ্ট অভীষ্টগুলো উচ্চতর পর্যায়ের অভীষ্ট অর্জনে অবদান রাখবে।

উচ্চ পর্যায়ের অভীষ্টসমূহ–

অভীষ্ট ১: ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ;

অভীষ্ট ২: ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন; এবং

অভীষ্ট ৩: ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন।

ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর নির্দিষ্ট অভীষ্টসমূহ -

অভীষ্ট ১: বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

অভীষ্ট ২: পানির নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

অভীষ্ট ৩: সমন্বিত ও টেকসই নদী অঞ্চল এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;

অভীষ্ট ৪: জলাভূমি ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ এবং সেগুলোর যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

অভীষ্ট ৫: অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সংগত সুশাসন গড়ে তোলা; এবং

অভীষ্ট ৬: ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের দেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সবাইকে সম্মিলিতভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

আমাদের করণীয়:

উপরের অংশগুলো থেকে এটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, ভূমি ব্যবহার ও ভূমি আচ্ছাদনে পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া এবং মানুষের সংখ্যা এবং তাদের প্রয়োজনের তালিকা যত বৃদ্ধি পাবে এ পরিবর্তনও তত বেশি ত্বরান্বিত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। এটি যেহেতু কোনো একক রাষ্ট্র বা কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং এ পরিবর্তন যেহেতু মানুষের জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত তাই সমগ্র মানব জাতিকেই এর প্রভাব নিয়ে ভাবতে হবে। সকল রাষ্ট্রকেই ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তনকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই এবং প্রকৃতিবান্ধব উপায়ে করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে এসব নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কি না, তা দেখতে হবে। আবার যাদের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে সেসব মানুষকে সচেতন ও দায়িত্বশীল করতে হবে। তাহলেই সহনশীল ও টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। একটি বিষয় আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, পৃথিবী শুধু মানুষের জন্য নয় বরং পৃথিবীর হাজারো জীবের মধ্যে মানুষ একটি। মানুষকে তার বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানব কল্যাণের পাশাপাশি প্রকৃতির ভারসাম্যপূর্ণ, সহনশীল, টেকসই আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। মানুষকে বুঝতে হবে যে, প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং নিজেকে প্রকৃতি ও পরিবেশের অংশ ভেবে তাকে সংরক্ষণে নানা ভূমিকা গ্রহণও তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অংশ। তাই ব্যক্তি পর্যায়ে ভূমি ব্যবহার নিয়ে আমাদের সচেতন থেকে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা করতে হবে এবং কমিউনিটি পর্যায়ে টেকসই ও সহনশীল উন্নয়নের ধারণা ও অনুশীলন বাস্তবায়ন করতে হবে।

সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও সমতার নীতি

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা নিজ এলাকার কয়েকটি অর্থনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করব। এরপর সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনটি সামাজিক প্রেক্ষাপট নির্ভর এবং কোনটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নির্ভর তা নির্ণয় করব। এরপর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত অর্থনীতির বিভিন্ন তত্ত্ব অনুসারে এলাকার সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রজেক্ট বেছে নিব। সেই প্রজেক্ট বাস্তবায়নে কী কী সম্পদ প্রয়োজন এবং এই সম্পদ উৎপান, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের উপায় নির্ধারণ করব। সেই সাথে এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন হলে সমাজের বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির মানুষের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ধারণ করব। এরপর আমরা একটি মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে সেখানে আমাদের প্রজেক্ট উপস্থাপন করব। সবশেষে একটি রিপোর্ট তৈরি করে জমা দিব।

দলগত কাজ ১

আমরা ৫ থেকে ৬ জন একই এলাকার সহপাঠী মিলে একটি দল গঠন করি। এরপর আমরা দলে আলোচনা করে আমাদের এলাকার কিছু অর্থনৈতিক সমস্যা নির্ণয় করি। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনটি সামাজিক প্রেক্ষাপট-নির্ভর এবং কোনটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট-নির্ভর তা নির্ধারণ করি।

সামাজিক প্রেক্ষাপট-নির্ভর সমস্যা	রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট-নির্ভর সমস্যা

এই সমস্যাগুলো আমরা অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান করার চেষ্টা করব। চলো, তাহলে আমরা এখন অর্থনীতির কিছু বিষয় সম্পর্কে জানি।

কিছু বিষয় জেনে নিই

যখন কোনো দ্রব্য বা পণ্য উপযোগ বা ভোক্তার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়, তখন তাকে উৎপাদন বলা যায়। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পৃক্ত। একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। একজন কৃষক যখন চাল উৎপাদন করেন, তখন তিনি চাল বিক্রির জন্য সম্ভাব্য ভোক্তা নির্ধারণ করেন। ভোক্তা হচ্ছেন যিনি চাল ক্রয় করবেন। এরপর তিনি উৎপাদিত চাল নির্দিষ্ট মূল্যে বাজারে বিক্রি করেন। চাল বাজারে নিয়ে গিয়ে ভোক্তার (যিনি চাল কিনবেন) কাছে পৌঁছান। যাকে বণ্টন বলা যায়। সেই সঙ্গে চাল মজুদ রাখার জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ: উৎপাদনের উপাদান বা উপকরণ চারটি।

১. মূলধন (Capital)
২. ভূমি (Land)
৩. শ্রম (Labour)
৪. সংগঠন (Organization)।

উদাহরণ: একটা পাউরুটি উৎপাদন করতে কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয় তা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখব পাউরুটি উৎপাদন করার একটি কারখানা থাকতে হবে। এই কারখানাকে আমরা মূলধন (Capital) বলতে পারি। এরপর পাউরুটি তৈরির কাঁচামাল গম যা থেকে ময়দা পাওয়া যায়। এই গম প্রকৃতি থেকে বা ভূমি (Land) থেকে চাষাবাদের মাধ্যমে পাওয়া যায়। পাউরুটি তৈরি করতে শ্রমিকও প্রয়োজন। শ্রমিক থেকে আমরা শ্রম (Labour) পেয়ে থাকি। কোনো উৎপাদনের বেশির ভাগ শ্রম দ্বারা তৈরি হয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন সংগঠন (Organization)। পাউরুটি তৈরি করতে একজন উৎপাদক বা মালিক বা সংগঠক লাগে। তিনি উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ ভূমি, মূলধন এবং শ্রমকে কাজে লাগিয়ে পাউরুটি তৈরি করেন। যার উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণ বেশি তার আয় বেশি।

আমরা টিভি চ্যানেলে অনেক সময় অর্থনীতিবিষয়ক সংবাদ দেখে থাকি। এ রকম দুটি সংবাদ সম্পর্কে আমরা জেনে নিই।

সংবাদ শিরোনাম: এক তরুণ উদ্যোক্তার সফলতার কাহিনি

প্রিয় দর্শক, সংবাদে এখন থাকছে একজন সফল তরুণ উদ্যোক্তার সফলতার পেছনের কাহিনি। জাহাঙ্গীর আলম, তিনি একজন তরুণ উদ্যোক্তা। তিনি যখন মাধ্যমিক শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী, তখন স্কুলের পাঠ্যবইতে পরিবেশ সংরক্ষণের উপায় নিয়ে কাজ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন কীভাবে ব্যবহৃত প্লাস্টিককে পরিবেশবান্ধব উপায়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। তাই তখন সিদ্ধান্ত নেন ব্যবহৃত ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের জিনিস পুনরায় ব্যবহার করার একটি ব্যবসা দাঁড় করাবেন। তাই পড়াশোনা শেষে তিনি এই ব্যবসা শুরু করেন। সহপাঠী চার বন্ধু মিলে গড়ে তুললেন একটি সংগঠন। খুব কম মূলধনে মাঠে নেমে পড়লেন এবং মাত্র পাঁচ বছরে ভালো মুনাফা লাভ করলেন। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই ব্যবসার মাধ্যমে তিনি নিজের আয় বৃদ্ধি ও সমাজের কল্যাণ দুইদিকেই অবদান রাখতে পারছেন।

সংবাদ শিরোনাম: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা

প্রিয় দর্শক, এবার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প-সম্পর্কিত কিছু তথ্য আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সেখানে উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করার কথা বলেছেন। তারা জনসাধারণের মধ্যে এই মৃৎশিল্পকে জনপ্রিয় করার জন্য সরকার ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন । সেইসঙ্গে সঠিক প্রচারণা করা হলে এই শিল্প বর্হিবিশ্বের ভোক্তাদের মধ্যেও ব্যাপক চাহিদা তৈরি করতে পারবে বলে উদ্যোক্তারা আশা ব্যক্ত করেন।

অনুশীলনী কাজ ১: উপরের দুটি সংবাদের মধ্যে আমরা কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি? চলো, আমরা দলগতভাবে পার্থক্যগুলো খুঁজে বের করি।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

এক তরুণ উদ্যোক্তার সফলতার কাহিনি	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে মৃৎশিল্পের সম্ভাবনা

আমরা পার্থক্য লেখার সময় হয়তো ভেবেছি, একটি সংবাদে একজন তরুণ উদ্যোক্তার কথা বলা হয়েছে। তার সংগঠন, মূলধন ও মুনাফার কথা বলা হয়েছে। অপর সংবাদটিতে বাংলাদেশের মৃৎশিল্পের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। যেমন: একজন উদ্যোক্তা বা ফার্মের মালিক কী উৎপাদন করবেন, কীভাবে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেবেন, কতটুকু উৎপাদন করবেন, দাম কীভাবে নির্ধারিত হবে, উপকরণের জন্য কী পরিমাণ ব্যয় করবেন, কী কী উপকরণ ব্যবহার করবেন ইত্যাদি ছোটো ছোটো সিদ্ধান্ত ব্যষ্টিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত। একজন ভোক্তার কোনো দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। তাই প্রথম সংবাদটিকে আমরা ব্যষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি।

অপরদিকে, জাতীয় অর্থনীতির বিষয়গুলো সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। মোট ভোগ, মোট সঞ্চয়, মোট বিনিয়োগ, মোট উৎপাদন, সাধারণ দামস্তর ইত্যাদি সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। তাই দ্বিতীয় সংবাদটি সামষ্টিক অর্থনীতির উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির আরো একটি উদাহরণ: ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলতে কোনো একটি শিল্পের ছোটো/ক্ষুদ্র একটি ইউনিট বোঝায়। যেমন: অনেকগুলো পাটকল নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পাট শিল্প। এই ধরনের একটি পাটকলের উৎপাদন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ড ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচনার বিষয়। যেমন: আমিন জুট মিলসের উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে আমরা ব্যষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব ।

আবার যখন সকল পাটকল বা পাটশিল্প নিয়ে একত্রে বা সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব তখন তা সামষ্টিক অর্থনীতি হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন: বাংলাদেশের পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ , এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের মজুরি, দাম এবং উৎপাদন এই বিষয়গুলো সামষ্টিক অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

অর্থনৈতিক এজেন্টস (যেমন: ভোক্তা, উৎপাদক, ব্যক্তি, পরিবার, ফার্ম, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় ব্যাংক)) এবং তাদের আচরণগত ধরনের ওপর ভিত্তি করে আমরা অর্থনীতিকে দুইভাগে ভাগ করতে পারি।

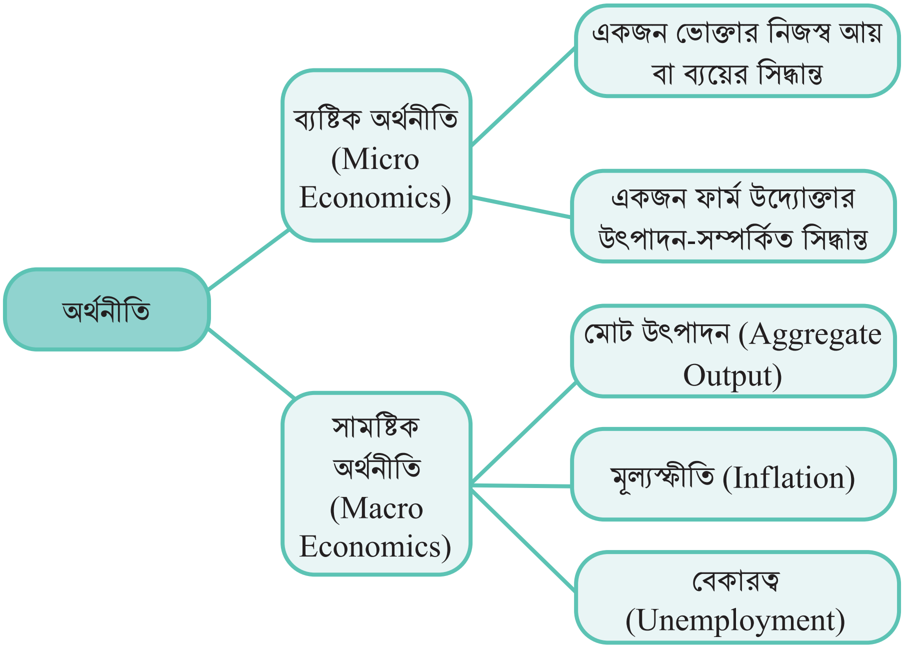

চিত্রঃ ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতি

দলগত কাজ ২

এখন আমরা দলগতভাবে নিজ এলাকার অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর কোনটি ব্যষ্টিক ও কোনটি সামষ্টিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত তা নির্ণয় করি।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি	সামষ্টিক অর্থনীতি

নিচের পত্রিকার রিপোর্টটি আমরা পড়ে নিই।

বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পড়েছে। বর্তমানে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় পরিবহণ মালিকেরা জনপ্রতি সিট ভাড়া বাড়িয়েছে। এতে করে সাধারণ মানুষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। অন্যদিকে পরিবহণ মালিকদের দাবি জ্বালানি তেল ক্রয়, কর্মচারীর বেতন ও পরিবহণ মেরামত বাবদ এখন তাদের খরচ বেড়েছে আগের চেয়ে দ্বিগুণ। তাই তারা বাধ্য হচ্ছেন যাত্রীভাড়া বাড়াতে। অন্যদিকে যাত্রীদের মতামত– জ্বালানি তেলের যে পরিমাণ দাম বেড়েছে সে অনুপাতে অনেক বেশি ভাড়া বাড়িয়েছে পরিবহণ মালিকেরা। এজন্য অর্থনীতিবিদগণ সরকারের যথাযথ নজরদারির গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আমরা খেয়াল করলে দেখব এখানে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর প্রভাব বর্ণনায় পরিবহণ মালিক, যাত্রী ও অর্থনীতিবিদের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। যখন জ্বালানি তেলের ঊর্ধ্বগতি এবং বাংলাদেশের পরিবহণ মালিক ও যাত্রীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়, তখন সেটি ইতিবাচক অর্থনীতি (Positive Economics) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বা কর্মকাণ্ড কেমন হওয়া উচিত বা অনুচিত ইত্যাদি বিষয়ে যখন কোনো অর্থনীতিবিদের বক্তব্য বা আলোচনা করা হয়ে থাকে তা নীতিবাচক অর্থনীতির (Normative Economics) আওতাভুক্ত। তাই এখানে অর্থনীতিবিদরা সরকারের যথাযথ নজরদারির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার জন্য যা বলেছেন, সেটি নীতিবাচক অর্থনীতি।

দলগত কাজ ৩

এখন আমরা দলগতভাবে নিজ এলাকার অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর কোনটি ইতিবাচক অর্থনীতি ও কোনটি নীতিবাচক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত তা নির্ণয় করি।

ইতিবাচক অর্থনীতি	নীতিবাচক অর্থনীতি

এখন চলো, আমরা একটি গল্প পড়ি

একজন কৃষকের কয়েক বিঘা জমি আছে। তিনি অর্ধেক জমিতে ধান ও বাকি অর্ধেকে সবজি চাষ করবেন। ধান থেকে যে চাল হয়, তার তিন ভাগের এক ভাগ তিনি নিজের সংসারের জন্য রেখে দিয়ে বাকি অংশ বিক্রি করেন। এভাবেই কয়েক বছর চলে গেল। কোনো এক বছর ধানবীজের দাম বাড়ায় তিনি ধান চাষ কমিয়ে দিয়ে সবজির চাষ করলেন বেশি করে। এর পরের বছর ধানবীজের দাম কমায় তিনি ধান চাষ বাড়িয়ে দিয়ে সবজি চাষ কমালেন। এই বছর তিনি চিন্তা করলেন ধান ও সবজি দুটোই বেশি করে চাষ করবেন। কিন্তু জমির পরিমাণ না বাড়ায় তিনি দ্বিধায় পড়ে গেলেন।

অনুশীলনী কাজ ২: আচ্ছা আমরা একটু ভেবে দেখি তো জমির পরিমাণ না বাড়িয়ে কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।

আমরা হয়তো আমাদের ভাবনাগুলো লিখেছি। আসলে আমরা খেয়াল করলে দেখব, আমাদের উপকরণের যোগান অসীম নয়। ভূমি, শ্রম এবং মূলধনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই কোনো দ্রব্য বেশি উৎপাদন করতে গেলে অন্য দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। কারণ, আমরা উৎপাদনের উপকরণ একই রেখে সব দ্রব্যের সম্ভাব্য সর্বাধিক উৎপাদন (efficient production) একই সঙ্গে বাড়াতে পারি না। সম্পদের স্বল্পতার কারণে। আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমিত সম্পদ থেকে আমাদের অসীম অভাব পূরণ করতে হয়। অর্থাৎ যদি কোনো দ্রব্য বা সেবাসামগ্রী উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামালের বা উপকরণের পরিমাণ বা সরবরাহ অসীম হতো, তাহলে আমরা ইচ্ছামতো দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারতাম। আমাদের কোনো অতৃপ্তি বা অপূর্ণতা থাকত না। তাহলে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো কিছু বেশি পরিমাণে পেতে হলে অন্য কিছু কম পরিমাণে পেতে হয় বা পাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। সম্পদ সীমিত হওয়ার কারণে, কোনো কাজ করা বা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মানুষকে সব সময় অন্য কোনো কাজ বা সিদ্ধান্তের সুযোগ ছেড়ে দিতে হয়। কোনো কাজ বা সিদ্ধান্তের সুযোগ ব্যয় (Opportunity cost) হলো সে কাজের জন্য মানুষ

যেই কাজ বা কাজের সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিয়েছে। যেমন: আগের গল্পে আমরা দেখেছি, কৃষক উৎপাদনের সীমিত উপকরণ দিয়ে বেশি ধান উৎপাদন করতে চাইলে তাকে সবজির উৎপাদনের সুযোগ কমিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে বেশি ধান উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় হলো কমিয়ে দেওয়া সবজির উৎপাদন। আরেকটি উদাহরণ দিয়ে সুযোগ ব্যয়ের ধারণা স্পষ্ট করা যায়। ধরো, তোমার কাছে ২০০ টাকা আছে। তুমি জানো, ২০০ টাকা দিয়ে তুমি একটি বই কিনতে পারবে অথবা বন্ধুরা মিলে কোনো জায়গায় ঘুরতে যেতে পারবে। তুমি যদি ২০০ টাকা দিয়ে বই কেনার সিদ্ধান্ত নাও , তাহলে ঐ বইয়ের সুযোগ ব্যয় হবে ঘুরতে যাওয়া। আবার তুমি যদি ২০০ টাকা দিয়ে ঘুরতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ ব্যয় হবে একটি বই।

চিত্র: পাট উৎপাদনে কৃষক

চিত্র: ধান উৎপাদনে কৃষক

মনে করি, কোনো কৃষক তার উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ ভূমি (কৃষিজমি), শ্রম এবং মূলধন (যন্ত্রপাতি) ব্যবহার করে দুটি দ্রব্য উৎপাদন করেন– ধান ও পাট। আমরা আগে দেখেছি, সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করে একটি দ্রব্য (ধরি ধান) বেশি উৎপাদন করতে চাইলে অন্য দ্রব্য (ধরি পাট) কম উৎপাদন করতে হয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দেখায়, সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহার করে দুটি দ্রব্যের (এই উদাহরণে ধান ও পাট) সম্ভাব্য সর্বাধিক উৎপাদনের পরিমাণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ। বোঝার সুবিধার্থে ধরে নিই, ধান ও পাটের উৎপাদনের পরিমাণের ছয়টি সংমিশ্রণ সম্ভব। উৎপাদনের এই ছয়টি সংমিশ্রণ, চিত্রে যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়, সেই রেখাকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বলে।

টেবিল-উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ও সুযোগব্যয়

সম্ভাবনা	পাট (লক্ষ টন)	ধান (লক্ষ টন)	সুযোগব্যয় (লক্ষ টন)
A	০	২৫	-
B	১	২৪	১
C	২	২২	২
D	৩	১৮	৪
E	৪	১০	৮
F	৫	০	১০

কৃষক যদি শুধু ধান উৎপাদন করেন, তাহলে তো হবে না কারণ, কিছু পাট উৎপাদন করাও প্রয়োজন। তাই ধান উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত জমি বা ভূমি রয়েছে, সেখান থেকে কিছু জমি কৃষক পাট উৎপাদনে ব্যবহার করবেন এবং অন্যান্য উপকরণও পাট উৎপাদনের জন্য স্থানান্তর করব। এভাবে কৃষক ধান ও পাটের অনেকগুলো উৎপাদন-সমাহার পেতে পারেন যা উপরের টেবিলে A,B,C,D,E এবং F-এর সাহায্যে সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে।

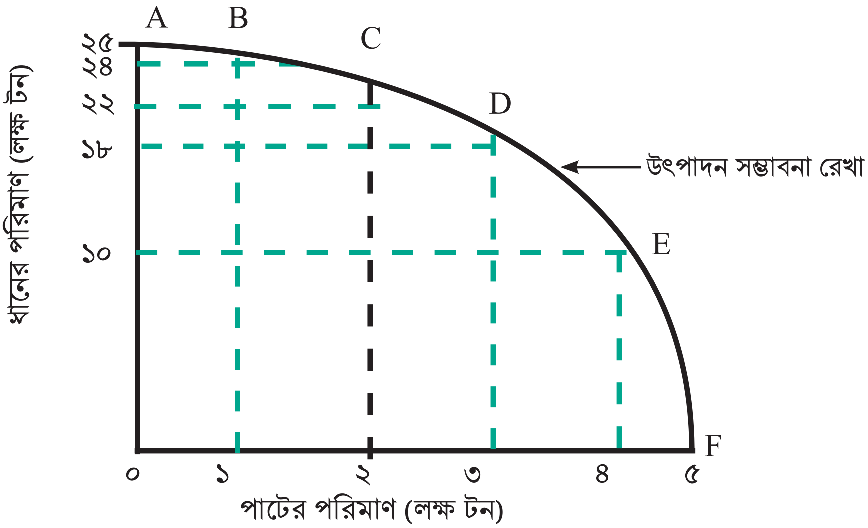

চিত্র: ধান ও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

চিত্র-১ এ ধান ও পাটের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখায় সকল উৎপাদন সমাহার দেখানো হয়েছে। এখানে, A, B, C, D, E এবং F উৎপাদনের ছয়টি সংমিশ্রণ উৎপাদন রেখার উপর দেখানো হয়েছে। উৎপাদন-সম্ভাবনা রেখার ঢাল ঋণাত্মক। এই ঢালটি সুযোগ ব্যয় নির্দেশ করে। অর্থাৎ পাটের উৎপাদন বাড়াতে গেলে ধানের উৎপাদন কমাতে হয়। সকল উৎপাদনের উপকরণ বা সম্পদ ধান উৎপাদনে ব্যবহৃত হলে সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টন ধান উৎপাদন সম্ভব হয়। চিত্রে এটি A সমন্বয় বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে । এখন ধরা যাক, উৎপাদনকারী ১ লক্ষ টন পাট উৎপাদন করতে চায়। যেহেতু A বিন্দুতে সব উপকরণ নিয়োজিত রয়েছে, তাই পাট উৎপাদনের জন্য কমপক্ষে যতটুকু উপকরণের প্রয়োজন তা ধানের উৎপাদন থেকে সরিয়ে আনতে হবে । চিত্রে বাড়তি বা অতিরিক্ত ১ একক (১ লক্ষ টন পাট) পাট উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে পৌঁছাই, যেখানে ধানের উৎপাদন ২৪ লক্ষ টন। অর্থাৎ এক একক পাটের উৎপাদনের জন্য এক একক (এক লক্ষ টন) ধানের উৎপাদন কমাতে হয়েছে। B বিন্দু দেখাচ্ছে ২৪ লক্ষ টন ধান এবং ১ লক্ষ টন পাট। অর্থাৎ A থেকে B বিন্দুতে, ১ লক্ষ টন পাটের উৎপাদনের সুযোগ ব্যয় হলো (২৫-২৪=) ১ লক্ষ টন ধানের উৎপাদন। আমরা যতই পাটের উৎপাদন বাড়াব ততই ধানের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে। চিত্রে B বিন্দু থেকে C বিন্দুতে ২ লক্ষ টন পাট ও ২২ লক্ষ টন ধান উৎপাদন দেখাচ্ছে। অর্থাৎ বাড়তি ১ লক্ষ টন পাটের জন্য ২ লক্ষ টন ধান উৎপাদন কমাতে হবে। এভাবে C থেকে D এবং D বিন্দু থেকে E বিন্দুতে বিভিন্ন উৎপাদন সম্ভাবনা পাব। F বিন্দুতে ৫ লক্ষ টন পাটের জন্য ধানের উৎপাদন শূন্য হবে। এক্ষেত্রে সমস্ত সম্পদ পাট উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হবে। তখন সকল উপকরণের সাহায্যে ৫ লক্ষ টন পাট উৎপাদন সম্ভব। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদন করতে চাইলে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন সর্বোচ্চ কত হওয়া সম্ভব তা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে জানা যায়।

প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং উৎপাদনের উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ডান দিকে স্থানান্তরিত হয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপর যেকোনো বিন্দুকে দক্ষ উৎপাদন আর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভেতরে যেকোনো বিন্দু অদক্ষ উৎপাদন হিসেবে বিবেচনা করা হয় । উৎপাদন সম্ভাবনার রেখার বাইরে কোনো বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভব নয়; কারণ, সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে।

রাষ্ট্রেরও সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ফলে সব উন্নয়ন কাজ একসঙ্গে হাতে নেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প বা কাজকে নির্বাচন করা হয়। যেই প্রকল্প বৃহত্তর জনকল্যাণের সঙ্গে জড়িত সেটিই, আগে বিবেচনা করা হয়। উদ্যোক্তা বা ভোক্তার ক্ষেত্রেও সম্পদের (মূলধন বা আয়) সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কাজ নির্বাচন করতে হয়।

দলগত কাজ ৩

আমরা দলগতভাবে এলাকার অর্থনৈতিক যে যে সমস্যা নির্ধারণ করেছি, তা সমাধানের জন্য কী কী কাজ বা প্রকল্প হাতে নিতে পারি তা আলোচনা করব। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে জন্য অন্য কোনো কাজের সুযোগ ব্যয় হবে কি না, তা নির্ধারণ করি।

আমাদের নির্ধারিত প্রকল্প বা কাজ	অন্য কাজের সুযোগ ব্যয়

এই সুযোগ ব্যয় থেকে সিদ্ধান্ত নেব কোন প্রকল্পটি বেশি প্রয়োজনীয়। এভাবে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি প্রকল্প নির্ধারণ করব।

আমাদের তো অনেক কিছুর চাহিদা রয়েছে তাই না? কারো কম বা কারো বেশি। চলো, আমরা এখন আমাদের নিজেদের কী কী জিনিসের চাহিদা রয়েছে তা নিচের ছকে লিখে নিই। এরপর পাশে বসা সহপাঠীর কাছ থেকে জেনে নিই তার কোন জিনিসের চাহিদা রয়েছে। সহপাঠীর চাহিদাগুলোও নিচের ছকে লিখে নিই।

অনুশীলনী কাজ ৩: আমার ও আমার সহপাঠীর যে জিনিসের চাহিদা রয়েছে

আমার যে জিনিসের চাহিদা রয়েছে	আমার সহপাঠীর যে জিনিসের চাহিদা রয়েছে

আমরা হয়তো লক্ষ্য করেছি আমাদের নিজের চাহিদা ও সহপাঠীদের চাহিদার মধ্যে কম-বেশি পার্থক্য রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে দুজনের পণ্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন। তাই চাহিদার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা।

অনুশীলনী কাজ ৪: আমাদের যেসব জিনিসের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো বাসা বা স্কুলের কাছাকাছি নিরাপদ দূরত্বে কোনো দোকানে বা বাজারে ক্রয় করা যায়, তার তালিকা করি। সেই দোকানে বা বাজারে গিয়ে আমরা পণ্যগুলোর দাম জেনে নিই।

যে পণ্যের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে	যে দামে আমি কিনতে আগ্রহী	বাজারে পণ্যটির দাম	পণ্যটি কি আমার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে?	পণ্যটি কি আমি বাজারের দামে কিনতে চাই?

দোকান বা বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমরা হয়তো বুঝতে পারছি অনেক পণ্য আছে যেগুলো ক্রয় করার সামর্থ্য আমাদের নেই। আবার অনেক পণ্য আছে যেগুলো কেনার সামর্থ্য বা ক্রয়ক্ষমতা থাকলেও আমরা বাজার দামে অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক নই। তাই চাহিদার আরো দুটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আমরা পেলাম। সেগুলো হলো ক্রয়ক্ষমতা ও ব্যয়ের ইচ্ছা।

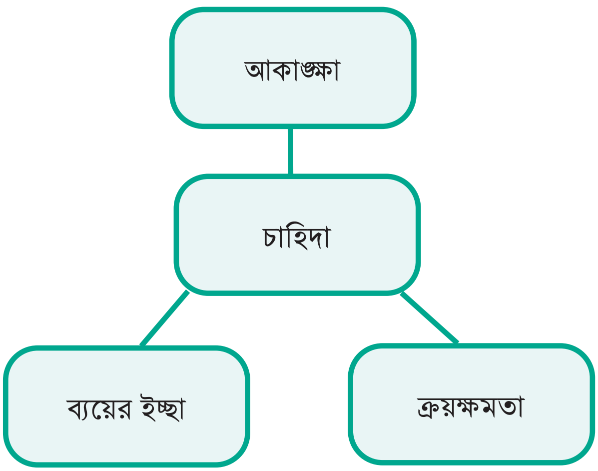

চিত্র: চাহিদার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য

আচ্ছা, আমাদের যে পণ্য বা জিনিসের চাহিদা রয়েছে, এগুলোর দাম যদি কমে যায়, তাহলে কি পণ্যের চাহিদা কমবে না বাড়বে? সাধারণত বেড়ে যাবে। কিন্তু পণ্যের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্রয়ক্ষমতাও একইভাবে বেড়ে যায়, তাহলে কী হবে? চাহিদা বাড়বেও না কমবেও না। এরকম কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো অপরিবর্তিত থাকলেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে। এই অন্যান্য অপরিবর্তিত বিষয়গুলো জেনে নিই।

১. ভোক্তার আয়

২. ভোক্তা/ক্রেতার সংখ্যা

৩. সময়

৪. আয়ের বণ্টন

৫. অন্যান্য দ্রব্য ও সেবার দাম

এক কথায়, অন্যান্য নির্ধারক স্থির থাকা অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্যের বা পণ্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে এবং দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। একেই চাহিদাবিধি হিসেবে আমরা বিবেচনা করি। অন্যান্য বিষয় যেকোনো একটির পরিবর্তন হলে চাহিদাবিধি অকার্যকর হবে।

চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখা (Demand Schdule & Demand Curve)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন দামের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন চাহিদার পরিমাণের সংমিশ্রণ যে সূচির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, তাকে চাহিদা সূচি বলে। এই চাহিদা সূচি যে রেখার মাধ্যমে বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তাকে চাহিদা রেখা বলে।

টেবিল: গমের চাহিদা সূচি

সমন্বয় বিন্দু	প্রতি কিলোগ্রামের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (হাজার কিলোগ্রাম)
A	১০	৩০
B	১১	২৫
C	১২	১১
D	১৩	৮
E	১৪	৬
F	১৫	৪

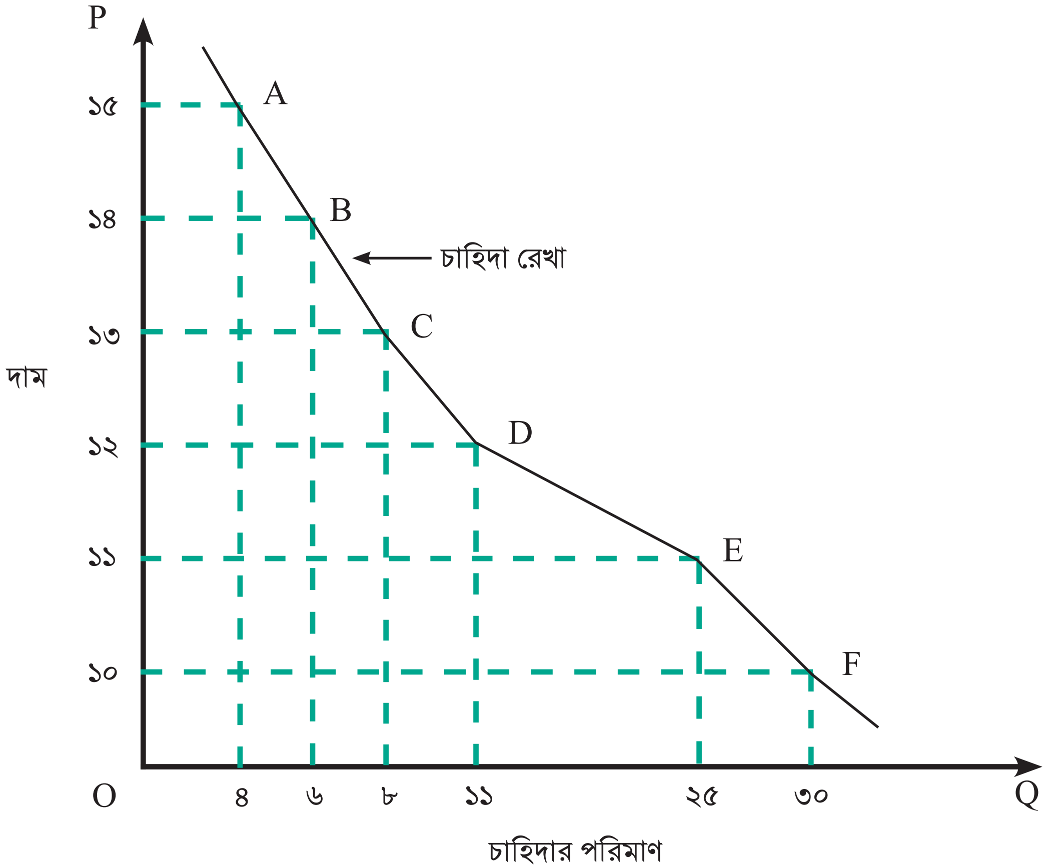

চিত্র: গমের চাহিদা রেখা

চাহিদা সূচির বিভিন্ন দামের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণের সমাহারগুলো উপরের চিত্র দ্বারা দেখানো হয়েছে। যেখানে কোনো ব্যক্তির জন্য গমের ভিন্ন ভিন্ন দামে চাহিদার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ A, B, C, D, E এবং F বিন্দু দিয়ে দেখানো হয়েছে।

উপরের চিত্র বা চাহিদা রেখা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, দাম এবং চাহিদার পরিমাণের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক। দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমবে। আবার, দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বাড়বে। তাই চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক। এখানে চাহিদা বিধি কার্যকর বিধায় দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তা বিপরীতক্রমেও সত্য। অর্থাৎ চাহিদা রেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী।

চাহিদা রেখার স্থানান্তর বা পরিবর্তন (Shifting Demand Curve)

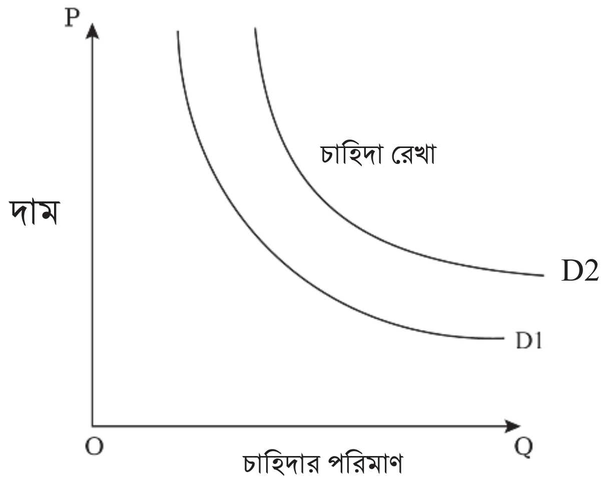

চিত্র: গমের চাহিদা রেখার পরিবর্তন

চাহিদা বিধিতে আমরা দেখেছি 'অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তি' রেখে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দ্রব্যের দামের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে বা কমে। সেই ভিত্তিতে আমরা উপরের চিত্রে গমের চাহিদা রেখা এঁকেছিলাম। এখন ধরি, অন্যান্য যে বিষয় বা নির্ধারকগুলোকে অপরিবর্তিত ধরা হয়েছিল সেগুলোর পরিবর্তন হয়েছে।

যেমন: ভোক্তার আয় বাড়লে সে আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ ক্রয় করতে পারবে। অথবা বলা যায়, অন্যান্য অপরিবর্তিত নির্ধারকগুলোর যেকোনো একটির পরিবর্তন হলে, চাহিদা রেখা মূল অবস্থান থেকে ডানে বা বামে স্থানান্তর বা পরিবর্তন হয়।

উপরের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো ব্যক্তি বা ক্রেতার জন্য মূল গমের চাহিদা রেখা D1। এখন ক্রেতার আয় বৃদ্ধির ফলে যদি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ গমের দামের কোনো পরিবর্তন হয়নি বা গমের যোগানের কোনো ধরনের পরিবর্তন হয়নি তাহলে পূর্বের নির্ধারিত দামে ভোক্তা আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ গম ক্রয় করতে পারবে । যার ফলে নতুন চাহিদা রেখা D1 থেকে D2-তে স্থানান্তরিত হবে।

যোগান (Supply)

উৎপাদকরা তাঁদের উৎপাদিত জিনিস বা দ্রব্যসামগ্রী বাজারে সরবরাহ করে থাকে মুনাফার আশায়। তাহলে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, উৎপাদকারি বা সরবরাহকারীরা কিসের ভিত্তিতে নির্ভর করে বাজারে দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে?

অনুশীলনী কাজ ৫: চলো, এখন আমরা বাড়ির কাছের যেকোনো দোকানের পণ্য সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করি।

দোকানে যে যে পণ্যের সরবরাহ বেশি	এই পণ্যের সরবরাহ বেশি হওয়ার কারণ কী?	পণ্যের সরবরাহ/যোগান কখন বেড়ে যায় বা কমে যায়?	পণ্যের সরবরাহ বাড়া বা কমার কারণ
১.			
২.			
৩.			
৪.			

আমরা যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাব, যদি বাজারে কোনো দ্রব্যের দাম বেশি থাকে বা ভালো পরিমাণে দাম পাওয়া যায়, তাহলে সরবরাহকারী তার উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় বা যোগান বাড়িয়ে বেশি মুনাফা করার চেষ্টা করে। তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে, যে দ্রব্যের দাম কম, সেই দ্রব্যের যোগান বাজারে সীমিত বা অনেক সময়ে বাজারে সেই দ্রব্যের যোগান থাকে না। কারণ, উৎপাদনকারী কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে যে উৎপাদন খরচ হয়, বাজারে যদি ঐ দ্রব্যের দাম তার খরচের তুলনায় কম হয়, তাহলে উৎপাদনকারী ঐ দ্রব্য বাজারে সরবরাহ করবে না বা উৎপাদনই করবে না। তাই দাম এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে হবে যাতে সরবরাহকারী/ উৎপাদনকারী তার উৎপাদন খরচের সমান বা তার বেশি দাম পায়, তাহলে সে উৎপাদন করবে।

তাহলে যোগান বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি পণ্যের বা সেবার বিভিন্ন পরিমাণকে বোঝায় যা সরবরাহকারীরা বাজারমূল্যে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক।

যোগান সূচি এবং যোগান রেখা (Supply Schedule & Supply Curve)

আমরা যদি গমের যোগান সূচি বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাব, বিভিন্ন দামে সরবরাহকারীরা বা উৎপাদনকারীরা যে পরিমাণ সরবরাহ করতে ইচ্ছুক তা যে সূচি বা টেবিলের মাধ্যমে প্রকাশ বা উপস্থাপন করে, তাকেই যোগান সূচি বলে। আর এই যোগান সূচিকে যে রেখার মাধ্যমে অঙ্কন করা হয় তাকে যোগান রেখা বলে।

টেবিল: গমের যোগান সূচি

সমন্বয় বিন্দু	প্রতি কিলোগ্রামের দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (হাজার কিলোগ্রাম)
A	৫	১০
B	৬	১৫

C	৭	২০
D	৮	২৫
E	৯	৩০

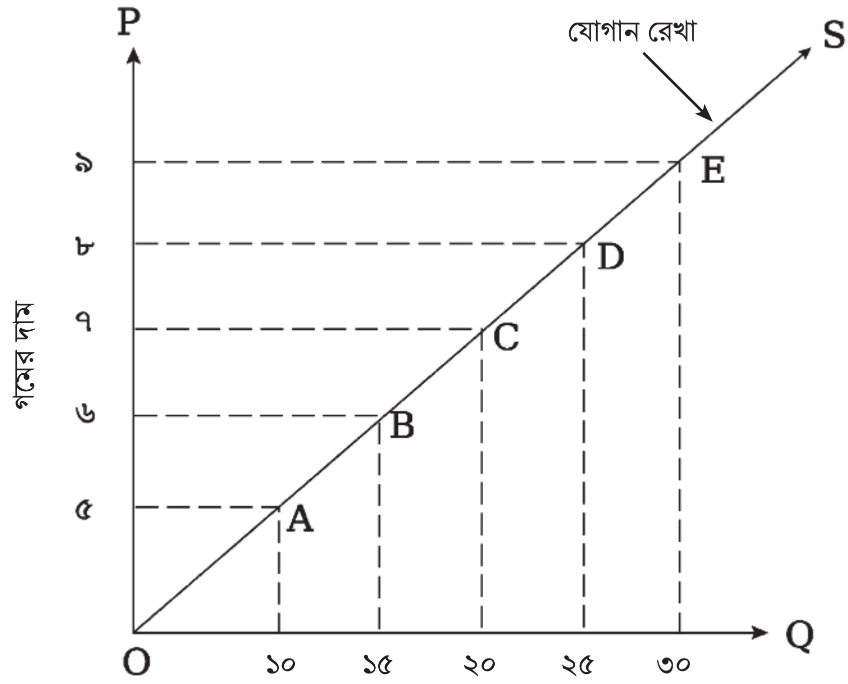

চিত্র: গমের যোগান

উপরের যোগান রেখাটি যোগান সূচির (বিভিন্ন দামের ভিত্তিতে যে ভিন্ন ভিন্ন সরবরাহের পরিমাণ দেখানো হয়েছে) ভিত্তিতে অঙ্কন করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, দাম বাড়লে বিক্রেতারা সরবরাহের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন, আবার দাম কমলে সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, দাম যখন ৫ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ১০ হাজার কিলোগ্রাম যা চিত্রে A বিন্দু দেখানো হয়েছে। এভাবে দাম বৃদ্ধির ফলে যোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে যা চিত্রে B, C, D এবং E বিন্দুগুলোকে একত্রে যোগ করলে যে রেখাটি পাওয়া যায়, তা-ই যোগান রেখা ।

‘অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত’ বা স্থির থাকা অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্য বা সেবার দাম বাড়লে বিক্রেতারা বা সরবরাহকারীরা বাজার দামে যে পরিমাণ সরবরাহ/যোগান বাড়িয়ে থাকে এবং দাম কমলে যোগান কমিয়ে থাকে, তাকেই যোগান বিধি বলে। দাম ও যোগানের মধ্যে সরাসরি বা ইতিবাচক সম্পর্ক বিরাজ করে। অর্থাৎ দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়বে এবং দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমবে। যার ফলে যোগান উর্ধ্বগামী এবং যোগান রেখার ঢাল ধনাত্মক।

যোগান রেখার স্থানান্তর (Shifting Supply Curve)

'অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত' বলতে যে নির্ধারকগুলোকে বোঝানো হয়েছে, তার যেকোনো একটির পরিবর্তনের ফলে যেমন: কাঁচামালের খরচ কমে গেলে উৎপাদক আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে সরবরাহ করতে পারবে। যার ফলে যোগান রেখা ডান দিকে স্থানান্তরিত হবে।

নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা ফার্ম অথবা কৃষক গম চাষে আগ্রহী হলে গমের সরবরাহ বেড়ে যাবে। বিক্রেতারা একই দামে বেশি পরিমাণ বিক্রয় করতে পারবে। একেই যোগান রেখার স্থানান্তর বলা হয়। যখন উৎপাদন উপকরণের দাম সহজলভ্য হয়, অথবা উৎপাদনকারী বা বিনিয়োগকারী যে উপকরণ ব্যবহার করে তার দাম কমে যায়, তখন তিনি একই ব্যয়ে বেশি পরিমাণ উৎপাদন করতে পারেন। তখন যোগান রেখা (S1) ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়ে (S2) হয়।

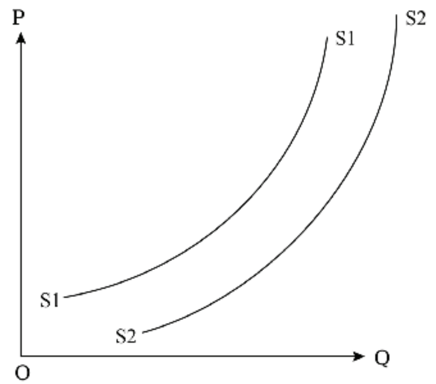

চিত্র: গমের যোগান রেখার স্থানান্তর

বাজার ভারসাম্য দাম (Market Equilibrium Price) বা চাহিদা ও যোগানের মিথস্ক্রিয়া (Interactions between Deamnd & Supply)

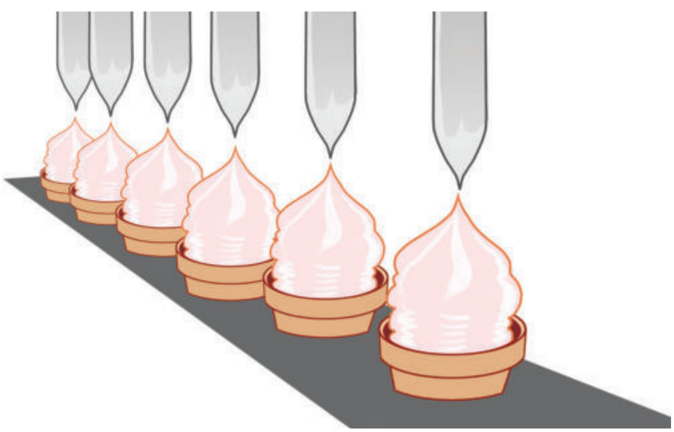

চিত্র: আইসক্রিম ফ্যাক্টরি

নীলিমা একটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করল। যেমন: প্রতিটি আইসক্রিমের দাম যখন ১০ টাকা, তখন এর চাহিদার পরিমাণ থাকে ১০,০০০টি কিন্তু যোগানের পরিমাণ হয় ২,০০০টি। যখন প্রতিটি আইসক্রিমের দাম হয় ২০ টাকা, তখন বাজারে চাহিদার পরিমাণ কমে গিয়ে হয় ৮,০০০টি। কিন্তু যোগানের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে হয় ৪,০০০টি। এভাবে আইসক্রিমের দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে এবং যোগানের পরিমাণ বাড়ে। তাই চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ে একটি ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করা হয়। যে দামে ভোক্তা বা ক্রেতা পণ্য ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং একই দামে বিক্রেতা বা সরবরাহকারী বিক্রি করতে ইচ্ছুক হয়।

অনুশীলনী কাজ ৬: আচ্ছা আমরা একটু ভেবে দেখিতো, প্রতিটি আইসক্রিমের দাম কত হলে ক্রেতা আইসক্রিম ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করবে এবং একই দামে ফ্যাক্টরির মালিক বিক্রি করতে ইচ্ছুক হবে। কেন এই দামে ক্রেতা কিনবে এবং ফ্যাক্টরির মালিক বিক্রি করবে, তার কারণও ব্যাখ্যা করব।

আমার ভাবনা

চমৎকার, আমাদের অনেকের ভাবনার সঙ্গে অর্থনীতিবিদদের ভাবনাও মিলে গেছে হয়তো। চলো দেখে নিই চাহিদা ও যোগানের মিথস্ক্রিয়ায় ভারসাম্য দাম কীভাবে নির্ধারণ হয়, তা দেখে নিই।

টেবিল- চাহিদা ও যোগান সূচির মাধ্যমে ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

আইসক্রিমের দাম (৳)	চাহিদার পরিমাণ	যোগানের পরিমাণ	উদ্বৃত্ত চাহিদা (Excess Demand: +) উদ্বৃত্ত সরবরাহ (Excess Supply: -)
১	১০	২	(+)৮ (উদ্বৃত্ত চাহিদা)
২	৮	৪	(+)৪ (উদ্বৃত্ত চাহিদা)
৩	৬	৬	০ (চাহিদা ও যোগান সমান: ভারসাম্য)
৪	৪	৮	(-)৪ (উদ্বৃত্ত সরবরাহ)
৫	২	১০	(-)৮ (উদ্বৃত্ত সরবরাহ)

আমরা টেবিলটিতে চাহিদা ও যোগান সূচি একত্রে উপস্থাপন করেছি। টেবিল দেখা যাচ্ছে, আইসক্রিমের ভিন্ন ভিন্ন বাজার দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন: আইসক্রিমের দাম যখন ১ টাকা, তখন চাহিদার পরিমাণ ১০ ইউনিট এবং যোগানের পরিমাণ ২ ইউনিট। অর্থাৎ এই দামে (১ টাকা অবস্থায়) বাজারে চাহিদার পরিমাণ অনেক বেশি; কিন্তু যোগানের পরিমাণ অনেক কম । তাই বাজারে উদ্বৃত্ত চাহিদা বিরাজ করে। অন্যভাবে বলা যায়, বাজারে আইসক্রিমের দাম ১ টাকা অবস্থায় সরবরাহকারীরা তেমন যোগান দিতে ইচ্ছুক নই। কারণ, হয়তো এই দামে তার উৎপাদন খরচ ওঠে আসে না বা তার সামান্য ক্ষতিও হতে পারে । তাই যোগানের পরিমাণ কম হয় চাহিদার তুলনায়।

টেবিল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, দাম বেড়ে যখন ৩ টাকা হয়, তখন চাহিদার পরিমাণ এবং যোগানের পরিমাণ উভয়েই সমান। অর্থাৎ যে দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান হয়, তাকে ভারসাম্য দাম বলে। এই দামে বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা বা অতিরিক্ত যোগান থাকবে না। তাই একে বাজার ভারসাম্য বলা হয়।

ভারসাম্য দাম ৩ টাকা ছাড়া অন্য সকল দামে হয়তো চাহিদার পরিমাণ বেশি নয়তো যোগানের পরিমাণ বেশি। তাই চাহিদা ও যোগানের পরস্পরের মিথস্ক্রিয়ায় যে দাম স্থির/নির্ধারণ হয়, তাকে বাজার ভারসাম্য দাম বলা হয়। টেবিলে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে/চাহিদা ও যোগানের সমন্বিত সূচির মাধ্যমে বাজার ভারসাম্য দাম চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল:

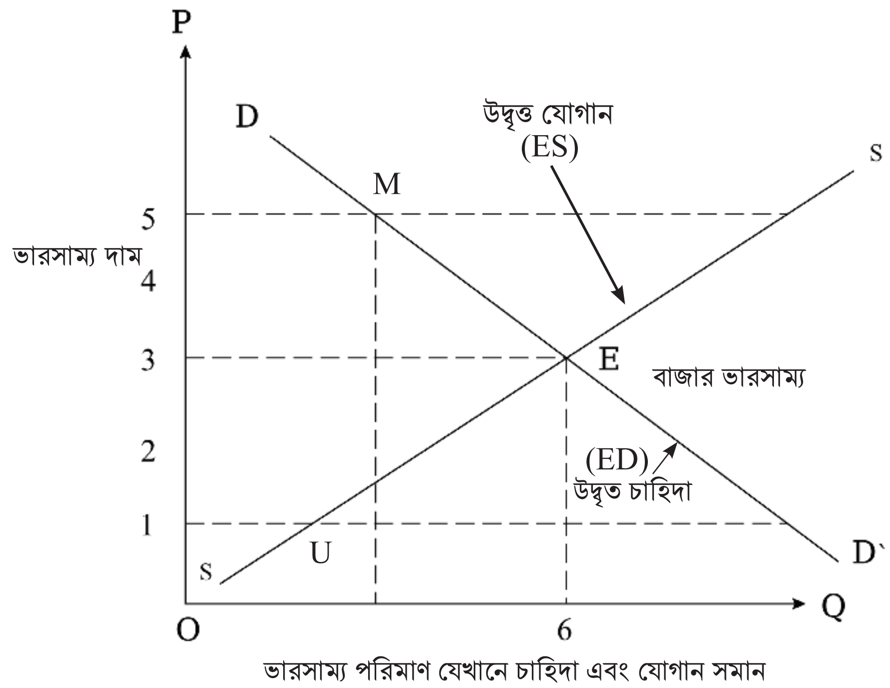

চিত্র: ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

চিত্রে,

ES = Excess Supply/উদ্বৃত্ত যোগান

ED = Excess Demand/উদ্বৃত্ত চাহিদা

DD = Demand Curve /চাহিদা রেখা

SS = Supply Curve/যোগান রেখা

E = Equilibrium Price/ভারসাম্য দাম। যেখানে চাহিদার পরিমাণ এবং যোগানের পরিমাণ সমান সমান।

ভারসাম্য দাম ব্যতীত অন্য কোনো দামে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান হবে না । হয়তো উদ্বৃত্ত চাহিদা বা উদ্বৃত্ত যোগান বিরাজ করবে।

অতিরিক্ত যোগান (Excess Supply) এবং অতিরিক্ত চাহিদা (Excess Demand): মজুদ বা সংরক্ষণ

বাজারে যখন ভোজ্যতেলের মূল্য প্রতি লিটারে ১৬০ টাকা বেড়ে ১৭৫ টাকা হলো, তখন মিজান সাহেব ভোজ্যতেলের উৎপাদন বাড়িয়ে দিলেন ৩০ ইউনিট থেকে ৪০ ইউনিট। ভোজ্যতেলের দাম বাড়ায় বাজারে চাহিদা কমে যায়। ফলে উৎপাদিত অতিরিক্ত ১০ ইউনিট ভোজ্যতেল তিনি মজুদ বা সংরক্ষণ করে রাখেন।

তাহলে আমরা বলতে পারি, বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহের ফলে তা বিক্রি না হওয়ায় সংরক্ষণ বা মজুদ করতে হয়।

আবার, যেসব কৃষি দ্রব্য পচনশীল এবং সংরক্ষণ করতে না পারলে দ্রুত সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায় ঐ ধরনের দ্রব্যগুলো আধুনিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে রাখতে হয়। ফলে উৎপাদকের খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন খরচের সঙ্গে সংরক্ষণ বাবদ খরচ একত্র করলে মোট খরচ বেড়ে যায়। ফলে করোনাকালে বেশ

কিছু প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদা বেশ বেড়ে যায়। আমরা জানি, কোন পণ্যের চাহিদা হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেলে বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকলে দামও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় কিছু কিছু উৎপাদনকারী যাদের অধিক উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে, তারা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারে। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অন্যান্য উৎপাদনকারীও তাদের উৎপাদন বাড়ায় তাহলে দেখা যাবে বাজারে সরবরাহের পরিমাণ অনেক বেশি হবে। ফলে উৎপাদনকারীরা আবার তাদের দাম কমিয়ে বিক্রির পরিমাণ বাড়িয়ে থাকে। একটা পর্যায়ে দাম কমতে কমতে ভারসাম্য দামে নির্ধারিত হবে। এক কথায়, ভারসাম্য দাম নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত যোগান এবং চাহিদার তফাৎ বা ফারাক থাকবে।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালে পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। বাংলাদেশর অবস্থান এর আগেও দ্বিতীয় স্থানে ছিল। কিন্তু ২০২০ সালে ভিয়েতনাম যখন এই স্থান দখল করে তখন বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে নেমে যায়।

ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের বাজারব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের সরকার পোশাকশিল্প মালিকদের অধিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে থাকে। যার ফলে বেশ কয়েকটি পোশাকশিল্প এখন বিশ্ব বাজারে পোশাক সরবরাহ করতে পারছে। এর মধ্যে (ধরি) ক ও খ গ্রুপ অন্যতম। আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরিকৃত পোশাকের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।

করোনাকালে পোশাক শিল্পে বিশ্ববাজার অর্থনীতি কিছুটা স্থবির ছিল। তখন উদ্যোক্তারা চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য সংরক্ষণ করেন এবং তাদের উৎপাদন উপকরণের মূল্য হ্রাসে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যেমন: শ্রমিকের সংখ্যা কমানো, বেতন কমানো ইত্যাদি। অনেক মানুষ বেকার হয়ে যাচ্ছে বিধায় সরকার এই সমস্যা নিরসনের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পণ্য রপ্তানি এবং স্থানীয় বাজারে পোশাক বিক্রির প্রক্রিয়া সুগম করে দেয়।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিশ্লেষণ করে অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, পোশাক শিল্প উদ্যোক্তাদের বিশ্বমানসম্পন্ন পণ্য আরো বেশি পরিমাণে উৎপাদনের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

ফলে পোশাকশিল্পের মালিকেরা প্রচুর পরিমাণে তৈরিকৃত পোশাক সরবরাহ করছেন। বর্তমানে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ চলার সময়েও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের সরবরাহ বেড়েছে। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের দাম কম হওয়ায় ভোক্তাদের কাছে এই পোশাকের চাহিদা বাড়ছে। একটি রিপোর্ট অনুসারে তুরস্কে তৈরি যে পণ্যটি কিনতে লাগে ৮ ডলার, বাংলাদেশে তৈরি সেই পণ্যটি হয়তো পাওয়া যায় ৩ ডলারে। তাই বাংলাদেশ যেখানে বিশ্ববাজারে ৪৫ বিলিয়ন ডলার পোশাক যোগান দিয়েছে সেখানে তুরস্ক যোগান দিয়েছে ২০ বিলিয়ন ডলার পোশাক। বাংলাদেশে শ্রমিক মজুরি ও মূলধন যেমন: ভবন, জমি ও টাকা ইত্যাদি কম হওয়ায় কম খরচে পোশাক উৎপাদন করা যায়। এতে পোশাকশিল্পের মালিকেরা কম মূল্যে পোশাক যোগান দিতে পারেন।	বাংলাদেশের অন্যতম আরেকটি রপ্তানিযোগ্য পণ্য হচ্ছে পাট ও পাটজাত দ্রব্য। যা বিশ্ববাজারে এক বিরাট অংশ দখল করে আছে। কিন্তু বিশ্ববাজারে এর চাহিদা কমছে। ফলে এই পণ্য উৎপাদনের পরিমাণও কমছে। অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য, পাটশিল্পের প্রতি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। পরিবেশবাদীদের মতামত, প্লাস্টিকের তৈরি ব্যাগ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ব্যবহার পরিহার করে পরিবেশবান্ধব পাটজাত দ্রব্য ব্যবহার করার বিষয়ে ভোক্তাদের আগ্রহী করা যেতে পারে। তবে এতে বাংলাদেশের প্লাস্টিক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে অনেকেই মনে করেন। পাটজাত পণ্য ক্রয়ের চাহিদা বাড়লে যোগান বাড়বে, এতে প্লাস্টিকের পণ্য তৈরির কারখানাগুলোর যোগান কমে যেতে পারে।

অনুশীলনী কাজ ৭: এই পাঠে শেখা অর্থনীতির কয়েকটি বিষয় উপরের প্রতিবেদন পড়ে নির্ণয় করি। সেই সঙ্গে বিস্তারিতভাবে লিখি প্রতিবেদনে এই বিষয়ে কী দেওয়া আছে। একটি উত্তর করে দেওয়া আছে।

বিষয়	প্রতিবেদনে যেভাবে লেখা আছে	কারণ/ব্যাখ্যা
ব্যষ্টিক অর্থনীতি সামষ্টিক অর্থনীতি	ক গ্রুপ ৫৮ কোটি ডলারের বেশি পোশাক পণ্য উৎপাদন করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরিকৃত পোশাকের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফলে পোশাক শিল্পের মালিকেরা প্রচুর পরিমাণে তৈরিকৃত পোশাক সরবরাহ করছেন।	প্রতিবেদনে একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে সামষ্টিকভাবে বাংলাদেশের সব পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে।
ইতিবাচক অর্থনীতি নীতিবাচক অর্থনীতি		

সুযোগ ব্যয়		
চাহিদা বিধি		
যোগান বিধি		
অতিরিক্ত চাহিদা/অতিরিক্ত যোগান		

আয় বৈষম্য (Income Discrimination)

আয় বৈষম্য বলতে সমাজ বা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে ব্যক্তি (Individual) বা পরিবারের (Household) মধ্যে আয়ের অসম বণ্টনকে বোঝায়। এটি একটি সামাজিক (Social) এবং অর্থনৈতিক (Economic) সমস্যা যা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আয়ের মধ্যে ব্যবধান পরিমাপ করে, যা সম্পদ এবং উপার্জনের বৈষম্যকে নির্দেশ করে।

আমরা এখন আয়বৈষম্যের মূল কারণগুলি উল্লেখ করব

মজুরি বৈষম্য (Wage Disparities): শ্রমিকদের মজুরি (Wage of Labour) এবং কর্মকর্তাদের বেতনের (Salaries of Employees) তুলনামূলক পার্থক্য আয় বৈষম্যের একটি প্রধান অনুঘটক বা উপাদান। বিশেষভাবে অর্জিত জ্ঞান বা উন্নত শিক্ষাসহ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ (Skilled Human Resources) বা কর্মীরা প্রায়ই নিম্ন-দক্ষ (Low Skilled) বা অদক্ষ (Unskilled) শ্রমিকদের তুলনায় উচ্চ মজুরি পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী মজুরি প্রদান করা হয় না। ফলে উদ্যোক্তা কর্তৃক শ্রমিককে শোষণ করা হয়।

গুণগত শিক্ষা ও দক্ষতার স্তর (Quality Education & Efficiency Level): আয়বৈষম্যের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উচ্চস্তরের গুণগত শিক্ষা এবং বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ সাধারণত ভালো বেতনের চাকরি এবং উন্মুক্ত কর্মজীবনের সুযোগের দিকে পরিচালিত বা ধাবিত করে। মানসম্পন্ন শিক্ষা, বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা বা পারদর্শিতা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ চাকরিতে প্রবেশাধিকারের বা সুযোগের বৈষম্য পরবর্তীতে আয়বৈষম্যকে স্থায়ী করতে পারে।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি (Technological Advancements): প্রযুক্তিগত অগ্রগতি উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী হয়ে আয়বৈষম্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। স্বয়ংক্রিয়তা এবং ডিজিটালাইজেশনের ফলে স্বল্প-দক্ষ কর্মীদের চাকরি স্থানচ্যুতি হতে পারে, আয়ের ব্যবধান আরও প্রসারিত হতে পারে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সঙ্গে যারা খাপ খাওয়াতে পারবে না তারা শ্রম বাজার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। অথবা নূন্যতম মজুরিতে চাকরি করতে বাধ্য হবে। যারা যত দ্রুত সম্ভব নতুন প্রযুক্তি বা আধুনিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হবে, তারা অধিক আয় করতে পারবে। ফলে নতুন প্রযুক্তিও আয়বৈষম্যের কারণ হতে পারে।

বিশ্বায়ন এবং বাণিজ্য (Globalization & Trade): বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশে চাকরি ও শিল্প স্থানান্তরের মাধ্যমে আয়বৈষম্যকে প্রভাবিত করেছে। যদিও এটি নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করতে পারে, এটি নির্দিষ্ট সেক্টরে চাকরি হারাতে পারে, নিম্ন-দক্ষ কর্মীদের প্রভাবিত করে এবং আয় বৈষম্যকে বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশ্বায়নের যুগে আমাদের দেশের অদক্ষ, স্বল্প দক্ষ এবং দক্ষ শ্রমিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। আবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দক্ষ কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিক আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্প-কারখানা, সেবা খাতে, উৎপাদন খাতে এবং অবকাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত রয়েছে। এখানে একটি বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, আমাদের দেশের প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ লোক বহির্বিশ্বে কর্মরত থেকে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়ে থাকে তার থেকে অনেক কম সংখ্যক বিদেশি বাংলাদেশ থেকে তাঁদের দেশে তুলনামূলক বেশি বেতন-ভাতা পাঠিয়ে থাকেন। কারণ, বিদেশি যারা আমাদের দেশে কর্মরত রয়েছে তাদেরকে উচ্চ বেতনে কাজ দিতে হয়।

কর নীতি (Taxation): কর ব্যবস্থা আয় বৈষম্য কমাতে বা বাড়িয়ে দিতে পারে। প্রগতিশীল কর কাঠামো, যেখানে উচ্চ উপার্জনকারীদের উচ্চ হারে কর দেওয়া হয়, সম্পদ পুনঃবণ্টন এবং বৈষম্য কমাতে সাহায্য করতে পারে। বিপরীতভাবে, রিগ্রেসিভ ট্যাক্স নীতিগুলো কম আয়ের ব্যক্তিদের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বোঝা হয়ে চাপতে পারে।

আয় বৈষম্যের প্রভাব

আয় বৈষম্য সমাজে অর্থনৈতিক সমতা নষ্ট করে। এতে করে ধনী আরও বেশি ধনী হয় আর গরিব আরও বেশি গরিব হয়। নিম্নে আয় বৈষম্য সমাজে আরও যে ধরনের প্রভাব ফেলে তা দেখানো হলো।

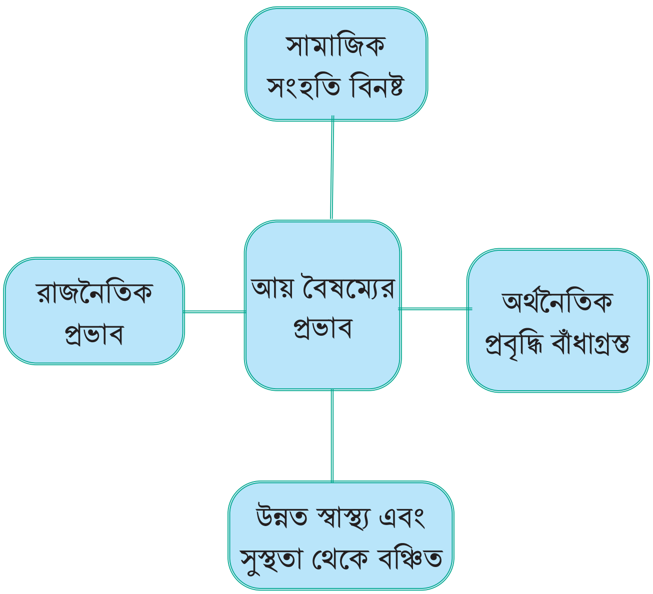

সামাজিক সংহতি বিনষ্ট: উচ্চমাত্রার বা চরম আয় বৈষম্য সামাজিক অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হতে হতে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ক্রোধ কাজ করে। কারণ, এটি অন্যায় এবং অন্যায়ের অনুভূতি তৈরি করে। ফলে এটি সামাজিক সংহতি বিনষ্ট করতে পারে এবং সমাজকে বিভাজন ও দ্বন্দ্বে ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত (Economic Growth): চরম আয় বৈষম্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুফল যদি মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণির মানুষ পেয়ে থাকে এবং নিম্ন আয়ের মানুষের জীবন মানের ইতিবাচক কোনো ধরনের পরিবর্তন না হয়, তাহলে সেই প্রবৃদ্ধি আয় বৈষম্য সৃষ্টি করে। যখন জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ক্রয়ক্ষমতা সীমিত থাকে, তখন এটি ভোক্তাদের চাহিদা কমাতে পারে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ফলে নিম্ন আয়ের ভোক্তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী বা সেবা বাজার থেকে ক্রয় করতে পারে না।

স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা: আয়বৈষম্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ফলাফলের সঙ্গে যুক্ত। নিম্ন আয়ের ব্যক্তিরা প্রায়শই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, গুণগত শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলো সীমিত সুযোগ পায়। যার ফলে স্বাস্থ্যের ফলাফল, আয়ুষ্কাল এবং জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দেখা দেয়।

রাজনৈতিক প্রভাব: আয়ের বৈষম্য রাজনৈতিক ক্ষমতার গতিশীলতাকে বিঘ্নিত করতে পারে। কারণ, বেশি সম্পদের অধিকারীরা প্রায়ই নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর বেশি প্রভাব ফেলে। এটি ধনীদের স্বার্থের পক্ষ হয়ে বৈষম্যকে আরও স্থায়ী করতে পারে।

আয় বৈষম্য কমানোর উপায়

শিক্ষা ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ: আয়ের বৈষম্য কমানোর জন্য মানসম্মত শিক্ষা এবং দক্ষতা ও প্রশিক্ষণে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং উচ্চতর দক্ষতা তাদের কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের সম্ভাবনা বাড়ায়।

প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা এবং পুনঃবণ্টন: প্রগতিশীল কর নীতি বাস্তবায়ন সম্পদ পুনঃবন্টন এবং আয় বৈষম্য কমাতে সাহায্য করতে পারে। সরকার উচ্চ আয়ের ব্যক্তিদের জন্য করের হার বাড়াতে পারে এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি ও উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য সম্পদ বরাদ্দ করতে পারে।

ন্যূনতম মজুরি নীতি: ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি মান প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করা নিম্ন আয়ের কর্মীদের উন্নীত করতে এবং আয়ের ব্যবধান কমাতে সাহায্য করতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য ন্যূনতম মজুরিতে পর্যায়ক্রমিক সমন্বয় করা উচিত।

সামাজিক নিরাপত্তা জাল: বৃদ্ধ ও অসহায় ভাতা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বেকারত্বের সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা কভারেজ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনের মতো ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা নেট প্রোগ্রামগুলো বিকাশ করা ব্যক্তি এবং পরিবারগুলোর জন্য একটি নিরাপত্তা জাল প্রদান করতে পারে, যারা অর্থনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সমান সুযোগ নীতি: বৈষম্য বিরোধী ব্যবস্থা, ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির মাধ্যমে সমান সুযোগের প্রচার করা লিঙ্গ, জাতিগত এবং অন্য কারণগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত আয়বৈষম্যকে মোকাবিলায় সহায়তা করতে পারে।

শ্রমিকদের অধিকার শক্তিশালী করা: শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা, ন্যায্য শ্রম অনুশীলন নিশ্চিত করা এবং সমষ্টিগত দর-কষাকষি সমর্থন করা আরও ন্যায়সংগত মজুরি এবং কাজের পরিস্থিতিতে অবদান রাখতে পারে।

আয়ের বৈষম্য মোকাবিলার জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতির প্রয়োজন, যাতে সরকারি নীতি, ব্যবসায়িক অনুশীলন এবং সামাজিক উদ্যোগগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার লক্ষ্য ন্যায্যতা, সমতা এবং ভাগ করে নেওয়া সমৃদ্ধি।

দলগত কাজ ৪

এখন আমরা আগের মতো দলে বসে যাই। আমরা আমাদের এলাকার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যে একটি প্রকল্প বেছে নিয়েছি, সেটি নিয়ে এখন কাজ করব। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কী কী সম্পদ প্রয়োজন তার একটি তালিকা তৈরি করি। এরপর এই সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের উপায় নির্ণয় করি।

প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ	উৎপাদন	বণ্টন	ভোগ	সংরক্ষণ

আমাদের নির্ধারিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার মানুষ কীভাবে উপকৃত হবে, তা নির্ধারণ করে নিচে লিখি।

মুক্ত আলোচনা

আমরা দলগতভাবে ইতোমধ্যে এলাকার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রকল্প নির্ধারণ করেছি। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করেছি। সেই সঙ্গে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এলাকার মানুষ কীভাবে উপকৃত হবে তা-ও নির্ধারণ করেছি। আমরা আমাদের এই দলগত কাজকে মুক্ত আলোচনা আয়োজন করে উপস্থাপন করব। এজন্য আমরা বিভিন্ন মডেল/পোস্টার/পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি। এরপর আমরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে একটি রিপোর্ট লিখে জমা দেব।

মুক্তিযুদ্ধের কয়েকজন বীরাঙ্গনা

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস্ বাহিনী বাংলাদেশের নিরীহ নিরস্ত্র জনগণের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল। গণহত্যার পাশাপাশি নারীদের ধর্ষণ, মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন ও দেশের সর্বত্র ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর বিভিন্ন সেনা ক্যাম্প ও পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতন কেন্দ্রগুলো থেকে বহু নারীকে উদ্ধার করা হয়েছিল। সেসময় পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এঁদের অনেকেই আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু এই নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁদের বীরাঙ্গনা (রণাঙ্গনের বীর নারী) আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৭২ সালের ২২শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধকালীন নির্যাতিত নারীদের এই বীরাঙ্গনা খেতাব প্রদান করে। ১৯৭২ সালেই নির্যাতিত নারীদের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার কর্তৃক মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার ১৯৭২ সালে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ১০% পদ মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারী অথবা যাদের আত্মীয়-স্বজন শহিদ হয়েছেন এমনসব নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখার আদেশ দেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর বন্ধ করে দেওয়া হয় পুনর্বাসন কেন্দ্র। সমাজে বীরাঙ্গনা নারীরা চরম অবহেলা আর ঘৃণার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন। শেখ হাসিনার সরকার বীরাঙ্গনা নারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতির পাশাপাশি অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মতো ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা চালু করেন। বর্তমানে গেজেটভুক্ত বীরাঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩৩৯ জন। তাঁদের মহান ত্যাগের জন্য জাতি তাঁদের কাছে চিরঋণী।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল নবম শ্রেণি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিশ্রম উন্নতির চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য